ANIK

কিশোর থ্রিলার

তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ৪৪

রকিব হাসান

RIZON

ভলিউম ৪৪

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

সাঁইত্রিশ টাকা

ISBN 984-16-1441-3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮০৭৪০৮ (M-M)
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume-44
TIN GOYENDA SERIES
By Rakib Hassan

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১৫	(পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১৬	(প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৭	(ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ১৮	(খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)	৪০/-
তি. গো. ভ. ১৯	(বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ২০	(খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২১	(ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার)	৪০/-
তি. গো. ভ. ২২	(চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ২৩	(পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ২৪	(অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ২৫	(জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)	৪০/-
তি. গো. ভ. ২৬	(ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ২৭	(ঐতিহাসিক দুর্গ, তুষার বন্দি, রাতের আঁধারে)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ২৮	(ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ২৯	(আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৩০	(নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মুলা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩১	(মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৩২	(প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৩৩	(শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৪	(যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৫	(নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৩৬	(টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৭	(ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৮	(উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৯	(বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪০	(অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪১	(নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪২	(এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৩	(আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৪	(প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৪৫	(বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৬	(আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা)	৩২/-
তি. গো. ভ. ৪৭	(নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)	৩২/-
তি. গো. ভ. ৪৮	(হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৯	(মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ)	৩১/-
তি. গো. ভ. ৫০	(কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)	৩১/-

প্রত্নসন্ধান
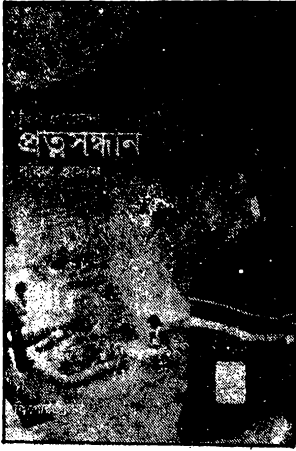
প্রথম প্রকাশ: ২০০০

'কিসের জন্যে খুঁড়ছে বললে?' আগ্রহী হয়ে উঠল কিশোর পাশা। হাতের বইটা সরিয়ে রাখল একপাশে।

'গুপ্তধন,' আবার একই কথা বলল রবিন। 'ডেভিল'স রিজে প্রত্নতাত্ত্বিক খোঁড়াখুঁড়ি চালাতে গেছে ইউনিভার্সিটি। জায়গাটা চেনো?'

'চিনি,' মুসা জবাব দিল 'এখান থেকে পশ্চিমে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'ঘাসে ঢাকা একটা মাঠের মধ্যে বিশাল ফোঁড়ার মত উঁচু হয়ে থাকা একটা ঢিবি। কমেটকে নিয়ে দৌড়াতে গিয়ে দেখেছি। শুনেছি ওখানে ভূতের আনাগোনা আছে!'

মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'হ্যাঁ, ওইটাই। মাঝখানে একটা মাটির গম্বুজকে ঘিরে মাঠ। ওই গম্বুজের মত জায়গাটা নাকি কাহুয়া ইনডিয়ানদের কবরস্থান। সত্তর-আশি বছর আগে একবার খোঁড়া হয়েছিল, কিছু পাওয়া যায়নি। তখন তো শুধু বেলচার ওপর নির্ভর করতে হত, মিস করাটা স্বাভাবিক; এখন আধুনিক সব যন্ত্রপাতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কম্পিউটার। ধারণা করা হচ্ছে বিশিষ্ট কাউকে কবর দেয়া হয়েছে ওখানে, কোন কাহুয়া সর্দার-টর্দার হবে।' হাঁ করে তাকিয়ে থাকা দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হাসল সে। 'আজ সকাল থেকেই খোঁড়া শুরু করার কথা ওদের।'

'তুমি জানলে কি করে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কেরির কাছে। ওই সম্পর্কে স্কুল ম্যাগাজিনে লিখতে অনুরোধ করেছে। ছবি দিতে পারলে ভাল হয়।'

কেরি জনসন ওদের স্কুলে সবচেয়ে ওপরের ক্লাসে পড়ে। স্কুল ম্যাগাজিনের সম্পাদিকা।

'কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক খোঁড়াখুঁড়ি মানে তো পুরানো হাড়গোড়, ভাঙাচোরা মাটির হাঁড়ি-পাতিল; অতি ফালতু সব জিনিসপত্র,' মুসা বলল। 'এর মধ্যে গুপ্তধন ঢুকল কি করে?'

'কেন, মিশরের ফারাও তুতানখামেনের কবরের কথা শোনোনি? প্রাচীনকালে ধনী কেউ মারা গেলে তাদের সঙ্গে প্রচুর ধনরত্ন, সোনার মোহর, অলঙ্কার দিয়ে দেয়া হত। তাদের বিশ্বাস ছিল পরকালে ওসব জিনিস মৃতদের স্বর্গে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। পৃথিবীর বহু জায়গাতেই এ নিয়ম প্রচলিত ছিল।'

'ঈশ্বরকে ঘুষ! হ্যাহ্, পাগল আর কাকে বলে।'

'ডেভিলস রিজে যাদের কবর দেয়া হয়েছে, তাদের কেউই ফারাওয়ের মত অত বড়লোক নয়, তবে ধনরত্ন ছিল না এমনও নয়। ইনটারেস্টিং কিছু পাওয়া যেতে

পারে।'

'এতকাল পরে কি সত্যি সত্যি আছে ওগুলো?'

'না থাকার কি হলো? মিশরে যদি থাকতে পারে, এখানে থাকবে না কেন?'

'মিশরে তো পিরামিড। শুনেছি, পিরামিডের ভেতরে সব কিছু সুরক্ষিত থাকে। এখানে তো আর তেমন কিছু নেই।'

'কি আছে সেটাই তো দেখতে চাইছে। আমি যাব। ছবি তুলে আনব। আজ বিকেলেই যাব স্কুল ছুটির পর।'

'তাহলে,' নড়েচড়ে উঠল কিশোর, 'আমরাই বা না যাই কেন?' মুসার দিকে তাকাল সে, 'কি, যাবে?'

'আমার আপত্তি নেই। দিনের বেলা নিশ্চয় ভূতগুলো অতটা ভয়ানক হয়ে উঠবে না, তা ছাড়া এত মানুষের মধ্যে হামলা করারও সাহস করবে না, কি বলো?...কিন্তু বসে বসে কি শুধু আলাপ করলেই চলবে? টিফিন পিরিয়ড তো প্রায় শেষ।'

'যাও না, ভাই,' অনুরোধ করল রবিন, 'এক দৌড়ে গিয়ে ক্যান্টিন থেকে কয়েকটা স্যান্ডউইচ নিয়ে এসো না। টাকাটা নাহয় আমিই দেব, যাও।'

সুন্দর বিকেল। ঝিরঝিরে বাতাস। সাইকেল চালিয়ে চলেছে তিন গোয়েন্দা।

সামনে পাহাড়ী এলাকা। ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে ওরা। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল কিশোর। সুন্দর লাগছে রকি বীচ শহরটা। সাদা সৈকত। প্রশান্ত মহাসাগরের নীল পানি। আকাশের সাদা মেঘের প্রতিচ্ছবি তৈরি করেছে যেন ভেসে যাওয়া ছোট-বড় জলযানগুলো।

মাইলখানেক এগোনোর পর একটা সমতল অঞ্চলে উঠে এল ওরা। পথ আঁকাবাঁকা। কিন্তু দ্রুত চালাতে পারছে এখন। দুধারে মাঠ।

আরও খানিকটা এগোনোর পর একটা ঘাসে ঢাকা ঢালের কিনারে সাইকেল থামাল মুসা।

'নাও, এসে গেছি। এটাই ডেভিল'স রিজ।'

নিচু ঝোপের প্রাকৃতিক বেড়া তৈরি হয়ে আছে। মাঝখানে কেটে বসানো চওড়া একটা কাঠের গেট। তার ওপাশে ছড়ানো ঘাসে ঢাকা মাঠ। দুশো গজ দূর থেকে লম্বা, নিচু একটা পাহাড় ঠেলে উঠেছে যেন মাটির ওপর, উল্টে ফেলে রাখা বাথটাবের মত। চারপাশের প্রকৃতির সঙ্গে বেমানান, মানুষের তৈরি বোঝা যায়।

পুরানো একটা বাদামী গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তাটার মাঝামাঝি জায়গায়।

গেট খোলা। সাইকেল ঠেলে এগোতে এগোতে চোখে পড়ল ওদের, উঁচু জায়গাটার একপাশে দুটো ল্যান্ড রোভার দাঁড়িয়ে আছে। তার পেছনে ধূসর রঙের একটা ছোট ক্যারাভান।

পাহাড়ের গা থেকে অনেকখানি জায়গার ঘাস চেঁছে ফেলা হয়েছে। বেলচা আর কর্ণিক নিয়ে কাজ করছে তিন-চারজন লোক।

চড়া কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দা।

ক্যারাভানের দরজা খোলা। সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়েছেন এক ভদ্রমহিলা। নিচে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক উত্তেজিত ভঙ্গিতে চিৎকার করে হাতের ওয়াকিং-স্টিকটা

তুলে পাহাড়ের দিকে কি যেন দেখাচ্ছেন। মহিলার বয়েস আটাশ কি উনত্রিশ। পরনে জিনস, গায়ে ঢোলা শার্ট, কালো চুলগুলো পেছনে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘোড়ার লেজের মত করে বাঁধা। ভদ্রলোকের পরনে ধূসর স্যুট, দোমড়ানো; ধূসর এলোমেলো চুলের বোঝা ঘাড়ের ওপর নেমে এসেছে।

'এই রে, সেরেছে!' বলে উঠল মুসা। 'বাধবে গণ্ডগোল!'

'কে উনি?' জানতে চাইল রবিন। 'জমির মালিক?'

মাথা নাড়ল মুসা, 'প্রফেসর ডেমিরন। গোস্ট মিলে থাকেন, নদীর পাড়ে, বনের মধ্যে।' দুই বন্ধুর দিকে তাকাল সে, 'কেন, পাগলা প্রফেসরের নাম শোনোনি? পুরানো, বিশাল এক পোড়ো বাড়িতে একলা থাকেন। সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেন। বাড়ি থেকে বেরোনই না।'

'তাই,' মাথা দোলাল রবিন, 'পুরোই তো উন্মাদ মনে হচ্ছে। বাড়ি মারবেন নাকি?'

'প্রফেসর ডেমিরন?' বিড়বিড় করল কিশোর। 'নাম শুনেছি, দেখিনি কখনও। রিটায়ার্ড, তাই না? কি করছেন?'

'কাছে গেলেই জানা যাবে,' রবিন বলল।

'লাঠির নাগালের মধ্যে যাওয়া উচিত হবে না,' সাবধান করল মুসা। 'ডেমিরনের লাঠির কুখ্যাতি আছে!'

'তুমি জানলে কি করে?'

'কমেটকে নিয়ে বেড়াতে এসেছি বললাম না এদিকে, সেজন্যেই জানি। ওয়াটার মিলটাও চিনি। বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি তাঁকে। কাছে গিয়েছিলাম কি করছেন দেখার জন্যে। এমন ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকালেন, থাকার সাহস হলো না; তারপর থেকে দেখলেই পালাই।'

'অনধিকার চর্চা করছ তোমরা,' চিৎকার করে উঠলেন ডেমিরন। 'শান্তিতে থাকতে দেয়া উচিত ওদের।'

'প্রফেসর ডেমিরন,' শান্তকণ্ঠে বললেন মহিলা, 'আমার কাছে বিশ্ববিদ্যালয় আর লোক্যাল কাউন্সিলের লিখিত অনুমতি আছে। অবৈধ কিছু করছি না। আপনার সঙ্গে অকারণ তর্ক করার সময় নেই আমাদের। আপনার কোন অভিযোগ থাকলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আসতে হবে।'

সাপের লেজের মত লাফ দিয়ে উঠল প্রফেসরের লাঠি। একধাপ ওপরে উঠে গেলেন মহিলা।

'তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, মিস ড্যানহ্যাম,' চিৎকার করে বললেন প্রফেসর, 'ভাল চাও তো, এই খোঁড়াখুঁড়ি বন্ধ করো। পরে পস্তাবে বলে দিলাম।'

জ্বলে উঠল মহিলার চোখ। 'হুমকি দিচ্ছেন নাকি?'

'আমি তোমাকে সাবধান করছি। নাক গলাচ্ছ তোমরা। মিনাকুয়োর বিরুদ্ধে গেলে দুঃখ আছে কপালে।'

কপালে হাত বোলালেন মহিলা। 'আপনার বকবক অনেক সহ্য করেছি, প্রফেসর। আমি বাস্তব নিয়ে কাজ করতে ভালবাসি। মিথলজিতে কোন আগ্রহ নেই আমার। আপনার বলা শেষ হয়ে থাকলে এখন যেতে পারেন। সময় থাকতে চলে

যান, নইলে যা কাণ্ড শুরু করেছেন, বোকামি করে শেষে নিজেই বিপদে পড়বেন। মানুষের ধৈর্যের একটা সীমা আছে।'

প্রচণ্ড রাগে চিৎকার করে উঠলেন প্রফেসর। আবোল-তাবোল কি সব বকতে লাগলেন বেশির ভাগই বোঝা গেল না।

চোখের কোণ দিয়ে বলিষ্ঠ, লম্বা এক তরুণকে ছুটে আসতে দেখল কিশোর।

'মায়া,' কাছে এসে বলল সে, 'কি হয়েছে?' প্রফেসরের লাঠি বাঁচিয়ে তাঁর কাঁধ চেপে ধরে ঝাঁকি মারল।

'হাত সরাও, ডাকাত কোথাকার!' গর্জে উঠলেন ডেমিরন।

হতভম্ব হয়ে দেখছে তিন গোয়েন্দা, প্রফেসরের হাত থেকে হ্যাঁচকা টানে লাঠি কেড়ে নিল লোকটা।

'ডন,' চিৎকার করে বললেন প্রফেসর ড্যানহ্যাম, 'ছাড়ো ওঁকে। ছেড়ে দাও...'

কিন্তু সর্বনাশ যা ঘটার ঘটে গেল। পিছাতে গিয়ে কিসে যেন পা বেধে ঘাসের ওপর চিত হয়ে পড়ে গেলেন প্রফেসর ডেমিরন।

দৌড় দিল তিন গোয়েন্দা।

সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে এলেন প্রফেসর ড্যানহ্যাম। তিন গোয়েন্দার সহায়তায় প্রফেসরকে তুলে দাঁড় করালেন। ডেমিরনের নীল চোখে আগুন। মুখটা ফ্যাকাসে। কুঁচকানো চামড়ার ভাঁজ আরও গভীর হয়েছে।

লাঠিটা কেড়ে নিলেন তরুণ লোকটার হাত থেকে। সবার দিকে তাকিয়ে আগুন ঝরাতে লাগলেন চোখ থেকে। চুলগুলো পাখির বাসা হয়ে আছে।

'পস্তাবে,' টেনেটুনে গায়ের জ্যাকেট সোজা করতে করতে বললেন। 'এর জন্যে পস্তাতে হবে সবাইকে। ক্ষমা নেই। কেউ রেহাই পাবে না।'

'ঘটনাটার জন্যে সত্যি দুঃখিত আমি, প্রফেসর ডেমিরন,' প্রফেসর ড্যানহ্যাম বললেন। 'লেগেছে? গাড়িতে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব?'

ঝটকা দিয়ে পেছনে সরে গেলেন ডেমিরন। হেসে উঠলেন শুকনো স্বরে। গ্রীষ্মের দুপুরে পাতার ছায়ায় বসা দাঁড়কাকের ডাকের মত লাগল হাসিটা। প্রফেসর ড্যানহ্যামের দিকে তাকালেন তিনি। 'আমাকে সাহায্য করা লাগবে না, নিজেদের কথা ভাবো। মিনাকুয়ো তোমাদের ছাড়বেন না। তাঁর শান্তি নষ্ট করার প্রতিশোধ তিনি নেবেনই।'

ঘিরে থাকা মানুষের ঘের থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি।

মুসার ওপর চোখ পড়তে থমকে দাঁড়ালেন। চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। তাকে ধরার জন্যে হাত বাড়ালেন।

পিছিয়ে গেল মুসা। ঘাবড়ে গেছে।

বিড়বিড় করে বললেন প্রফেসর, 'এখানে আসা ঠিক হয়নি তোমার, রুপানি। চলে যাও এখান থেকে। মিনাকুয়োকে মুক্ত করার ষড়যন্ত্র চলছে।'

অস্বস্তির হাসি ফুটল মুসার চোখে। অসহায় ভঙ্গিতে তাকাল কিশোরের দিকে।

সবার ওপর দ্রুত দৃষ্টি ঘুরে এল আবার ডেমিরনের। 'বোকা গাধার দল! টের পাবে! মিনাকুয়োকে ঘাঁটানো!'

গটগট করে গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে

সবাই।
মৃদু শিস দিয়ে উঠল কিশোর। 'এই মিনাকুয়োটা কে?'

দুই

ইঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো। পুরানো গাড়িটা প্রফেসর ডেমিরনের।
ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে জোরে জোরে মাথা নাড়লেন প্রফেসর ড্যানহ্যাম। 'কি যে একটা কাণ্ড হলো!' তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাদের সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ। কি করতে পারি, বলো?'
রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল রবিন। গলায় ঝোলানো ক্যামেরাটা তুলে এক পা এগোল। 'ছবি তুলতে এসেছি। স্কুল ম্যাগাজিনের জন্যে। যদি অনুমতি দেন তো...'
মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর ড্যানহ্যাম। 'আমার আপত্তি নেই। তবে প্রফেসর ডেমিরনের সঙ্গে ঘটে যাওয়া অঘটনটার ব্যাপারে কিছু না লিখলেই খুশি হব।'
'কিন্তু উনি এত রাগলেন কেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।
'কে তোমরা?'
নিজেদের নাম বলল কিশোর। গোয়েন্দা পরিচয়টা গোপন রাখল।
'আমি মায়া ড্যানহ্যাম। এ অভিযানের প্রধান। জায়গাটা তোমাদের ঘুরে দেখার অনুমতি দিতে পারি, যদি কথা দাও কোন গোলমাল করবে না।'
'না না, গোলমাল করব কেন?' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। 'এখানে খোঁড়াখুঁড়ি চালাচ্ছেন কিসের আশায়, দয়া করে বলবেন?'
হাসলেন প্রফেসর ড্যানহ্যাম। 'আকাশ থেকে এই এলাকার কিছু ছবি তোলা হয়েছিল। সেগুলোকে কম্পিউটারে ঢুকিয়ে দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম রিজের গায়ে অদ্ভুত পাথরের দাগ। পাথরগুলো এখন নেই, কবরের ফলক ছিল ওগুলো। তারমানে জায়গাটা এককালে ছিল গোরস্থান।'
নোটবুকে লিখে নিল রবিন।
কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কি পাওয়ার আশা করছেন এখানে?'
হাসলেন প্রফেসর ড্যানহ্যাম। 'এখন কিছু বলতে চাই না। আগে পাওয়া তো যাক। তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে খারাপ লাগছে না, কিন্তু জরুরী কাজ পড়ে আছে আমার।' তরুণ লোকটার দিকে তাকালেন তিনি। 'ডন, তুমি ওদের সব দেখাতে পারবে?'
'পারব।' তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাল সে। হাত বাড়িয়ে দিল, 'আমি ডোনাল্ড ইয়ানমার। আর্কিওলজির ছাত্র। প্রফেসর মায়া ড্যানহ্যামের টীমে কাজ করছি।'
'প্রফেসর ড্যানহ্যাম কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের?' ভুরু কুঁচকাল কিশোর। 'বয়েস তো একেবারেই কম।'
'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল ডোনাল্ড, 'লস অ্যাঞ্জেলেসে আর্কিওলজির সবচেয়ে অল্পবয়েসী প্রফেসর।' বন্ধ হয়ে যাওয়া ক্যারাভানের দরজাটার দিকে তাকাল সে।

'অসম্ভব ব্রিলিয়ান্ট।...তা কি দেখতে চাও তোমরা?'

'সব কিছু,' জবাব দিল রবিন। 'তবে সবার আগে যদি বলেন ওই বুড়ো ভদ্রলোকের সঙ্গে গোলমালটা কী আপনাদের?' মুসার দিকে তাকাল সে, 'তোমাকে কি বলে যেন ডাকল?'

'রুপানি,' জবাব দিল মুসা। 'মাথাটা পুরোই খারাপ তাঁর।'

'রিটায়ার করার পর থেকেই কেমন উদ্ভট আচরণ শুরু করেন তিনি,' ডোনাল্ড বলল। 'এখন অবশ্য বদ্ধ পাগল। প্রত্নতত্ত্বে অসাধারণ জ্ঞান। এই এলাকার প্রাচীন ইনডিয়ানদের ব্যাপারে তিনি বিশেষজ্ঞ।' লম্বা পাহাড়টার দিকে তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে চলল সে। 'কাহুয়া ইনডিয়ানদের ব্যাপারে কিছু জানো তোমরা?'

'নাহ্, তেমন কিছু না,' কিশোর বলল।

'কয়েক হাজার বছর এ অঞ্চলে রাজত্ব করেছে ওরা।' পাহাড়ের মত উঁচু মাটির ঢিবিটার দিকে হাত তুলল ডোনাল্ড, 'ধারণা করা হচ্ছে খ্রীষ্টের জন্মের দুশো বছর আগে থেকে কবর দেয়া শুরু হয়েছিল ওই গোরস্থানটায়।'

'বাপরে!' চোখ বড় বড় করে ফেলল রবিন। 'তারমানে বাইশশো বছরের পুরানো কবর! অবিশ্বাস্য!'

'হ্যাঁ, তাই। বড় বড় সেনাপতি আর গোত্রের সর্দারদের কবর দেয়া হত ওই গোরস্থানে। মায়ার ধারণা, সাংঘাতিক সব জিনিস পাওয়া যাবে ওখানে।'

'আরও আগেই যে খুঁড়ে তুলে ফেলা হয়নি কি করে শিওর হচ্ছেন?' কিশোরের প্রশ্ন। 'দুই হাজার বছরের মধ্যে বহুবার খোঁড়াখুঁড়ি হয়ে থাকতে পারে, লুট করে নিয়ে যেতে পারে কবর চোরেরা।'

'আমরাও ভেবেছি এ কথা,' হাসল ডোনাল্ড, 'পাওয়া না পাওয়া এখন অনেকটাই ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে। গুজব আছে, জায়গাটায় নাকি ভূতের উপদ্রব। তাতে আমাদের সুবিধেই। ভয়ে আসতে চাইবে না লোকে, বিরক্ত করবে না।'

'তারমানে ভুতুড়ে এলাকা!' রোদের মধ্যেও গায়ে কাঁটা দিল মুসার।

হেসে উঠল ডোনাল্ড। 'আমি ভূত বিশ্বাস করি না। তবে ভূতের উপদ্রবের চেয়েও বেশি উপদ্রব করবেন প্রফেসর ডেমিরন, তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার।'

'তাঁর সম্পর্কে আর কিছু জানাতে পারেন?' অনুরোধ করল কিশোর:

'বেশি কিছু জানি না,' ডোনাল্ড বলল। 'দশ বছর আগে অবসর নিয়েছেন। ইউনিভার্সিটিতে গুজব আছে, শেষ দিকে নাকি খেপামি এতটাই বেড়ে গিয়েছিল তাঁর, বিদেয় করে জানে বেঁচেছে কর্তৃপক্ষ। পুরানো গুজবে তাঁর আগ্রহ। মিথলজি, দেবদেবী আর ওদের অভিশাপে বিশ্বাস করেন। এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের কথা শোনামাত্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চিঠি লেখেন। বলেন, এই এলাকার ধারে কাছে যেন আসতে দেয়া না হয়...' রবিনের দিকে তাকাল সে, 'উঁহুঁ, লিখো না লিখো না, এ সব কথা লিখো না। ডেমিরনের ব্যাপারে পত্রিকায় কিছু না লিখতে বারণ করেছে মায়া, মনে নেই?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কলম থামিয়ে দিল রবিন। 'ক্যামেরা ব্যবহার করতে পারব তো?'

'তা পারবে।'

গলায় ঝোলানো ক্যামেরা তুলে এগিয়ে গেল রবিন। মুসা আর কিশোরকে নিয়ে পাহাড়ের গা থেকে যেখানে ছাল-চামড়া তুলে ফেলা হয়েছে সেদিকে চলল ডোনাল্ড।

'পাওয়া গেছে নাকি কিছু?' জানতে চাইল মুসা।

'না, সবে তো বাইরের পরতটা ছাড়ানো শুরু করেছি।' ছাত্রদের দিকে তাকাল ডোনাল্ড। খুব সাবধানে, কর্ণিক দিয়ে আস্তে আস্তে মাটি খুঁড়ে, প্রায় প্রতিটি কণা পরীক্ষা করে তারপর মাটিগুলো একপাশে ছুঁড়ে ফেলছে ওরা।

উজ্জ্বল সূর্যালোকে মাথার ওপর উঁচু হয়ে থাকা বিশাল ঢিবিটার দিকে মুখ তুলে তাকাল কিশোর। 'মাটি খোঁড়ার জন্যে মোটর-চালিত কিছু ব্যবহার করলে তাড়াতাড়ি হত না?'

'তা হত,' ছোট্ট হাসি দিল ডোনাল্ড। 'কিন্তু তাতে মূল্যবান জিনিস নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। প্রত্নসন্ধান ব্যাপারটাই একটা অতি ধীর গতির কাজ। বহু সময় লেগে যায়। অসম্ভব ধৈর্য দরকার। তাড়াহুড়ো করতে গেলেই সব মাটি। খুব ধীরে ধীরে খুঁড়তে হয়।'

'ভেতরে কি পাবেন আশা করছেন?'

'যদি কোন সর্দারের কবর হয়, তাতে থাকবে অস্ত্র, ধনরত্ন, গহনাপাতি। পরকালে গভীর বিশ্বাস ছিল কাহুয়া ইনডিয়ানদের। ওরা মনে করত, মূল্যবান জিনিস আর অস্ত্রশস্ত্র ওদেরকে পরকাল পাড়ি দিতে, ভাল থাকতে সাহায্য করবে।'

'কবে নাগাদ কবর আবিষ্কার করতে পারবেন ভাবছেন?'

'এর কোন ঠিক নেই। কালও পেয়ে যেতে পারি, আবার মাসের পর মাসও লেগে যেতে পারে। বললামই তো, প্রত্নসন্ধান একটা অসম্ভব ধৈর্যের ব্যাপার।'

'কবর দেখতে আসতে পারব আমরা? অসুবিধে হবে আপনাদের?'

'আমাকে জিজ্ঞেস না করে বরং মায়াকে জিজ্ঞেস করো। ও আমাদের লীডার। তবে অসুবিধে হওয়ার তো কথা নয়, যদি কোন ঝামেলা না করো তোমরা।'

তিন

পরদিন স্কুলে টিফিনের সময় লাইব্রেরি থেকে নিয়ে আসা একটা বই দেখাল রবিন।

বারান্দার সিঁড়িতে বসে আইসক্রীম খাচ্ছে মুসা। ফিরে তাকাল। তবে কোন আগ্রহ প্রকাশ করল না।

কিশোর জানতে চাইল, 'কি বই?'

জবাব দিল না রবিন। মলাট উল্টে, কয়েকটা পাতা সরিয়ে একটা নতুন অধ্যায়ে এসে থামল। অধ্যায়ের নামটা দেখাল। রুপানি: কাহুয়া হর্স-গড!

মুখ তুলে দুই বন্ধুর দিকে তাকাল রবিন। 'মুসাকে কাল রুপানি নামে ডেকেছিলেন পাগলা প্রফেসর, মনে আছে?'

আইসক্রীম খাওয়া থামিয়ে দিল মুসা। চোখ চকচক করে উঠল কিশোরের।

মুচকি হাসল রবিন। তার উদ্দেশ্য সফল। চমকে দিতে চেয়েছিল, পেরেছে। 'লিখেছে কে, সেটা দেখো।'

দেখার জন্যে কাত হয়ে এল মুসা। পড়ল, 'কাহুয়া মিথলজি: অ্যান ইনভেস্টিগেশন ইনটু এনশনট লিজেন্ডস বাই শেফার্ড ডেমিরন, প্রফেসর অভ ইনডিয়ান আর্কিওলজি। 'খাইছে!' হাঁ হয়ে গেল সে। 'ওই পাগলটা লিখেছে!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'পঁচিশ বছর আগে। তারমানে বহুকাল থেকেই এর পেছনে লেগে রয়েছেন তিনি।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'রুপানি সম্পর্কে কি লিখেছেন, পড়েছ নাকি?'

'পড়েছি,' রবিন বলল। 'দাঁড়াও, আবার পড়ছি।'

'পড়ার দরকার নেই,' ধৈর্য রাখতে পারছে না কিশোর। 'মুখেই বলো।'

'রুপানি একজন অশ্ব-দেবতা। কাজ-কর্ম সব ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে করত যে সব দেবতা, তাদের বলা হত অশ্ব-দেবতা। ভীষণ ক্ষমতাশালী দেবতা ছিল রুপানি। মানুষ, জন্তু-জানোয়ার, সব কিছুর রূপ ধরতে পারত। কিশোর বয়েসী কালো মানুষের রূপ ধরতে বেশি ভালবাসত। প্রাচীনকালে শয়তান দেবতা শিংওয়ালা মিনাকুয়োর অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে রুপানির সাহায্য ভিক্ষা করল। তাতে সাড়া দিয়ে মিনাকুয়োকে লড়াইয়ে আমন্ত্রণ জানাল রুপানি। লড়াইয়ের জায়গা নির্বাচন করা হলো বিশাল এক মাটির ঢিবিকে। হেরে গিয়েছিল মিনাকুয়ো। জাদু করে তাকে আটকে ফেলেছিল রুপানি, বন্দি করে রেখেছিল মাটির ঢিবির তলায়, যাতে জ্বালাতে না পারে পৃথিবীর মানুষকে। শত শত বছর ধরে এক ভাবে আটকে আছে মিনাকুয়ো। কাহুয়া ইনডিয়ানদের বিশ্বাস ছিল, কেউ গিয়ে ঢিবি খোঁড়াখুঁড়ি করলেই বেরিয়ে চলে আসবে সেই দানব, ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেবে।'

চোখ মিটমিট করছে মুসা। 'তারমানে পাগলা প্রফেসর বিশ্বাস করেন এ সব?'

'তুমি যদি ভূতপ্রেত, দৈত্যদানবে বিশ্বাস করতে পারো, তিনি করলে দোষ কি?' হাসল রবিন।

'না, তিনি তো একজন প্রফেসর,' ঢোক গিলল মুসা। তাড়াতাড়ি কামড় দিল আইসক্রীমে।

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'প্রফেসর নিশ্চয় বিশ্বাস করেন ডেভিলস রিজেই মিনাকুয়োকে বন্দি করেছিল রুপানি। এ জন্যেই খুঁড়তে বাধা দিতে গিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা, দানবটা বেরিয়ে এসে সব ক'জনকে খুন করবে।'

দুই কামড়ে বাকি আইসক্রীমটুকু সাবাড় করল মুসা। মুখ মুছে বলল, 'দানব বেরোক আর না বেরোক, পাগলটার সামনে দ্বিতীয়বার আর পড়তে চাই না আমি। কেমন ভূতের মত চেহারা। দেখলেই গা ছমছম করে।'

'ভাবছি,' কিশোর বলল, 'কাল আবার ডেভিল'স রিজে যাব। তার আগে কাহুয়া ইনডিয়ানদের সম্পর্কে খানিকটা পড়াশোনা করে নিলে বোধহয় ভাল হয়। সত্য জানতে চাই, মিথলজি বা ভূতের কিচ্ছা নয়।'

'যা ইচ্ছে করোগে তোমরা,' উঠে দাঁড়াল মুসা। 'আমি ওসব ভূতফুতের মধ্যে নেই। আমি ক্লাসে যাচ্ছি।'

*

পরদিন সকালে স্কুলের গেটে মুসার জন্যে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছে রবিন আর কিশোর। একটু আগে ফোন করে জানিয়েছে মুসা, সকালে বাড়ির কাছে হাঁটতে বেরিয়েছিল, প্রফেসর ডেমিরনের সঙ্গে দেখা। তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন প্রফেসর। কিভাবে ঠিকানা জোগাড় করেছেন তিনিই জানেন। অদ্ভুত একটা পাথরের লকেট দিয়ে নাকি বলেছেন গলায় ঝুলিয়ে রাখতে, ওটা তাকে রক্ষা করবে।

'কই আসে না কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

'ওই যে, আসছে,' বলল কিশোর।

সামনে এসে ব্রেক কষল মুসা। সাইকেল থেকে নামল। রবিন আর কিশোর দুজনেই দেখতে পেল তার গলায় ঝোলানো লকেটটা।

খুলে দিল মুসা। হাতে নিয়ে দেখতে লাগল রবিন। গোল চ্যাপ্টা একটা পাথর। মাঝখানে ফুটো করে তাতে চামড়ার ফালি পরানো। হালকা বাদামী রঙ। গা'টা মসৃণ। তবে ফুটোর গা তেমন মসৃণ নয়।

'কি এটা?'

হাত ওল্টাল মুসা, 'আমি কি করে জানব? জিজ্ঞেস করারও সাহস হয়নি। আমার হাতে গুঁজে দিয়ে এমন করে তাকাতে লাগল, ভয়ে জান উড়ে যাবার জোগাড় হয়েছিল আমার। ভয়ঙ্কর উন্মাদ!'

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'একটা কিছু করা দরকার, কি বলো?'

'কি করব?'

'পুলিশের কাছে যেতে পারি। গিয়ে বলতে পারি প্রফেসর ডেমিরন মুসার পিছে লেগেছেন। যে কোন সময় বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারেন।'

মাথা নাড়ল মুসা, 'উঁহু। আমার কোন ক্ষতি করবে বলে মনে হয় না। এখনও করেনি। কেবল কেমন অদ্ভুত চোখে তাকায়।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'যাকগে। বিকেলে ছুটির পরে যাবে নাকি ডেভিলস রিজে? কিছু পেল কিনা ওরা দেখতাম।'

হাসল মুসা। 'পেল কিনা দেখবে, নাকি দেখতে চাও সবাইকে ধরে খুন করল কিনা মিনাকুয়ো?'

ভুরু কুঁচকাল রবিন। 'তুমিও কি এ সব বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছ নাকি?'

গাল চুলকাল মুসা। 'করলেই বা কি? এতবড় প্রফেসর, তিনি যদি করতে পারেন···থাক ওসব কথা। চলো, কিশোর যখন বলছে যেতে চায়, চলেই যাই।'

'ভয় পাবে না?'

'ভয়? তা তো পেতেই পারি। কিন্তু ভয় পেয়ে কখনও কি তোমাদের সঙ্গে কোন জায়গায় যাওয়া বাদ দিয়েছি?'

তা বটে। চুপ হয়ে গেল রবিন।

সাইকেল ঠেলে নিয়ে সাইকেল রাখার ছাউনির দিকে চলল মুসা। তার সঙ্গে সঙ্গে এগোল কিশোর আর রবিন।

'তবে,' অস্বস্তিভরা হাসি হাসল মুসা, 'পাগলা প্রফেসর আবার ওখানে গিয়ে

হাজির না হলেই বাঁচি। ওর চোখের দিকে তাকালে গা'টা কেমন যেন গোলাতে শুরু করে আমার।'

চার

বিকেল বেলা ডেভিল'স রিজে এসে অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন দেখতে পেল না তিন গোয়েন্দা। পরিবর্তনটা কেবল আবহাওয়ায়। আকাশে কালো মেঘ। দু'এক ফোঁটা করে বৃষ্টিও পড়ছে।

গেটের কাছে সাইকেল রেখে এগোল ওরা।

পাহাড়ের ছাল-চামড়া তোলা অংশে এখন খোঁড়াখুঁড়ি চালাচ্ছে ছাত্ররা। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ডোনাল্ড। শার্টের হাতা গোটানো। কনুই পর্যন্ত মাটি লেগে আছে। ঘাসের ওপর মাটির স্তূপ। পাহাড়ের গায়ে গর্তটা গভীর হচ্ছে ক্রমে।

একধারে একটা টেবিল পাতা। তাতে ঝুঁকে বসে লিখছেন প্রফেসর ড্যানহ্যাম।

ডোনাল্ডের দিকে এগিয়ে গেল কিশোর, 'হালো। দেখতে এলাম।'

ফিরে তাকাল ডোনাল্ড। হেসে হাত নাড়ল, 'ভাল করেছ।' টেবিলটার দিকে দেখাল, 'ওই দেখো, কি পেয়েছি।'

চোখ বড় বড় করে টেবিলের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে কিছু ভরে রাখা হয়েছে। ব্যাগের গায়ে লেবেল লাগানো। আরেকটা লেবেল লিখছেন প্রফেসর ড্যানহ্যাম।

'গুপ্তধন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

মুখ না তুলেই হাসলেন প্রফেসর ড্যানহ্যাম। 'গুপ্তধনের চেয়ে বেশি,' বাদামী মাটির পাত্রের একটা ভাঙা টুকরো তুলে দেখালেন। 'একেবারে খাঁটি কাহুয়া জিনিস। লক্ষণ শুভ।' টুকরোটা আরেকটা ব্যাগে ভরলেন। 'এ এক ধরনের কঠিন ধাঁধা। ছড়িয়ে থাকা টুকরোগুলোকে খুঁজে বের করে জোড়া লাগানো।'

'দামী জিনিস নাকি?' মুসা জানতে চাইল।

'সেটা নির্ভর করে অনেক কিছুর ওপর। তোমার কাছে হয়তো অতি ফেলনা মাটির পাত্রের ভাঙা টুকরো, কিন্তু একজন আর্কিওলজিস্টের কাছে সাংঘাতিক দামী, অমূল্য। ওরকম একটা টুকরো থেকেই অনেক কিছু জানতে পারব আমরা, অনেক ইতিহাস। বহু শখের প্রত্নতাত্ত্বিক আর সংগ্রাহক আছে, এই একটা টুকরোর জন্যে হাজার হাজার ডলার খরচ করতে রাজি।'

চেয়ারে পিঠ সোজা করে জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন তিনি। চোখ পড়ল মুসার গলার দিকে। 'আরি! ওটা কি?' সামনে ঝুঁকলেন ভাল করে দেখার জন্যে। 'কোথায় পেলে?'

'প্রফেসর ডেমিরন দিয়েছেন,' মুসা বলল। 'তিনি বলেছেন, এটা আমার রক্ষা-কবচ।...আপনি চেনেন এটা?'

'ডবি স্টোন বলে এগুলোকে। ইয়োরোপের কেলটিকদের মত কাহুয়া ইনডিয়ানরাও শয়তান তাড়াতে এগুলো ব্যবহার করত। কখন দিল?'

মুসার মুখে সব শুনে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'বেচারার জন্যে কষ্ট হয়। এত ব্রিলিয়্যান্ট একটা মগজ...'

গাড়ির এঞ্জিনের শব্দে থেমে গেলেন। ঘুরে তাকালেন গেটের দিকে।

দুরুদুরু করে উঠল মুসার বুক। অস্বস্তিভরা একটা মুহূর্ত। ভাবল, আবার এলেন বুঝি পাগলা প্রফেসর। কিন্তু পুরানো গাড়িটা নয়। গেটের ভেতর ঢুকল একটা রূপালী টয়োটা। গাড়ি থেকে নামল লম্বা একজন মানুষ। চেহারার সঙ্গে বাজপাখির চেহারার অনেক মিল।

খাটো জ্যাকেটের পকেটে দুই হাত ভরে এগিয়ে এল সে। প্রফেসর ড্যানহ্যামের মুখ দেখেই অনুমান করে ফেলল কিশোর, লোকটাকে তিনি পছন্দ করেন না।

'কি চান আবার?' রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর ড্যানহ্যাম।

হাসল লোকটা। 'এ কি কথা বলার ছিরি। আমি কি এতই অচ্ছুৎ?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে টেবিলের দিকে তাকাল লোকটা। 'পেয়েছেন নাকি কিছু?'

'তা জেনে আপনার দরকার কি?'

লোকটা হাসল। টেবিলে ছড়িয়ে থাকা ভাঙা টুকরোগুলো থেকে একটা টুকরো তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'ভাল জিনিস। প্রচুর দামে বিক্রি করা যাবে। চাইলেই তো এখন ফান্ড জোগাড় করে ফেলতে পারেন। আপনার উপকারই আমি করতে চাই...'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। আমার উপকারের ছুতোয় নিজের পকেটটাও ভারী করে নেয়া যায় তাহলে। গ্রেগরি, সেদিনই স্পষ্ট বলে দিয়েছি আমি যা বলার। যা পাব, সব সরাসরি মিউজিয়ামে যাবে। কাজেই এখানে সময় নষ্ট না করে অন্য কোথাও গিয়ে ঘুরাঘুরি করুনগে, যদি লাভের আশা করেন।'

নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে লোকটা বলল, 'মিউজিয়াম আপনাকে কিছুই দেবে না। আমি যা দিতে চাইছি, ব্রিটানির অভিযানটা সহজেই চালাতে পারবেন। ইউনিভার্সিটিও আপনাকে অত টাকা দিতে পারবে না।'

'ব্রিটানির কথা আপনি জানলেন কি করে?'

মুচকি হাসল গ্রেগরি। 'জানানোর লোকের কি অভাব?' ডিগ, অর্থাৎ খনন করা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কাজ কেমন এগোচ্ছে?'

'সেটাও আপনার জানার দরকার নেই,' গ্রেগরির হাত থেকে টুকরোটা কেড়ে নিলেন প্রফেসর ড্যানহ্যাম। 'যান এখন, বিদেয় হোন। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ হবে না।'

দমল না গ্রেগরি। জ্যাকেটে আঙুল মুছতে মুছতে বলল, 'কোথায় আমাকে পাওয়া যাবে জানা আছে আপনার। যদি মত বদলান, যোগাযোগ করবেন।'

গাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল সে। 'আপনার ফোনের অপেক্ষায় থাকব আমি।'

একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে তিন গোয়েন্দা।

গাড়িতে উঠল লোকটা। ঘাসের ওপর অনেকখানি জায়গা জুড়ে চক্কর দিয়ে গাড়ি ঘোরাল। এগিয়ে গেল গেটের দিকে।

'লোকটা কে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।
'দালাল! একেবারেই ছ্যাঁচড়া!...' তিক্তকণ্ঠে জবাব দিলেন প্রফেসর ড্যানহ্যাম।
হেসে পরিবেশটাকে হালকা করার চেষ্টা করল কিশোর। 'আমরা কোন সাহায্য করতে পারি?'
'সাহায্য?' টেবিলের জিনিসগুলোর দিকে তাকালেন প্রফেসর ড্যানহ্যাম। 'ঠিক আছে, করতে চাইলে করো। আরও কয়েকটা ব্যাগ দরকার। ক্যারাভানে পাবে। এনে দেবে?'
'এখুনি যাচ্ছি।'
'ধরো, এগুলোও নিয়ে যাও?' টেবিল থেকে বোঝাই করা ব্যাগগুলো তুলে কিশোরের বাড়ানো হাতে রেখে দিলেন প্রফেসর ড্যানহ্যাম। 'টেবিলের ওপর রেখে এসো।'
'আমরা কিরব?' রবিনের প্রশ্ন।
'তোমাদের তো কোন কাজ দেখছি না আপাতত।'
রবিন বলল, 'তাহলে আমরা বরং গিয়ে দেখি ডোনাল্ডরা আর কিছু খুঁজে পেল কিনা। মুসা, যাবে?'
মাথা ঝাঁকাল মুসা। রওনা হয়ে গেল দুজনে।
ক্যারাভানে ঢুকল কিশোর। বিশৃঙ্খল অফিসের মত লাগল জায়গাটাকে। ছোট একটা টেবিল কাগজপত্রে বোঝাই। দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা রাশি রাশি মলাটের বাক্স। দরজার কাছে স্তূপ করে ফেলে রাখা হয়েছে কাপড়-চোপড় আর ব্যাগ।
টেবিলের কোথায় রাখবে বুঝতে পারল না সে। এগোতে গিয়ে পা বেধে গেল কিসে যেন। কোনমতেই তাল সামলাতে পারল না। উপুড় হয়ে পড়ে গেল কাপড়ের স্তূপের ওপর।
উঠে বসল তাড়াতাড়ি। আতঙ্কিত। ব্যাগের জিনিসগুলো ভাঙল কিনা কে জানে! কিসে পা বেধেছিল দেখল।
একটা লাল-সাদা রাক-স্যাক। ফিতেয় আটকে গিয়েছিল পা। টান লেগে রাক-স্যাকের ভেতরের জিনিসপত্র মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে।
'ধূর!' নিজেই নিজেকে ধমকাল কিশোর। ব্যাগগুলো পড়েছে একটা গদির ওপর। ভাঙলে খুব খারাপ হবে।
উঠে বসল। রাক-স্যাকের ভেতর থেকে বেরিয়ে থাকা একটা জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ওটা। কাপড়ে মোড়া জিনিসটার ওজন অবাক করল তাকে। কাপড়ের একটা কোণ সামান্য সরে গেছে। ভেতরে হলুদ রঙ চোখে পড়ছে।
কোণাটা আরেকটু সরাল সে। সোনালি একটা মাথা বেরিয়ে পড়ল তাকিয়ে রইল যেন তার দিকে। মানুষের মাথা। মানুষের মুখ। কিন্তু দুটো শিং।
বাইরে চিৎকার শোনা গেল। ঝট করে ফিরে তাকাল কিশোর। কেউ দেখে ফেলল নাকি? না, দেখেনি।
চিৎকারটা শোনা গেছে ডিগের কাছ থেকে।
দ্রুত আবার কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল মূর্তিটা। রাক-স্যাকে ঢুকিয়ে রাখল।

বেরিয়ে যাওয়া বাকি জিনিসগুলোও ঠেসে ঢুকিয়ে দিল আবার।

গদিতে পড়ে থাকা ব্যাগগুলো তুলে নিয়ে ছোট টেবিলটাতেই রাখল কোনমতে কাগজের ওপর। তারপর একটা বাক্সের ওপর রাখা একগাদা খালি ব্যাগ দেখে ছোঁ মেরে কয়েকটা তুলে নিয়ে ছুটে বেরোল ক্যারাভান থেকে।

সবাই এখন ডিগের কাছে। উত্তেজনায় ছটফট করছে রবিন।

নিশ্চয় কিছু পাওয়া গেছে।

দেখার জন্যে দৌড় দিল কিশোর।

মিস ড্যানহ্যামের হাতে ছোট, চ্যাপ্টা একটা ধূসর রঙের চারকোনা পাথর। ভীষণ উত্তেজিত তিনি। তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বাকি সবাই। উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে সবার মুখ।

'গড-স্টোন,' প্রফেসর ড্যানহ্যাম বললেন। খানিক আগের রাগের চিহ্নমাত্র নেই এখন চেহারায়। পাথরটা থেকে মাটি সরাতে লাগলেন তিনি। ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখো, চিহ্নগুলো। এখন বুঝলে তো, আগাগোড়া আমার ধারণাই ঠিক ছিল। নিশ্চয় অভিজাত কাউকে কবর দেয়া হয়েছে এখানে।'

'কি এটা?' জানতে চাইল কিশোর।

'আমরা যে সঠিক পথে এগোচ্ছি, তার প্রমাণ। কাহুয়া ইনডিয়ানরা তাদের কবরের প্রবেশমুখে এ সব পাথর পুঁতে দিত। তারা এগুলোকে পবিত্র মনে করত। বিশ্বাস করত, এ সব পাথর ডিঙিয়ে শয়তান ঢুকতে পারবে না ভেতরে।'

চ্যাপ্টা পাথরটায় অস্পষ্ট আঁচড়ের মত দাগ দেখতে পেল কিশোর। কিসের দাগ বুঝতে পারল না।

'এই দাগগুলো কিসের, প্রফেসর?' জিজ্ঞেস করল একজন ছাত্র। 'মুছে গেছে মনে হচ্ছে?'

মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর। যেন আদর করে আঙুল বোলাতে লাগলেন দাগগুলোর ওপর। 'ঘোড়া আঁকা হয়েছিল। পিঠে সওয়ারি। অশ্ব-দেবতা রুপানির প্রতিকৃতি। রুপানি ছিল ওদের একজন মহা ক্ষমতাশালী রক্ষাকর্তা। দেবতার এই প্রতিকৃতি আঁকা পাথর কেবল অনেক বড় যোদ্ধা কিংবা সর্দারের কবরে রেখে যেত ওরা।'

কনুই দিয়ে কিশোরের পাঁজরে খোঁচা মারল মুসা। ফিসফিস করে বলল, 'শুনছ, আবার সেই রুপানি!'

'ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে যেতে হবে এটা।' ধূসর আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালেন প্রফেসর ড্যানহ্যাম। 'খুব বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে।' ছাত্রদের দিকে মুখ ফেরালেন। 'ঢেকেঢুকে রাখো সব। পানি যাতে ঢুকতে না পারে।'

পাঁচ

পরদিন স্কুলে টিফিনের সময় রবিন জিজ্ঞেস করল, 'ছুটির পর যাবে নাকি আজও?'

'যাব,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল মুসা।

'ভূতের ভয় করে না?' মুচকি হাসল রবিন।
'করে। করলেও যাব। ওই খোঁড়াখুঁড়ি দেখতে খারাপ লাগছে না আমার।'
কিশোর বলল, 'ডেভিল'স রিজে যাওয়ার আগে মিউজিয়ামে যাব আমি। স্কুলের লাইব্রেরিতে একটা বই পেয়েছি, তাতে রাকারুয়া হিল নামে একটা জায়গার কথা লেখা আছে, ডেভিল'স রিজ থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে। কাহুয়া ইনডিয়ানদের আরেকটা গোরস্থান। কয়েক বছর আগে ওখানেও প্রচুর জিনিস পাওয়া গেছে। মিউজিয়ামের ডিসপ্লেতে আছে এখন, সবার দেখার জন্যে। দেখে আসতে চাই।'
'আমি তো ভাবলাম ছুটির পর সোজা ডেভিল'স রিজে যাবে,' মুসা বলল।
'ওখানেও যাব, তবে আগে মিউজিয়াম। মিউজিয়াম তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়।'
স্কুল ছুটির পর সোজা মিউজিয়ামে এল তিন গোয়েন্দা। তিন-চারটে মাঝারি আকারের ঘর নিয়ে ছোট মিউজিয়ামটা গির্জার পেছনে। শহরের পুরানো এলাকায়।
চত্বর ঘিরে থাকা রেলিঙের সঙ্গে শেকল দিয়ে সাইকেল তিনটে বাঁধল ওরা। তালা লাগাল। তারপর এসে ঢুকল মিউজিয়ামের সামনের লবিতে। ডেস্কের ওপাশে বসে উল দিয়ে কি যেন বুনছেন এক বৃদ্ধা। ডেস্কে স্তূপ করে রাখা পোস্ট কার্ড আর গাইড বুক। চওড়া একটা খিলানের ওপাশে রয়েছে ঘরগুলো। সারি দিয়ে ডিসপ্লে কেবিনেট সাজানো।
বৃদ্ধার সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। 'এক্সকিউজ মি। রাকারুয়া হিলে পাওয়া কাহুয়া ইনডিয়ানদের জিনিসগুলো দেখতে এসেছি। কোন ঘরে আছে, দেখাবেন, প্লীজ?'
মুখ তুলে তাকালো বৃদ্ধা। 'শুধু ওগুলো দেখতেই এসেছ মনে হচ্ছে? কিন্তু এখন তো দেখানো যাবে না।'
ভ্রূকুটি করল কিশোর, 'কেন?'
'নেই।'
'নেই! মানে?'
'ডিসপ্লেতে নেই। ইউনিভার্সিটির কয়েকজন ছাত্র গবেষণা করছে ওগুলো নিয়ে। ওঅর্করুমে তালা দেয়া।' ওদের হতাশায় যেন আশার আলো সঞ্চার করতে চাইলো বৃদ্ধা, 'আগামী হপ্তায় এসো। ততদিনে ডিসপ্লেতে এসে যেতে পারে।'
কিন্তু হতাশা দূর হলো না কিশোরের।
বুঝতে পারলো বৃদ্ধা, 'দেখাটা জরুরী ছিল নাকি?'
'ছিল, স্কুলের ম্যাগাজিনের জন্যে লিখব ভাবছিলাম, তাড়াহুড়ো...আগামী হপ্তায় হলে দেরি হয়ে যাবে।'
'দেখি, আর কোনভাবে সাহায্য করতে পারি নাকি,' একটা গাইড-বুক তুলে নিয়ে পাতা ওল্টালো বৃদ্ধা। 'এই যে, কিছু ছবি আছে জিনিসগুলোর। দেখো, এতে হয় কিনা।'
ডেস্কে ছড়িয়ে রাখা বইটার ওপর ঝুঁকে এল তিন গোয়েন্দা।
চোখ বড় বড় হয়ে গেল কিশোরের। ছবিগুলোর মধ্যে রয়েছে শিংওয়ালা একটা মানুষের মূর্তি। প্রফেসর ড্যানহ্যামের ক্যারাভানে রাক-স্যাকের মধ্যে যেটা দেখেছিল অবিকল সে-রকম।

ছবিগুলোর নিচে সংক্ষিপ্ত নোট। যে পেয়েছে, তার নামও রয়েছে। মূর্তিটার নিচের নাম দেখে হাঁ হয়ে গেল কিশোর। 'প্রফেসর ডেমিরন পেয়েছেন এটা?'

'চেনো নাকি তাঁকে?' বৃদ্ধা বললো।

'চিনি বললে ভুল হবে। দেখেছি।'

'কোথায় দেখলে? আজকাল তো কারও সঙ্গেই দেখা করেন না। সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। আগে আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হত। বছর দুয়েক হলো, তা-ও হয়নি। শুনলাম, পুরোপুরিই মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

প্রফেসরের প্রসঙ্গে যেতে চাইল না কিশোর। 'মূর্তিটা সত্যি আছে তো আপনাদের মিউজিয়ামে? হারায়নি?'

বিস্ময় দেখা দিল বৃদ্ধার চোখে। 'হারাবে কেন! আজ সকালেও তো দেখলাম ওঅর্করূমে। এ কথা বলছ কেন?'

'দু'দিন আগে অবিকল এ রকম একটা মূর্তি আমি দেখেছি,' সাবধানে বলল কিশোর। 'আপনার জানামতে একটাই আছে, না আরও আছে?'

'লস অ্যাঞ্জেল্‌সের জনসন মিউজিয়ামে আরেকটা আছে,' বৃদ্ধা জানালো 'আরও চার-পাঁচটা আছে অন্যান্য জায়গায় তবে যদ্দূর জানি রকি বীচের কয়েক মাইলের মধ্যে এই একটাই পাওয়া গেছে।'

'ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। চলি।'

মুসা আর রবিনকে প্রায় বগলদাবা করে নিয়ে মিউজিয়াম থেকে উড়ে বেরোল কিশোর।

'মিস ড্যানহ্যামের রাক-স্যাকে এ রকম মূর্তিই দেখেছি, আমি শিওর,' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে। 'কোন সন্দেহ নেই আমার।'

মুসা বলল, 'কিন্তু বৃদ্ধা কি বললেন শুনেছ–মূর্তিটা নাকি আজ সকালেও দেখেছেন। ওঅর্কশপে তালা দিয়ে রাখা। আমার মনে হয় তুমি ওটার নকল-টকল দেখেছ।'

নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'কি জানি, হবে হয়তো। কিন্তু অবাক লাগছে আমার, মূর্তিটা প্রফেসর ডেমিরন খুঁজে পেয়েছেন শুনে। নিশ্চয় ওখানকার কবর থেকে জিনিসগুলো খুঁড়ে বের করার পর পাগল হয়েছেন তিনি।' দুই সহকারীর দিকে তাকাল সে। 'হয়তো ওখানে কিছু ঘটেছিল।'

'কি?' ভুরু নাচাল রবিন। 'কোনও ধরনের অভিশাপ?'

জবাব না দিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে রবিনের দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল কিশোর। তারপর মাথা ঝাড়া দিয়ে যেন আপাতত দূর করে দিতে চাইল মূর্তিটার ভাবনা। 'চলো, ডেভিল'স রিজে।'

সেখানে আজ অন্য রকম দৃশ্য। গেটের বাইরে বেশ কয়েকটা গাড়ি দাঁড়ানো, টিবিটার কাছে ছোটখাট ভিড়।

সাইকেল রেখে দৌড় দিল তিন গোয়েন্দা। বারো-তেরোজন মানুষ দেখা গেল। চিৎকার করে প্রশ্ন করছে কেউ, কেউ ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলছে।

সাংবাদিকের দল, বুঝতে অসুবিধে হলো না। ঘেরের মাঝখানে ফাঁক করে

নিয়ে ভেতরে তাকাল কিশোর। গোল হয়ে ঘিরে থাকা মানুষগুলোর কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছেন প্রফেসর ড্যানহ্যাম। উঁচু করে ধরে রেখেছেন একটা উজ্জ্বল জিনিস। রোদে চকচক করছে।

হাঁ হয়ে গেল কিশোর।

'কি হলো?' পাশে এসে ধাক্কা দিয়ে দাঁড়াল মুসা।

'সোনার মূর্তি।'

'খাইছে! পেয়ে তাহলে গেলই!'

রবিন এসে দাঁড়াল আরেক পাশে। ওর দিকে কাত হয়ে ফিসফিস করে বলল কিশোর, 'কি, মিউজিয়ামের ছবির মূর্তিটার মতন না?'

বিমূঢ়ের মত মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'পুরো ব্যাপারটাই একটা জুয়াচুরি!' বিড়বিড় করল কিশোর। 'ধাপ্পাবাজি!'

ছয়

বোকা হয়ে তাকিয়ে আছে তিনজনে।

হাসিতে উদ্ভাসিত প্রফেসর ড্যানহ্যামের মুখ। মূর্তিটা তুলে দেখাচ্ছেন, খেলায় জিতে খেলোয়াড় যেমন করে ট্রফি দেখায়।

কিশোরের মন্তব্য চমকে দিয়েছে মুসা আর রবিনকে। জুয়াচুরি! তারমানে প্রফেসর ড্যানহ্যামের হাতের ওই মূর্তিটা নকল!

'কি করবে এখন?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'বুঝতে পারছি না,' দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর।

'জুয়াচুরিটা ফাঁস করে দেয়া দরকার,' রবিন বলল।

'কি করে? গিয়ে বলব আপনি একটা মিথ্যুক?'

'কিন্তু কিছু তো অবশ্যই করা দরকার,' কিশোরকে ঠেলা দিল রবিন। 'যাও, গিয়ে বলেই ফেলো রাক-স্যাকে এ রকম আরেকটা মূর্তি দেখেছ তুমি। বললে কি করবে ওরা? তুমি তো সত্যি সত্যি দেখেছ।'

আবার ঘেরের দিকে এগোল কিশোর। দ্বিধা কাটাতে পারছে না। প্রফেসর ড্যানহ্যামের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ডোনাল্ড। একান ওকান হাসি। এমন ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে প্রফেসর ড্যানহ্যামের দিকে, যেন তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ময়কর মহিলা।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছে সাংবাদিকেরা। সটাসট ক্যামেরার শাটার টিপছে।

ঠেলেঠুলে সবার সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর।

'প্রফেসর ড্যানহ্যাম,' চিৎকার করে বলল সে, 'কয়েক বছর আগে রকি বীচের কাছেই আরেকটা এ রকম মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল, তাই না?'

ঘুরে তাকালেন প্রফেসর ড্যানহ্যাম। কিশোরের চিৎকার কানে গেছে। 'হ্যাঁ। এখান থেকে মাত্র পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে। পেয়েছিলেন প্রফেসর শেফার্ড ডেমিরন

'দুটো একই ধরনের মূর্তি এত কাছাকাছি খুঁজে পাওয়াটা কেমন অস্বাভাবিক না?' প্রশ্ন করল কিশোর।

হাসি সামান্য মলিন হয়ে গেল প্রফেসর ড্যানহ্যামের। 'অস্বাভাবিক তো বটেই। তবে কখনও পাওয়া যায়নি এমন নয়। একই আমলে দুটো কবরে দুজন বড় যোদ্ধা বা সর্দারকে কবর দেয়া হয়ে থাকলে এক রকমের মূর্তি সঙ্গে দেয়া হতে পারে। এত কাছাকাছি বলেই সেটা বরং স্বাভাবিক–কারণ এক গোত্রের লোক বাস করত ধরে নেয়া যেতে পারে; তাহলে তাদের দেবতাও হবে এক।'

গুঞ্জন উঠল জনতার মাঝে। ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকল আরও একজন।

ডিপ গ্রেগরি। চোখের পাতা সরু করে তাকিয়ে আছে প্রফেসর ড্যানহ্যামের দিকে। দুই হাত পকেটে ঢোকানো।

'আপনাদের আর কোন প্রশ্ন না থাকলে,' প্রফেসর বললেন, 'আমাকে এখন মাপ করুন। ইউনিভার্সিটিতে যাব। এটার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করব। আমার কথা শুনতে আসার জন্যে ধন্যবাদ। নতুন কিছু পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার দাওয়াত দেব আপনাদের।'

'এক মিনিট,' কর্কশ কণ্ঠে বলল গ্রেগরি। 'আপনি বললেন–তবে কখনও পাওয়া যায়নি এমন নয়।'

'হ্যাঁ, বলেছি,' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল প্রফেসরের কণ্ঠ।

হাসল গ্রেগরি। 'নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে উল্টোপাল্টা কাজ করে বসেছে আর্কিওলজিস্টরা, এটাও শোনা যায়নি এমন নয়।'

জ্বলে উঠল প্রফেসরের চোখ। 'কি বলতে চান?'

কান খাড়া হয়ে গেছে কিশোরের। গ্রেগরিরও সন্দেহ আছে তাহলে মূর্তিটার ব্যাপারে!

সবগুলো চোখ এখন গ্রেগরির দিকে।

'বলতে চাই,' বলল সে, 'বড় ধরনের কোন অভিযানে যাওয়ার টাকা জোগাড়ের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলে অনেক অনভিপ্রেত কাজও করে বসতে পারে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক। যেমন ধরা যাক ফ্রান্সের ব্রিটানিতে কোন প্রত্নসন্ধানের ইচ্ছে যদি থেকে থাকে কারও। ওখানে গিয়ে খননকাজ চালাতে বিরাট অঙ্কের টাকা দরকার।'

'মুখ সামলে কথা বলবেন!' রাগে লাল হয়ে গেলেন প্রফেসর।

জোরাল গুঞ্জন উঠল শ্রোতাদের মাঝে।

নড়ে উঠল ডোনাল্ড।

'ডন!' হাত চেপে ধরলেন প্রফেসর। 'ওর কথা ছাড়ো। ও এসেছেই গোলমাল পাকাতে।'

'প্রফেসর,' একজন রিপোর্টার বলল, 'এই অভিযোগের কোন জবাব দেবেন আপনি?'

'কি জবাব দেব? যা বলার আগেই বলেছি,' আরও লাল হয়ে যাচ্ছে প্রফেসরের কান, ঘাড়, গলা। 'নতুন করে কিছু বলার নেই। তবু জিজ্ঞেস যখন করছেন, বলি আরেকবার, আজ বিকেলে ডেভিল'স রিজে পাওয়া গেছে মূর্তিটা। খুঁজে পেয়েছে আমার এক ছাত্র, ডোনাল্ড ইয়ানমার। এখন নিয়ে যাওয়া হবে ইউনিভার্সিটিতে, এটার

বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করানোর জন্যে। প্রমাণ করতে হবে আসল না নকল,' গটগট করে গ্রেগরির সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। উঁচু করে ধরলেন মূর্তিটা। 'দেখো তো ভাল করে। নকল কি মনে হয়?'

গ্রেগরি কি বলে শোনার জন্যে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল কিশোর।

হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখল গ্রেগরি। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল প্রফেসর ড্যানহ্যামের দিকে। 'মনে তো হচ্ছে আসলই!' মূর্তিটা আবার প্রফেসরের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'অফিশিয়াল রিপোর্ট শোনার জন্যে আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করব আমি।'

একটা কথাও আর না বলে ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে ভিড় ঠেলে পথ করে নিতে লাগল।

দর্শকদের দিকে তাকিয়ে মুখে হাসি ফুটালেন আবার প্রফেসর। 'সাধারণ একজন অ্যানটিক বিক্রেতা নিশ্চয় দু'চারটা ফালতু কথা বলে আমাদের এতবড় আনন্দে বিঘ্ন ঘটাতে পারবে না, কি বলেন?'

সাত

পরদিন আরেক চমক অপেক্ষা করছিল তিন গোয়েন্দার জন্যে।

শনিবার। স্কুল ছুটি। সকাল বেলাতেই এসে হাজির হয়েছে ডেভিল'স রিজে।

একটা অচেনা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ওপর। গেটে তালা দেয়া।

ভেতরে তাকাল ওরা। নির্জন মাঠ। ল্যান্ড-রোভারটা নেই।

'কেউ নেই কেন?' ক্যারাভানটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'কি হয়েছে?'

'বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছে করছে না হয়তো কারও,' মুসা বলল। 'সকাল বেলা প্রায়ই ওরকম হয় আমার।'

'উঁহু, আমার তা মনে হয় না। অন্য কিছু হয়েছে।'

'ঢুকে দেখলেই তো হয়,' বলে দেরি করল না রবিন। গেটে চড়ে বসল। অন্যপাশে পা ঝুলিয়ে লাফ দিয়ে নামল মাটিতে। ফিরে তাকাল কিশোরের দিকে, 'এসো। এটাই সুযোগ। ক্যারাভানে কেউ না থাকলে রাক-স্যাকের মূর্তিটা দেখব আরেকবার।'

মুসা আর কিশোরও গেট ডিঙাল।

ক্যারাভানের দিকে এগোল তিনজনে। ভেজা ঘাসে আটকে যাচ্ছে জুতোর ছাপ। কাউকে চোখে পড়ছে না এখনও।

ক্যারাভানের কাছে পৌঁছতে দেখা গেল ফাঁক হয়ে আছে দরজা।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'কি বলেছিলাম? মানুষ আছে। উঠতে দেরি করছে।'

সিঁড়িতে পা রাখতে গিয়েও কি ভেবে পা'টা সরিয়ে আনল কিশোর। ডাক দিল, 'কেউ আছেন?'

দরজায় বেরিয়ে এল একজন অচেনা লোক।

'ঢুকলে কি করে?' কঠোর দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাতে লাগল লোকটা।
'গেট ডিঙিয়ে,' জবাব দিল কিশোর। 'প্রফেসর ড্যানহ্যামের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমরা। তিনি কি উঠেছেন? আমাদেরকে আজ কোন কাজ দেবেন কিনা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।'
'উনি আমাদের চেনেন,' রবিন বলল। 'সেদিনও তাঁর কাজ করে দিয়েছি।'
ভুরু কুঁচকে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা। 'একবারও তোমাদের মাথায় ঢোকেনি যে গেটে তালা দেয়াই হয়েছে কেউ যাতে ভেতরে ঢুকতে না পারে?'
হাসল কিশোর, 'ভাবলাম, আমাদের দিয়ে সাহায্য হবে...'
'কাজ বন্ধ। আজ খোঁড়াখুঁড়ি হবে না এখানে।'
'কেন?' রবিনের প্রশ্ন। 'কালও তো দেখলাম পাগলের মত মাটি খুঁড়ছে।'
'চুরি হয়েছে। আজ ভোর বেলা চোর ঢুকেছিল ক্যারাভানে। ইউনিভার্সিটি থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছে পাহারা দেয়ার জন্যে। পুলিশ না আসা পর্যন্ত থাকব।'
'চোর ঢুকেছিল?' নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল কিশোর। 'নিয়েছে নাকি কিছু?'
'খুঁড়ে পাওয়া জিনিস ভর্তি কয়েকটা ব্যাগ নিয়ে গেছে,' লোকটা জানাল।
'মূর্তিটা?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'ওটাও নিয়েছে?'
'না,' মাথা নাড়ল লোকটা। 'ওটা ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আগেই।'
'ছাত্ররা গেল কোথায়? কাল রাতে ছিল না কেউ এখানে?'
'ছিল। মূর্তিটা পাওয়ার পর ছাত্রদের বিশ্রামের ছুটি দিয়েছেন প্রফেসর ড্যানহ্যাম। বাড়ি চলে গেছে ওরা। তবে পাহারায় একজন ছিল, ডোনাল্ড নামে একটা ছেলে, কাল রাতটা কাটিয়েছে এখানে। চোর নিশ্চয় নজর রেখেছিল, ও বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকেছে। পরনের কাপড় ময়লা হয়ে গিয়েছিল ডোনাল্ডের, তাই নতুন কাপড় আনতে গিয়েছিল। মাত্র এক ঘণ্টা সময় পেয়েছে চোর। এরইমধ্যে কাজ সেরে চলে গেছে।' বুকের ওপর দুই হাত ভাঁজ করে রাখল লোকটা। 'কিন্তু এখানে তোমাদের ঘুরঘুর করার কোন যুক্তি দেখি না আমি। আজ এখানে কোন কাজ হবে না পুলিশ আসবে। তদন্ত হবে। তারপর কাজ শুরুর প্রশ্ন।'
খবরটা দমিয়ে দিল গোয়েন্দাদের। ধীর পায়ে গেটের দিকে ফিরে চলল ওরা।
'কি বুঝলে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।
'কি আর বুঝব?' জবাব দিল মুসা, 'মূর্তিটার পেছনে লেগেছে কেউ, এ তো সহজ কথা। মূর্তি না পেয়ে অন্য জিনিস নিয়ে চলে গেছে। এত কষ্ট করে ঢুকে খালি হাতে বিদেয় হতে চায়নি।'
'পায়নি, তারমানে রাক-স্যাকে ছিল না,' যুক্তি দেখাল রবিন। 'এবং তারমানে ওটাই সাংবাদিকদের দেখিয়েছেন প্রফেসর ড্যানহ্যাম। জিজ্ঞেস করা দরকার।'
'কাকে?' ভুরু নাচাল কিশোর।
'ডোনাল্ডকে,' রবিন বলল। 'সে-ও নিশ্চয় জানে ওটার কথা। প্রফেসর ড্যানহ্যামের ডান হাত সে। আসল না নকল, ক্যারাভানে কেন রাখা হয়েছে ওটা, বলতে পারবে।'

'কিন্তু প্রফেসর ড্যানহ্যামের কোন গোপন কথা আমাদের কাছে ফাঁস করবে না ডোনাল্ড,' কিশোর বলল। 'যদি জেনেও থাকে, বলবে না।'

'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?'

'তা করা যায়,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল। হাত তুলল, 'ঠিক আছে, তোমরা এখানে দাঁড়াও। আমি লোকটাকে জিজ্ঞেস করে আসি, ডোনাল্ডের ঠিকানা জানে কিনা।'

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইল মুসা আর রবিন। ঘাস মাড়িয়ে এগিয়ে গেল কিশোর।

দুই মিনিট পর একটা কাগজের টুকরো হাতে করে ফিরে এল। নেড়ে দেখিয়ে হাসিমুখে বলল, 'হোভার লেনে একটা বোর্ডিং হাউজে থাকে।'

'চিনি,' বলে উঠল মুসা। 'এসো আমার সঙ্গে।'

লেনটা রকি বীচের এক প্রান্তে। শহরের একটা পুরানো এলাকায়। পুরানো বসতবাড়িগুলোর কোন কোনটা এখনও বসতবাড়িই আছে, বাকিগুলোকে সংস্কার করে দোকানপাট বানিয়ে ফেলা হয়েছে।

বোর্ডিং হাউজটা খুঁজে বের করতে অসুবিধে হলো না। দরজা খুলে দিল ছোটখাট সাদা চুল এক বৃদ্ধা। রান্নাঘরে কাজ করতে করতে উঠে এসেছেন। তোয়ালে দিয়ে হাত মুছছেন। হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি চাও?'

ডোনাল্ডের নাম বলল কিশোর। তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

কোন ঘরে থাকে ডোনাল্ড, বলে দিলেন বৃদ্ধা।

তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে সরু একটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল তিন গোয়েন্দা।

দরজায় টোকা দিল কিশোর।

'কে?' সাড়া দিল ডোনাল্ড।

'আমি,' কিশোর বলল।

'ট্যাক্সি এসেছে?' দরজা খুলে দিয়ে অবাক হয়ে গেল ডোনাল্ড। হাঁ করে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দার দিকে।

'চুরির খবরটা শুনেছি আমরা,' কিশোর বলল।

হাসি মলিন হয়ে গেল ডোনাল্ডের। 'মনে করিয়ো না আর। ভাবলেই মনে হয় নিজেকে ধরে চাবকাই। সব দোষ আমার। ওভাবে আমার চলে আসা উচিত হয়নি কোনমতেই।...কিন্তু আমার ঠিকানা পেলে কোথায়?'

'ওখানে যে লোকটা আছে, তার কাছে। আমরা আসাতে কি কিছু মনে করেছেন?'

'না না, মনে করব কেন,' হাসল ডোনাল্ড। 'মায়া বলল, সোমবারের আগে আর কোন কাজ হবে না; ভাবলাম, এ সুযোগে বাড়ি গিয়ে বাবা-মার সঙ্গে দেখাটা সেরে আসি। ট্যাক্সি আনতে পাঠিয়েছি। তোমরা টোকা দিলে, ভাবলাম সে-ই বুঝি এসেছে।'

'অ! এসে আর লাভ হলো না।'

'হতাশ হয়েছ মনে হচ্ছে?'

'তা কিছুটা তো হয়েছিই। ভাবলাম, আপনার কাছে এলে প্রফেসর ড্যানহ্যামের এই অভিযান সম্পর্কে অনেক তথ্য পাব, স্কুলের ম্যাগাজিনে লেখার জন্যে। কিন্তু আপনি তো চলে যাচ্ছেন।' ডোনাল্ডের সন্দেহ না জাগিয়ে কি করে মূর্তিটার কথা জিজ্ঞেস করা যায় ভাবছে কিশোর।

'কি জানতে চাও? মায়াকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেই তো পারো।'

'আসলে, তাঁকে আর বিরক্ত করতে চাই না। আমরা···মানে, ওই মূর্তিটা···আমাদের অবাক করেছে।'

হাসল ডোনাল্ড। 'তা তো করবেই। কি সাংঘাতিক আবিষ্কার। ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ এখন মায়াকে ব্রিটানি অভিযানে পাঠানোর জন্যে পাগল হয়ে যাবে, ফান্ডের কোন অসুবিধে হবে না আর।'

'হ্যাঁ, সে তো বুঝেছিই,' সাবধানে বলল কিশোর। 'কিন্তু, দেখুন, আমি বলছিলাম কি···'

বাধা পড়ল বৃদ্ধার ডাকে, 'ডোনাল্ড, তোমার ট্যাক্সি এসে গেছে।'

তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে শুকনো হাসি হাসল ডোনাল্ড, 'সরি। আমার যেতে হচ্ছে।' ঘরে ঢুকে একটা ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে ফিরে এল আবার। 'কিছু জানার থাকলে নিশ্চিন্তে মায়ার কাছে চলে যাও। কিছুই মনে করবে না সে। তোমাদের সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে।'

কিন্তু কথা সরছে না আর কিশোরের মুখে। হাঁ করে তাকিয়ে আছে ডোনাল্ডের রাক-স্যাকটার দিকে। সেই লাল-সাদা রঙের, যেটাতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল সে। যেটা থেকে বেরিয়ে পড়েছিল রহস্যময় মূর্তিটা।

আট

ঘাসের ওপর কাত করে রাখা তিনটে সাইকেল। তিন গোয়েন্দা গিয়ে বসেছে একটা পুরানো ওক গাছের শিকড়ে। আকাশের নিচুতে ঝুলে রয়েছে ভারী মেঘের স্তর; সারারাত বর্ষণের পূর্বাভাস।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'আলোচনাটা কে আগে শুরু করতে চাও?'

নোটবুক খুলল রবিন। 'প্রথম প্রশ্ন, মূর্তিটা আসল না নকল?'

নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন দু'বার চিমটি কাটল কিশোর। তারপর বলল, 'আমি ভেবেছিলাম, রাক-স্যাকটা প্রফেসর ড্যানহ্যামের।'

'আমার প্রশ্ন,' আবার বলল রবিন, 'মূর্তিটা আসল, না নকল?'

'আসল না নকল, সে-কথা পরে। তবে ডিগে মূর্তিটা আগেই মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছিল, খুঁজে পাওয়ার জন্যে।'

'অত ভণিতা না করে খুলেই বলো না।'

'আমাদের হাতে কি কি সূত্র আছে?' এক আঙুল তুলল কিশোর, 'এক, ডোনাল্ডের রাক-স্যাকে আমি একটা সোনার মূর্তি দেখেছি।'

'তাতে কি?' মুসার প্রশ্ন।

'বাধা দিয়ো না, আমাকে শেষ করতে দাও।' দুই আঙুল তুলল কিশোর, 'দুই, প্রফেসর ড্যানহ্যাম এমন কিছু পেতে চেয়েছেন যার ওপর ভিত্তি করে ফ্রান্সে খুঁড়তে যাওয়ার টাকা জোগাড় করতে পারেন।'

'তিন,' রবিন বলল, 'প্রফেসর ড্যানহ্যাম আর ডোনাল্ডের মাঝে এমন কোন সম্পর্ক আছে, যার কারণে ডোনাল্ড ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও প্রফেসরের নাম ধরে ডাকে, তুমি তুমি করে কথা বলে, শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক এমন হয় না। যে কারও চোখে পড়তে বাধ্য। তোমাদের পড়েনি?'

'পড়েছে,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'আর সেই সম্পর্কের কারণেই ডোনাল্ড হয়তো চাইছে, যে কোন ভাবেই হোক, টাকাটা জোগাড় হোক, ফ্রান্সে যাওয়া হোক প্রফেসর ড্যানহ্যামের।'

'আসছি আমি সে-কথায়। তার আগে আরেকটা জিনিস আলোচনা করে নিই। মূর্তিটা আসল কিনা পরীক্ষা করানোর জন্যে ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে গেছেন প্রফেসর ড্যানহ্যাম। নকল কিনা বুঝতে বিশেষজ্ঞদের কত সময় লাগবে? বড়জোর দশ সেকেন্ড।'

'নকল হলে গ্রেগরিই বুঝে ফেলত,' মুসা বলল। 'এ সব জিনিস নিয়ে কারবার করে সে। ইউনিভার্সিটির বিশেষজ্ঞদের চেয়ে অ্যানটিক কম চেনে না।'

'তা তো নয়ই,' কিশোর বলল। 'ডোনাল্ড যদি করে থাকে কাজটা, অর্থাৎ যদি পুঁতে রেখে থাকে, তাহলে কাঁচা কাজ করবে না। আসলটা রাখবে। আর ওটা যেখান থেকে এনেছে সেখানে এমন কিছু রাখবে যেটার রঙ, ওজন, আসল সোনার জিনিসের মতই হবে, গ্রেগরির মত লোকও যা দেখে দ্বিধায় পড়ে যাবে, এমনকি ইউনিভার্সিটির বিশেষজ্ঞরাও ঝট করে দেখে বুঝতে পারবেন না ওটা আসল না নকল।'

মাথা নাড়তে নাড়তে রবিন বলল, 'নাহ্, তোমার কথা ধাঁধার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে আমাকে। কি বলতে চাও?'

'গ্রীক ভাষা শুরু করেছে,' রেগে গেছে মুসা, 'বুঝবে কি করে? স্বভাব কি আর বদলায় কোনকালে মানুষের!'

হেসে ফেলল কিশোর। 'এ তো সহজ, না বোঝার তো কিছু নেই। মিউজিয়ামে বৃদ্ধা মহিলা কি বলেছিল মনে নেই? কাহুয়া ইনডিয়ানদের জিনিসপত্র তালা দিয়ে রেখে দিয়েছে ছাত্রদের গবেষণার জন্যে। আমার বিশ্বাস, গিয়ে খোঁজ নিলে জানতে পারব সেই ছাত্রদের মধ্যে ডোনাল্ডও একজন।'

'নাহ্,' হতাশ ভঙ্গিতে হাত ওল্টাল মুসা, 'গ্রীক থেকে মঙ্গলগ্রহের ভাষায় চলে গেল এবার!'

কিন্তু রবিন বুঝে ফেলেছে। চিৎকার করে উঠল, 'তারমানে...তারমানে মিউজিয়ামের মূর্তিটা...'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'এই তো বুঝেছ।'

হাঁ করে দুজনের দিকে তাকাচ্ছে মুসা। 'তোমাদের দুজনেরই কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি!'

তার কথা যেন কানেই ঢুকছে না রবিনের। চেঁচিয়ে বলল, 'আসল মূর্তিটা সে

চুরি করে নিয়ে গিয়ে রাক-স্যাকে লুকিয়ে রেখেছিল। ডেভিল'স রিজের মাটিতে পুঁতে রাখার জন্যে!'

'তা কি করে হয়?' বিশ্বাস করতে চাইল না মুসা। 'কিশোর মূর্তিটা ডোনাল্ডের রাক-স্যাকে দেখার পরও মহিলা তাদেরটা ওঅর্কশপে দেখেছেন।'

'চালাকিটা এখানেই,' কিশোর বলল। 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বৃদ্ধা যেটা দেখেছেন সেটা নকল। ওঅর্কশপে বসে মাটি দিয়ে বানিয়েছে ডোনাল্ড, তাতে সোনার রঙ করে দিয়েছে। মিউজিয়ামে রাখা কোন জিনিস আসল না নকল বিশেষ প্রয়োজন না পড়লে তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না কেউ, সন্দেহ না হলে পরীক্ষা করেও দেখতে যাবে না, সেই চান্সটাই নিয়েছে ডোনাল্ড—তারমানে নকলটাই দেখেছেন মহিলা।'

কিশোরের কথাটা হজম করতে সময় লাগল মুসার।

রবিন বলল, 'তোমার কি মনে হয়, ডোনাল্ড একা করেছে কাজটা; না প্রফেসর ড্যানহ্যামও এতে জড়িত? যদি কোন সম্পর্ক থেকে থাকে দুজনের, গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, তাহলে আলাপ-আলোচনা করে, প্ল্যান করে কাজটা করতে বাধা কোথায়? ডোনাল্ডকে সহজেই ব্যবহার করতে পারেন প্রফেসর ড্যানহ্যাম।'

'সেটা সম্ভব। কিন্তু এ ব্যাপারে আর কিছু বলার আগে, আমার মনে হয় মিউজিয়ামে গিয়ে জেনে আসা দরকার, সত্যি সত্যি ছাত্রদের মধ্যে ডোনাল্ডের নাম রয়েছে কিনা। না থাকলে ওকে নিয়ে আলোচনার কোন মানে হয় না।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'তাহলে আর দেরি করছি কেন? চলো, এখনি যাই।'

'হালো,' ডেস্কের ওপাশে বসা বৃদ্ধা মহিলার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর, 'আমাদের চিনতে পারছেন?'

মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধা। 'পারছি। স্কুল ম্যাগাজিনের জন্যে ফিচার লিখছ। কিন্তু এখনও তো দেখানো যাবে না।'

সামনে এগিয়ে গেল কিশোর। তার মধুরতম হাসিটা উপহার দিয়ে বলল, 'দেখুন, দেরি করব না মোটেও। এক পলক তো দেখতে দিতে পারেন?'

'পারলে সত্যি মানা করতাম না,' আন্তরিক কণ্ঠে বললেন বৃদ্ধা। 'চাবিই নেই আমার কাছে। তালা দিয়ে চাবি নিজের ড্রয়ারে আটকে রেখে চলে গেছেন কিউরেটর। মিউজিয়াম বন্ধ হওয়ার আগে আসবেন বলে গেছেন। তোমাদের বেশি জরুরী হলে তখন আরেকবার এসে তিনি এলেন কিনা দেখে যেতে পারো।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'হ্যাঁ, তা-ই করব।...আচ্ছা, আরেকটা কথা, ওই জিনিসগুলো নিয়ে যে সব ছাত্ররা গবেষণা করছে, তাদের নাম তো নিশ্চয় জানাতে পারবেন?'

'তা পারব।' ড্রয়ার খুলে কাগজপত্র ঘাঁটতে লাগলেন বৃদ্ধা। 'সবাইকে স্পেশাল পাস দিতে হয় আমাকেই,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি। 'যাকে-তাকে তো আর ঢুকতে দেয়া যায় না। কে কখন কোনদিক দিয়ে শয়তানি করে বসে ঠিক আছে কিছু।...এই যে, পেয়েছি, পাঁচজন: ডেভিড করমোর্যান্ট, জুলিয়া জনসন, এরিক ওয়ারনার, ডোনাল্ড ইয়ানমার আর স্টেফি...'

'থ্যাংকস,' বাধা দিয়ে থামিয়ে দিল কিশোর। যা জানার জানা হয়ে গেছে। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।' হাসিমুখে ফিরে তাকাল দুই সহকারীর দিকে। নীরব দৃষ্টি বলছে–কীহ্, বলেছিলাম না!

'ঠিক আছে, পরে এসো,' বৃদ্ধা বললেন।

'আচ্ছা,' বলে দুই সহকারীকে নিয়ে দরজার দিকে রওনা হলো কিশোর। সিঁড়ির কাছে পৌঁছে বলল, 'আমি জানতাম, আমার কথাই ঠিক হবে।'

'এ আর নতুন কি,' মুসা বলল। 'তোমার কথা কি আর কখনও বেঠিক হয়।'

'কিন্তু মিউজিয়ামে এখন একটা নকল মূর্তি আছে,' রবিন বলল, 'এ কথাটা জানানো উচিত ছিল তাঁকে।'

'জানাতে পারতাম,' কিশোর বলল। 'কিন্তু জানানোর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে ফোন করতেন উনি।'

'তাতে অসুবিধে কি?' মুসার প্রশ্ন। 'মূর্তি যদি চুরিই গিয়ে থাকে...'

'অসুবিধে আছে। তাহলে শুধু ডোনাল্ডকেই ধরবে পুলিশ। প্রফেসর ড্যানহ্যাম এতে জড়িত থাকলে তাঁকে আর জড়ানো যাবে না, সমান অপরাধ করেও পার পেয়ে যাবেন। সেটা ঘটতে দিতে চাই না আমি।'

'তাহলে কি করবে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'প্রফেসর ড্যানহ্যামের সঙ্গে দেখা করব। তাঁকে বলব, কি কি জানতে পেরেছি আমরা।'

'সেটা কি ঠিক হবে?'

'এ ছাড়া আর কি করতে পারি? তাঁর জানা থাকলে ঘাবড়ে গিয়ে বলে দিতে পারেন সব। না জানলে ধরে নিতে হবে ডোনাল্ড একাই করেছে কাজটা; পুলিশকে জানাতে তখন আর দ্বিধা থাকবে না আমাদের।'

'আমার মনে হয় না প্রফেসর ড্যানহ্যামের অজান্তে এত কিছু করেছে ডোনাল্ড,' রবিন বলল।

'গিয়ে কথা বললেই বোঝা যাবে।'

মুসা বলল, 'কিন্তু তাঁকে পাওয়া যাবে কোথায়? ডেভিল'স রিজে তো যাবেন না নিশ্চয়।'

'ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে খোঁজ নিতে পারি,' রবিন বলল।

'সে তো বিশ মাইলের ধাক্কা,' বলল কিশোর। 'অতদূর সাইকেল চালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে না এখন আমার।'

'তাহলে ফোন করা যেতে পারে,' মুসা বলল। 'নম্বর জোগাড় করা কঠিন হবে না। ফোন করে প্রফেসর ড্যানহ্যামকে চাইতে পারি। বলব, জরুরী কথা আছে।'

'কিন্তু তিনি যদি সেখানে না থাকেন?'

'তাহলে বাড়ির নম্বর চাইতে পারি।'

'যদি বাড়ির নম্বর তোমাকে না দেয় ওরা?'

'এত যদি যদি করছ কেন!' জবাব খুঁজে না পেয়ে রেগে উঠল মুসা। 'এত সমস্যা না দেখিয়ে দয়া করে নিজেই বলে ফেলো না কি করব?...প্রফেসরকে কোনভাবেই পাওয়া না গেলে আবার ফিরে যাব মিউজিয়ামে। কিউরেটরের সঙ্গে

দেখা করে সব জানাব। তাতে চলবে না?'

'ডোনাল্ড একা বিপদে পড়বে জেনেও?'

'এ ছাড়া আর কি করার আছে?...আসলে প্রশ্ন করে করে নিজেও শিওর হয়ে নিতে চাইছি, সত্যি কি করা উচিত আমাদের।...চলো, অতশত চিন্তা না করে আগে ফোনই করা যাক।'

নয়

রিসিভার ক্রেডলে রেখে ফোন বুদ থেকে বেরিয়ে এল মুসা।

'কি? পেলে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ওখানে নেই,' মুখ গোমড়া করে জানাল মুসা। 'যে লোকটা ধরেছে, সে জানাল মাত্র দুই মিনিট আগে বেরিয়ে গেছেন প্রফেসর।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে ঝাঁজাল স্বরে বলল, 'খামাখা তর্ক করে তুমি সময় নষ্ট না করলে পেয়ে যেতাম।'

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, 'বাড়ির নম্বর নিয়েছ?'

'না। ওরা বলল, ব্যক্তিগত নম্বর দিতে নিষেধ আছে। তখন বললাম, স্কুলের ম্যাগাজিনের জন্যে ফিচার লিখছি। মূর্তিটার ব্যাপারে জানতে আগ্রহী। পরীক্ষা করা হয়েছে কিনা আসল না নকল। ওরা বলল, আসল।'

চমকাল না কিশোর। 'যা বলেছিলাম।'

'কিন্তু প্রফেসর ড্যানহ্যাম নাকি সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। তিনি আরেকজন বিশেষজ্ঞকে দেখাতে চান। তাঁর কাছেই গেছেন এখন। বিশেষজ্ঞের নাম জানতে চাইলাম। কি বলল জানো?'

এইবার আগ্রহী মনে হলো কিশোরকে। 'কি?'

'প্রফেসর শেফার্ড ডেমিরন।'

'বলো কি?' চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবিনের।

মাথা ঝাঁকাল মুসা, 'হ্যাঁ। শুনে তো নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।'

'অবশ্য,' কিশোর বলল, 'এ ব্যাপারে ডেমিরন যে সবার চেয়ে বড় বিশেষজ্ঞ, তাতে কোন সন্দেহ নেই–যদিও পাগলও সবার চেয়ে বড়।' চিন্তা করার জন্যে থামল এক মুহূর্ত। ঘড়ি দেখল। 'শোনো, ডেমিরনের কাছে যেতে প্রফেসর ড্যানহ্যামের আধঘণ্টা লাগবে। আমরা যদি এখনই রওনা হয়ে যাই, তাহলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। কথা বলতে পারব।'

'ঠিক বলেছ,' রবিন বলল। 'যদি আমাদের আগেই গিয়ে পৌঁছান, তাতেও কোন অসুবিধে নেই। তাঁর জন্যে মিলের বাইরে অপেক্ষা করব।'

'চলো,' কিশোর বলল।

সাইকেলের দিকে দৌড় দিল তিনজন।

আগে আগে চলেছে মুসা। শহরের বাইরে বেরোতে সময় লাগল না। দুই পাশে

মাঠ, ঝোপঝাড়। সেগুলো ছাড়িয়ে আসতেই চোখে পড়ল ডেভিল'স রিজ।

গেটের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় প্যাডালে দাঁড়িয়ে ভেতরে তাকাল কিশোর। তেরপল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে টিবির খোঁড়া অংশটা। জনমানুষের চিহ্নও নেই।

ডেভিল'স রিজ পেছনে ফেলে এল ওরা। একই রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল। পথের শেষ মাথায় গিয়ে মোড় নিলে পাওয়া যাবে প্রফেসর ডেমিরনের বাড়ি, মুসা জানাল।

সামনে বাঁক।

বাঁক পেরিয়ে ছুটে আসতে দেখা গেল একটা গাড়িকে। আরেকটু হলেই গুঁতো লাগিয়ে দিত মুসার সাইকেলে। সাঁই করে সরে গেল সে। রূপালী রঙের একটা টয়োটা।

মোড়ের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা।

ব্রেক কষল মুসা। তার প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল অন্য দুজন।

'ডিপ গ্রেগরি গেল!' চিৎকার করে বলল সে।

'দেখলাম তো। খুব তাড়া আছে মনে হলো,' কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলল রবিন। 'যে ভাবে চালাচ্ছে, অ্যাক্সিডেন্ট করবে তো।'

সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আর কতদূর?'

'এসে গেছি,' মুসা জানাল। 'বড়জোড় আর দেড়শো গজ। ওই যে মোড়টা দেখা যাচ্ছে, তার ওপাশে।'

আবার প্যাডালে চাপ দিল ওরা। রাস্তা এখন ঢালু। প্রায় উড়ে চলল। পথের দুধারে বড় বড় গাছ। রাস্তার ওপর ঝুঁকে, গায়ে গায়ে লেগে থেকে মাথার ওপরে খিলান তৈরি করেছে। আসল আলো ঢেকে দিয়ে সৃষ্টি করেছে অদ্ভুত এক ধরনের সবুজ আলো-আঁধারি।

একেবারে নিচে, ডান ধারে গাছপালার খানিকটা বিরতি দেখা গেল। সেখান থেকে সরু আরেকটা পথ ঢুকে গেছে বনের মধ্যে।

'ওটাই,' মুসা জানাল। 'গোস্ট মিলে যাওয়ার রাস্তা।'

প্রায় একই সঙ্গে সবার চোখে পড়ল গাড়িটা। একটা ল্যান্ড-রোভার দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ধারে।

ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল তিনজন।

জায়গাটা অতিরিক্ত নীরব।

'আমাদের আগেই এসে গেছেন,' রবিন বলল।

ভ্রূকুটি করল কিশোর। ধীরে ধীরে সাইকেল চালিয়ে এসে গাড়িটার পাশে থামল। লক্ষ করল, ড্রাইভারের পাশের দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে।

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল সে। ঠিকমত দরজা লাগালেন না কেন? গাড়িতে আছেন নাকি প্রফেসর? ভাবল সে।

সাইকেলটা কাত করে রাখল মুসা। ফাঁক হয়ে থাকা দরজাটার দিকে এগোল। তারপর মাটির দিকে চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল 'খাইছে' বলে

কি হয়েছে দেখার জন্যে দৌড়ে এল রবিন আর কিশোর।

ঘাসের ওপর দলামোচড়া হয়ে পড়ে আছে নিথর দেহটা।
অস্ফুট একটা শব্দ বেরোল রবিনের মুখ থেকে।
'প্রফেসর ড্যানহ্যাম!' ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে কিশোর।

দশ

'মরে গেল নাকি...' ফিসফিস করে বলল মুসা। জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে।

প্রফেসর ড্যানহ্যামের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল কিশোর। দেখল, মাথার পেছনে রক্ত!

'গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গেছেন?' ঝুঁকে দেখছে রবিন।

মাথা নাড়ল কিশোর, 'উঁহু! জখমটা মাথার পেছনে। অথচ পড়ে আছেন উপুড় হয়ে।' নাড়ী দেখল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'বেঁচে আছেন।' কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিয়ে ডাকল, 'প্রফেসর? প্রফেসর, শুনতে পাচ্ছেন?'

সাড়া নেই।

মুখ তুলে দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। 'একটা ফোন দরকার। অ্যামবুলেন্স ডাকতে হবে। রবিন, তুমি থাকো। মুসা, এসো আমার সঙ্গে।'

'মাইলখানেক দূরে এক সারি কটেজ আছে,' মুসা বলল। 'ওখানে গিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'তারচেয়ে মিলটাতে ঢুকি না কেন? প্রফেসর ডেমিরনের বাড়িতে? তাঁর বাড়িতে টেলিফোন না থাকার কথা নয়।'

'কি জানি!'

'চলো, গিয়ে তো দেখা যাক। না পেলে তখন অন্য চিন্তা করব।'

সাইকেলের দিকে ছুটল দুজনে।

পেছন থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'পুলিশকে ফোন করবে নাকি?'

'দেখি,' জবাব দিল কিশোর।

খাড়াই এড়াতে টিলাটক্কর আর পাহাড়ের গোড়া দিয়ে এঁকেবেঁকে যাওয়া ঘোরানো পথটা ধরল ওরা। বন রয়েছে চতুর্দিকে। সামনে নিঃসঙ্গ দাঁড়ানো মিলটা। রোগাটে চেহারার একটা বিল্ডিং। অন্ধকার জানালা। ছাল-চামড়া ওঠা দেয়ালের গোড়ায় হাঁটু সমান ঘাস, ঝোপঝাড়ে ভরা। ঢালু চালাটা শ্যাওলায় সবুজ।

সাইকেল রেখে দৌড়ে এসে সামনের দরজার কাছে দাঁড়াল দুজনে। কলিং বেল নেই। পুরানো আমলের কালো রঙের লোহার নকার আছে। শয়তানের চেহারার মত করে বানানো। ভয়ঙ্কর চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। মুখ হাঁ করে দাঁত দেখিয়ে ভেঙচি কাটছে। জিভ বের করা। ওসবের দিকে তাকানোর সময় নেই এখন। হ্যামার তুলে বাড়ি মারল কিশোর।

ঝনঝন করে প্রাচীন বাড়িটার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ল নকারের বিকট শব্দ।

'কাজটা কি ঠিক হচ্ছে?' অস্বস্তি বোধ করছে মুসা। 'প্রফেসর ডেমিরনের মত

একজন পাগলের বাড়িতে ফোন আছে, এ কথা বিশ্বাস হয় তোমার?'

'জিজ্ঞেস না করলে জানব কিভাবে?' পর পর তিনবার বাড়ি মারল কিশোর। কান পেতে শুনল। কারও সাড়া পেল না। পায়ের শব্দ এগিয়ে এল না দরজা খুলে দেয়ার জন্যে। মুসার দিকে তাকাল সে। 'পেছন দিকে গিয়ে দেখা দরকার। ঢোকার দরজা আছে নিশ্চয়।'

'দরকারটা কি এত কষ্টের,' মুসার পছন্দ হচ্ছে না মোটেও। 'অন্য কোন বাড়িতে গেলেই পারি।'

কিন্তু বাড়ির কোণের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে ততক্ষণে কিশোর। পা আটকে দিচ্ছে ঘাসের দঙ্গল। প্রায় বিধ্বস্ত একটা দেয়াল চোখে পড়ল তার। দরজা একটা দেখা গেল বটে, কিন্তু ঘাস আর কাঁটাঝোপে এমন করে ঢেকে আছে যে ওখান দিয়ে গলে বেরোনো কঠিন।

স্রোতের শব্দ কানে আসছে। কাছেই নদী। গভীর, সরু নদীর খরস্রোতা বাদামী পানি বয়ে যাচ্ছে দ্রুত, ক্রমাগত ঘুরপাক খেয়ে যাচ্ছে মিলের শ্যাওলায় ঢাকা বিশাল চাকাটাকে ছুঁয়ে। চাকা ঘুরলে জাঁতা ঘুরবে, জাঁতা ঘুরলে শস্য পেষাই হবে। এখন সে-সব বন্ধ। কত বছর ধরে বন্ধ কে জানে।

চাকা থেকে খানিক দূরে নদীর ওপরে সরু, ছোট একটা ব্রিজ। এত পুরানো, মনে হচ্ছে পা রাখলেই ধসে পড়বে নিচের পাক খেয়ে বয়ে যাওয়া ঘোলা পানিতে।

বিল্ডিঙের পেছনে ছোট একটা দরজা। খোলা। পায়ে চলা একটা পথ চলে গেছে পানির কিনারে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাক দিল কিশোর, 'প্রফেসর ডেমিরন, বাড়ি আছেন? প্রফেসর!'

সাড়া নেই এবারও। ঘাস, লতাপাতা আর ঝোপ মাড়িয়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেল সে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আবার ডাক দিল, 'প্রফেসর!'

আবহাওয়া গরম। সামান্য পরিশ্রমেই ঘাম বেরিয়ে গা আঠা হয়ে যায়। কিন্তু মিলটার মধ্যে ঠাণ্ডা। বরফের মত শীতল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এমন কায়দায় বাড়িঘর বানানো হত যাতে ঠাণ্ডা আটকে থাকে, প্রচণ্ড গরমের দিনেও গরম না লাগে—এক ধরনের এয়ারকন্ডিশনিং সিসটেম। বাড়ি পুরানো, কিন্তু তাক আর টেবিলে রাখা জিনিসগুলো অনেক আধুনিক।

হলওয়েতে ঢুকল দুজনে। আবছা অন্ধকার। ধূসর রঙের দেয়ালগুলো ভেতরের দিকে অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঠেলে এসেছে, ধসে পড়ার হুমকি দিচ্ছে। কার্পেটের অবস্থা বড়ই করুণ। ছেঁড়া, ফাটা, সুতো বেরোনো।

আরেকটা খোলা দরজা দেখা গেল। তার ওপাশে ছোট একটা বসার ঘর। কালচে-খয়েরী কাঠের আসবাব আর চামড়ায় মোড়া পুরানো সোফা। দেয়ালের তাক বইয়ে ঠাসা। প্রচুর বই আর কাগজপত্র মেঝেয় লুটাচ্ছে। দেয়ালে ঝোলানো অলঙ্করণের জিনিসপত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওদের। ভয়ঙ্কর চেহারার মুখোশ রয়েছে কয়েকটা। তার নিচে অন্ধকার ছায়ার মধ্যে বেদিতে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের সব জন্তু-জানোয়ার, দেবদেবতা ও শয়তানের মূর্তি। চালাটা ধরে রেখেছে কালো রঙের কাঠের মোটা মোটা কড়ি-বরগা। পুরানো হয়ে নিচের দিকে বেঁকে এসেছে। ভয় লাগল ওদের। ভার সইতে না পেরে কোন সময় ভেঙে পড়ে ওদের মাথার ওপর।

বাতাসে ভাপসা গন্ধ।

'কিশোর, চলো, পালাই!' ফিসফিস করে বলল মুসা।

'ওই যে!' বলে উঠল কিশোর।

এমন করে বলল কিশোর, চমকে গেল মুসা। ভাবল কি না কি দেখেছে। চিৎকার দিয়ে দৌড় মারতে যাবে এই সময় চোখে পড়ল টেলিফোনটা। দেয়াল ঘেঁষে রাখা একটা টেবিলে পুরানো আমলের একটা ব্যাকলাইট টেলিফোন সেট।

'হাত দেয়াটা কি ঠিক হবে?' গলা কাঁপছে মুসার। 'যদি প্রফেসর চলে আসে?'

'এলে আসবেন,' এগিয়ে গেল কিশোর। 'অকারণে তো আর ফোন করছি না আমরা। জরুরী বলেই।'

ভারী রিসিভারটা তুলে কানে ঠেকাল সে।

মুসার চোখ ঘুরছে চতুর্দিকে। পাথরের মূর্তিগুলোকে জীবন্ত লাগছে তার, চোখগুলো যেন ওর দিকেই তাকিয়ে আছে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে।

ডায়াল করল কিশোর। প্রথমে অ্যামবুলেন্সকে খবর দিল। তারপর জানাল পুলিশকে। সন্তুষ্ট হয়ে রিসিভারটা রেখে মুসাকে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরের উষ্ণ, স্বাভাবিক আবহাওয়ায়। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ওদের পক্ষে যা করার করেছে, প্রফেসর ড্যানহ্যাম এখন টিকে থাকলেই হয়।

ফিরে এসে দেখল, জ্ঞান ফিরেছে প্রফেসরের। গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে বসেছেন। মাথার পেছনে জখমটাকে চেপে ধরে রেখেছেন কাপড় দিয়ে। পাশে বসে আছে রবিন।

'ফোন করেছ?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল 'চলে আসবে।' প্রফেসরের দিকে তাকাল, 'কি হয়েছিল?'

ঘোলাটে দৃষ্টিতে তাকালেন প্রফেসর। 'জানি না। গাড়িতে ঢুকতে যাব, কিসের যেন বাড়ি লাগল মাথার পেছনে। আর কিছু মনে নেই।'

'গ্রেগরির কাজ!' বলে উঠল মুসা।

মাথা ঘোরাতে গিয়ে ব্যথা লাগতেই চোখমুখ কুঁচকে ফেললেন প্রফেসর ড্যানহ্যাম। 'কার কাজ?'

'আসার সময় ডিপ গ্রেগরিকে দেখলাম গাড়িতে করে পালাচ্ছে,' মুসা জানাল। 'এই তো, কয়েক মিনিট আগে। ও কি এখানে এসেছিল নাকি?'

মাথা নাড়তে গিয়েও ব্যথা পাবেন মনে পড়ায় থেমে গেলেন প্রফেসর। 'জানি না। ওকে দেখিনি আমি।' দম নিলেন। 'প্রফেসর ডেমিরনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে গাড়িতে উঠছি এ সময় বাড়ি লাগল মাথায়। আর কিছু মনে নেই।'

'দেখা হয়েছে প্রফেসরের সঙ্গে?' জানতে চাইল কিশোর।

'হয়েছে। মূর্তিটা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওঁর সঙ্গে কথা বলে একটা ব্যাপারে শিওর হতে চেয়েছি। অদ্ভুত একটা ব্যাপার...' থেমে গেলেন তিনি। 'আরে মূর্তি!' হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে। 'কোথায় ওটা? ব্রীফকেসে ছিল!'

ঘাসের মধ্যে খুঁজে বেড়াল ওরা। মুসা গিয়ে গাড়ির মধ্যেও দেখে এল।

কোথাও নেই ব্রীফকেস। মূর্তিটাও গায়েব।

'এর মানে বুঝতে পারছেন?' মুসা বলল। 'ডিপ গ্রেগরি নিয়ে গেছে ওটা।'

রবিন বলল, 'ওকে পালাতে দেখেছি আমরা।'

ঘড়ি দেখল কিশোর, 'পুলিশ আসে না কেন?'

কয়েক মিনিট পরেই এসে হাজির হলো পুলিশ। অ্যাম্বুলেন্সটা এল ওদের পেছন পেছন।

পুলিশকে সব জানানো হলো।

'মূর্তিটা কি দামী?' জিজ্ঞেস করল একজন অফিসার।

কাঁধে একটা কম্বল জড়িয়ে দেয়া হয়েছে প্রফেসর ড্যানহ্যামের। অ্যাম্বুলেন্সের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রশ্ন শুনে ফিরে তাকালেন, 'দামী মানে? অমূল্য!'

আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে অফিসার বলল, 'কিন্তু প্রফেসর, এত দামী একটা জিনিস বহনের জন্যে যে পরিমাণ সতর্কতা বা প্রহরার প্রয়োজন ছিল, তার কোনটাই আপনার ছিল না। প্রথমে তালা ভেঙে আপনার ক্যারাভানে চোর ঢুকল, তারপর এখন...'

চিৎকার শুনে থেমে গেল অফিসার। গাড়িতে ব্রীফকেসটা আছে কিনা নিশ্চিত হবার জন্যে ল্যান্ড-রোভারে ঢুকেছিল একজন পুলিশম্যান। চিৎকার করেছে সে। ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল পেছনের দরজা।

কি হয়েছে দেখার জন্যে ছুটে গেল তিন গোয়েন্দা। ড্রাইভারের সীটের পেছনে মেঝেতে পড়ে আছে পাথর আর ভাঙা তৈজসপত্র ভরা কয়েকটা ব্যাগ।

চিনতে পেরে বলে উঠল কিশোর, 'এগুলোই তো ক্যারাভানে ছিল!'

সাদা হয়ে গেল প্রফেসরের মুখ। 'কি ব্যাপার কিছু তো বুঝতে পারছি না!' পুলিশ অফিসারের সন্দিহান চোখের দিকে তাকালেন তিনি। 'সত্যি বলছি। বিশ্বাস করুন। আমি এর কিছুই জানি না। কোত্থেকে এল, কিচ্ছু না।'

স্থির দৃষ্টিতে প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল অফিসার, 'এগুলোই ডেভিল'স রিজে আপনার ক্যারাভান থেকে চুরি গিয়েছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ...কিন্তু আমার গাড়িতে এল কি করে জানি না!'

শীতল দৃষ্টিতে প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে রইল অফিসার।

প্রফেসরকে ড্যানহ্যামকে নিয়ে চলে গেল অ্যাম্বুলেন্স। পুলিশ গেল তাদের সঙ্গে।

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'এবার কি?'

ঘড়ি দেখল কিশোর। 'এখন রওনা দিলে মিউজিয়াম বন্ধের আধঘণ্টা আগে পৌঁছতে পারব। দেখি গিয়ে, কিউরেটর এলেন কিনা।...কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না। এত হই-চই, এত হট্টগোল, আমরাও গিয়ে বাড়িতে ঢুকলাম, কিন্তু দেখতে পেলাম না ঘরকুনো প্রফেসর ডোমিরনকে। তিনি গেলেন কোথায়?'

জবাবটা পেল মিউজিয়ামে এসে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় এক বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ল।

রিসেপশনে বসা বৃদ্ধা আর ওদের অপরিচিত আরেকজন লোক প্রফেসর ডেমিরনকে শান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার

করছেন প্রফেসর। লাঠি তুলে বাড়ি মারার ভঙ্গি করছেন।

'প্রফেসর ডেমিরন!' ভুরু কুঁচকে ফেলল কিশোর, 'এখানে কি করছেন?'

'পাগলামি! যার যা কাজ,' মুসা বলল।

ঘরে ঢুকল ওরা। অপরিচিত ভদ্রলোক প্রফেসরের হাত ধরে তাঁকে থামানোর বৃথা চেষ্টা করছেন। লাফ দিয়ে সরে গেলেন প্রফেসর। লাঠি তুলে ঘোরাতে শুরু করলেন মাথার ওপর।

'প্রফেসর, প্লীজ, শান্ত হোন,' ভদ্রলোক বললেন। 'প্লীজ!'

'অত কথা শুনতে চাই না আমি। আমার জিনিসগুলো বের করুন, জলদি!' চিৎকার করে উঠলেন প্রফেসর। মাথার পেছনে লম্বা চুল নাচছে। রাগে মুখ টকটকে লাল। ভাঁজগুলো আরও গভীর। 'জিনিসগুলো আমি পেয়েছি, এটা তো ঠিক। আমার জিনিস আমার কাছ থেকে এভাবে লুকিয়ে রাখার মানে কি?'

'লুকিয়েছি কে বলল? চলুন, দেখাচ্ছি। আসুন আমার সঙ্গে...' ঝট করে মাথা নুইয়ে ফেললেন তিনি, লাঠির বাড়ি থেকে বাঁচার জন্যে।

'চোরের দল!' গর্জে উঠলেন প্রফেসর। 'চোর কোথাকার! সব ব্যাটা চোর!'

'পুলিশকে ফোন করুন তো,' বৃদ্ধাকে বললেন ভদ্রলোক। বোঝা গেল তিনিই কিউরেটর। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে তাঁর। রেগে গেছেন তিনিও।

'পুলিশ! পুলিশ কি করবে আমার!' এত জোরে চিৎকার করে উঠলেন প্রফেসর, চমকে গেল সবাই।

মুসার দিকে চোখ পড়ল প্রফেসরের। চিৎকার করে উঠলেন আবার, 'রুপানি! রুপানি! তুমি এসেছ কেন?'

লাঠি তুলেছিলেন কিউরেটরকে বাড়ি মারার জন্যে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। লাগল গিয়ে একটা কাঁচের ডিসপ্লে কেসে। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল সেটা।

এগারো

কাঁচ ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল অ্যালার্ম। মিউজিয়ামে কোন অঘটন ঘটলেই বেজে ওঠে, জানায় সতর্ক সঙ্কেত।

হাত থেকে লাঠি ফেলে দিয়েছেন প্রফেসর। কব্জি চেপে ধরেছেন। ভাঙা কাঁচের টুকরো লেগে কেটে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে।

'মিস কোরাজন,' বৃদ্ধার উদ্দেশে চিৎকার করে উঠলেন কিউরেটর, 'অ্যালার্মের সুইচ অফ করুন। ফার্স্ট এইড বক্সটা নিয়ে আসুন। জলদি!'

দৌড়ে গিয়ে একটা চেয়ার নিয়ে এল রবিন। তাতে বসলেন প্রফেসর। তিন গোয়েন্দা ঘিরে দাঁড়াল তাঁকে। কিউরেটরও আছেন। পুলিশ ডাকার কথা মনে হয় ভুলে গেছেন।

জখমটা কিছু না, সামান্য চামড়া কেটেছে মাত্র। ধুয়ে সেটাকে বেঁধে দিতে বসল রবিন। দুর্ঘটনা শান্ত করে দিয়েছে প্রফেসরকে। রাগ দূর হয়ে গেছে। নিরীহ ভঙ্গিতে তাকাচ্ছেন এখন সবার দিকে।

'জিনিসগুলো কোথায়?' কিউরেটরকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'ওগুলো আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার কোন অধিকার নেই আপনার।'

'লুকিয়ে তো রাখিনি, স্যার,' কিউরেটরও নরম হয়ে গেছেন।

'তাহলে ডিসপ্লে কেস থেকে সরিয়েছেন কেন?'

'ছাত্ররা গবেষণা করছে ওগুলো নিয়ে। ওঅর্করুমে রাখা হয়েছে।'

'নিয়ে আসুন। যদি সত্যি কথাই বলে থাকেন, এনে দেখান আমাকে।'

অস্বস্তি ফুটল কিউরেটরের চোখে। 'দেখাচ্ছি। কিন্তু আপনাকে কথা দিতে হবে, স্যার, আপনি শান্ত থাকবেন। থাকবেন তো?'

মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর, 'আমি এখন শান্তই আছি, মিস্টার হাচিন্স।'

'ঠিক আছে, নিয়ে আসছি।' তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালেন তিনি। 'সাহায্য দরকার। একজন আসবে আমার সঙ্গে?'

মুহূর্তে রাজি হয়ে গেল কিশোর। কিউরেটরের সঙ্গে চলল।

'পুলিশ ডাকবেন সত্যি সত্যি?' হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না ডাকা লাগলেই খুশি হব,' কিউরেটর বললেন। 'অসুখ হওয়ার আগে প্রফেসর ডেমিরন একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক ছিলেন। নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছিল তাঁর; কোনমতেই সারল না আর পুরোপুরি। কমে, আবার বাড়ে।'

'এখন তো মনে হয় বেড়েছে।'

'হ্যাঁ,' বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার হাচিন্স। 'বুঝতে পারছি না জিনিসগুলো তাঁকে দেখাতে নিয়ে যাওয়াটাও এখন ঠিক হচ্ছে কিনা।'

'কেন দেখতে চান বলেছেন কিছু?'

'ডেভিল'স রিজে পাওয়া মূর্তিটার সঙ্গে নাকি রাকারুয়া হিলেরটার হুবহু মিল। প্রফেসর ড্যানহ্যাম দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন।' মাথা নাড়তে লাগলেন মিস্টার হাচিন্স। 'দেখানোই উচিত হয়নি। নিশ্চয় পুরানো স্মৃতিতে খোঁচা লেগেছে ডেমিরনের। বড়ই দুঃখজনক।'

কিশোরের ধারণা অন্য কোন কারণে মূর্তিটা দেখতে চাইছেন প্রফেসর। নিশ্চয় সন্দেহ হয়েছে। কিউরেটরের কাছে কথাটা চেপে গেল সে।

'জিনিসগুলো ঠিকঠাক আছে বোঝাতে পারলে,' কিউরেটর বললেন, 'বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারব। পুলিশ ডাকতে চাই না। ক্ষতি যেটুকু হয়েছে, সামান্যই, তার জন্যে আর পুলিশ ডাকাডাকির কোন মানে হয় না। মিউজিয়ামকে বহু জিনিস দিয়েছেন প্রফেসর ডেমিরন।'

একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে তালা খুললেন।

ঘরটা দেখতে ল্যাবরেটরির মত। লম্বা লম্বা ওঅর্ক বেঞ্চ আছে। পরীক্ষা চালানোর জন্যে নানা রকম আধুনিক যন্ত্রপাতি রয়েছে। একধারে একটা কম্পিউটারও আছে। একটা বেঞ্চে রাখা দুটো কাঠের বাক্স, কেবিনেটের ড্রয়ারের মত। সেগুলোতে যত্ন করে ভরে রাখা হয়েছে রাকারুয়া হিলে পাওয়া সমস্ত জিনিস। তৈজসপত্র তো আছেই, আছে নানা রকম মূর্তি, চুলের কাঁটা, খোদাই করা পাথর। টিস্যু পেপারের বিছানায় শুয়ে আছে সোনার দেবমূর্তিটা।

তুলতে গিয়ে থমকে গেলেন কিউরেটর।
কিশোর ভাবল, নকল যে বুঝে ফেলেছেন বুঝি। জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো?'
'বুঝতে পারছি না কাজটা ঠিক করছি নাকি!'
'কি জানি! পাগলের মতিগতি তো বোঝা যায় না। ঠিক আছে দেখলে হয়তো ঠাণ্ডা হয়ে যাবেন প্রফেসর,' কিশোর বলল। 'বুঝতে পারবেন চুরি হয়নি। বাড়ি ফিরে যাবেন।'
বাক্সগুলো নিয়ে বেরিয়ে এল দুজনে।
মুসা আর রবিন তখন ঝাড়ু দিয়ে ভাঙা কাঁচ পরিষ্কার করছে। প্রফেসর দাঁড়িয়ে আছেন একপাশে। হাতে ব্যান্ডেজ।
কিশোর আর মিস্টার হাচিন্সকে আসতে দেখে উজ্জ্বল হলো তাঁর চোখ। এগিয়ে গেলেন।
বাক্সটা টেবিলে রাখলেন হাচিন্স। এক এক করে জিনিসগুলো বের করে দেখতে লাগলেন প্রফেসর। মূর্তিটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন। স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। প্রফেসরের ঠোঁটে হালকা এক চিলতে হাসি ফুটতে দেখল।
'বাড়ি নিয়ে যাব এটা,' মূর্তিটা পকেটে ঢোকালেন প্রফেসর। 'মাটির জিনিস মাটিতেই ফিরে যাক।'
'প্রফেসর!' চমকে গেলেন কিউরেটর। 'আপনি কথা দিয়েছেন!'
'বোকা নাকি!' প্রফেসর বললেন। 'এগুলো আপনার জিনিস নয়। আমি পেয়ে দিয়েছিলাম, আমি নিয়ে যাচ্ছি। যেখান থেকে বের করেছি সেখানে আবার পুঁতে রেখে আসব।'
হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন মিস্টার হাচিন্স। পারলে প্রফেসরের পকেট থেকে মূর্তি বের করে আনেন। কি করবেন বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি। অসহায় ভঙ্গিতে কিশোরের দিকে তাকালেন।
কিন্তু কিশোর কি করবে? যাঁর জিনিস তিনি নিয়ে গেলে বাধা দেয়া যায় না।
মুসার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন প্রফেসর। 'ও তোমাকে ছাড়বে না। টেনে নিয়ে যাবে নিজের অন্ধকার জগতে। কোনমতেই বেরোতে পারবে না আর। তোমাকে বাঁচানোর জন্যেই মিনাকুয়োকে কবর দিতে হবে আমাকে। আর কোন উপায় নেই।' আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে আচমকা রওনা হয়ে গেলেন। দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'সবার ভালর জন্যেই এ কাজ করতে হচ্ছে আমাকে। মিনাকুয়োকে মুক্ত রাখা কোনমতেই উচিত হবে না আর। ধড় থেকে মুণ্ডগুলো সব আলাদা করে দিতে থাকবে এক এক করে...'
বেরিয়ে গেলেন প্রফেসর।
চেপে রাখা ফুসফুসের বাতাস সশব্দে ছেড়ে দিল মুসা।
'পুরো উন্মাদ!' সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল রবিন।
চিন্তিত ভঙ্গিতে ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।
আর মিস্টার হাচিন্সের মুখ দেখে মনে হচ্ছে, যে কোন মুহূর্তে বাচ্চা ছেলের মত হাপুস নয়নে কাঁদতে বসে যাবেন।

বারো

পরদিন, রোববারের সকাল। কমেটকে নিয়ে বেরোবে ঠিক করল মুসা। বেশ কয়েকদিন দৌড় করানো হয় না ঘোড়াটাকে।

আগের রাতে সারারাত বৃষ্টি হয়েছে। ভোরের দিকে মেঘ কেটে গেছে। বেরিয়ে পড়েছে বৃষ্টিস্নাত গাঢ় নীল আকাশ।

মাটি ভেজা। কাদা হয়ে গেছে। কিন্তু দমাতে পারল না মুসা বা তার ঘোড়াটাকে। ঘোড়ার চকচকে ঘাড়টা চাপড়ে দিয়ে বলল, 'সুন্দর সকাল, কি বলিস, কমেট? দারুণ মজা হবে আজ।'

পাহাড়ের দিকে চলল ওরা। সূর্য পেছনে। পিঠে লাগছে চড়া রোদ। যেখানে কাদা নেই, সেখানে নরম মাটি; ঘোড়ার খুরের শব্দ ঢেকে দিচ্ছে।

তীব্র গতিতে ছুটছে। উঠে যাচ্ছে চড়াই বেয়ে। দুই ধারে মাঠ। কোথাও চষা খেত। ছুটতে ছুটতে সামনে দেখা গেল ডেভিল'স রিজ। হঠাৎ যেন বোধোদয় হলো মুসার। মনেই ছিল না যেন কোনদিকে চলেছে। জায়গাটাকে এখন মোটেও ভাল চোখে দেখে না সে। দ্রুত পাশ কাটাল ওটার। ফিরে যাবে নাকি ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল গোস্ট মিলের কাছের নদীটার কথা। বেশি বৃষ্টি হলে নাকি ওটার পানির রঙ লাল হয়ে যায়। বহুবার শুনেছে কথাটা সে। ব্লাডি ওয়েল বা রক্ত-কূপ নামে একটা কূপ আছে পাহাড়ের মধ্যে। সেটা ভরে যায় পানিতে। উপচে পড়ে। লাল পানি। নদীর পানিকেও নাকি লাল করে দেয়।

প্রফেসরের বাড়িটা দেখার চেষ্টা করল। পারল না। ঘন বন রহস্যময় বাড়িটাকে আড়াল করে রেখেছে দৃষ্টিসীমা থেকে।

যাবে কিনা দ্বিধা করতে লাগল মুসা। কৌতূহলেরই জয় হলো। হাত বোলাল প্রফেসরের দেয়া ডবি স্টোনের লকেটটায়। তারপর যা থাকে কপালে ভেবে রওনা করিয়ে দিল কমেটকে। ভাবতে ভাবতে চলল—বৃষ্টি যা হয়েছে, তাতে কুয়াটা ভরল কিনা, পানি উপচে পড়ছে কিনা—প্রচুর পানি না পেলে লাল পানি উগড়াতে পারবে না ভূতুড়ে কূপ।

'জলদি চল, কমেট,' তাগাদা দিল সে। 'পানি নেমে গেলে আর হবে না।' বনের দিকে তাকাল সে। 'কিন্তু ভয়ও যে লাগছে! ওই ভূতুড়ে মিলের কাছে যেতে চাস?' তার কথা বুঝতে পেরেই যেন গতি বাড়িয়ে দিল ঘোড়াটা। হাসল মুসা। 'অ, তারমানে তোর যাওয়ার ইচ্ছে। ঠিক আছে, এগো। খোদা যদি কপালে দেও-দানবের হাতে মরণ লিখে রাখে ঠেকাবে কে!'

রাস্তা ছেড়ে ঘন বনে ঢুকে পড়ল কমেট। জায়গাটা মুসার অচেনা নয়। আগেও এসেছে। কিন্তু অন্যদিন আজকের মত এতটা গা ছমছম করেনি। জড়াজড়ি করে থাকা গাছের ফাঁক-ফোকর দিয়ে এগোতে এগোতে আবার কথা বলতে লাগল কমেটের সঙ্গে, 'পাগলা প্রফেসরটা এখন দেখে না ফেললেই বাঁচি। তবে ভয়ের কিছু নেই, কি বলিস? দেখার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালাব।'

বাইরে কড়া রোদ, উজ্জ্বল আলো। কিন্তু গাছের মাথার চাঁদোয়ার জন্যে এখানে রোদ ঢুকতে না পারায় সকাল বেলাতেও সবুজ গোধূলি সৃষ্টি হয়ে আছে। বনবাদাড় খারাপ লাগে না মুসার। প্রফেসরের ভয় না থাকলে আনন্দই পেত, উপভোগ করতে পারত এখানকার প্রকৃতি। ঘন গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেটা জোরাল হচ্ছে।

নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ না করার জন্যেই যেন নুয়ে পড়ল কমেটের ঘাড়ের ওপর। বনটা কেমন অদ্ভুত। মনে হচ্ছে আড়াল থেকে সর্বক্ষণ চোখ রাখা হচ্ছে তার ওপর। কি যেন অদৃশ্য বিপদ ঘুরে বেড়াচ্ছে চারপাশে

পাহাড় দেখা গেল। গাছপালায় ছাওয়া ঢালের গায়ে কালো একটা গর্ত গুহামুখ। ঝোপঝাড়ে অর্ধেক ঢেকে রয়েছে।

এই গুহার কথাও শুনেছে সে। কুয়াটা ওদিকেই কোথাও রয়েছে। পাশ ঘুরে নদীর দিকে এগোতে যাবে, গাছের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে ছুটে এল একটা ছায়া। চমকে গেল কমেট। মুহূর্তে সামনের দু'পা শূন্যে তুলে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে প্রায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। চিৎকার করে উঠল তীক্ষ্ণ স্বরে।

সামলাতে পারল না মুসা। গড়িয়ে পড়ে গেল ঘোড়ার পিঠ থেকে হাড়গোড় ভাঙত। কিন্তু নরম মাটি আর বনতলে পড়ে থাকা লতাপাতার পুরু কার্পেট বাঁচিয়ে দিল তাকে।

তেরো

দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। চোখ বুজে থেকে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল মুসা নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল অবশেষে।

টের পেল, কে যেন ঝুঁকে এসেছে গায়ের ওপর ভূত দেখবে ভয়ে চোখ মেলতে সাহস করল না।

'তুমি ঠিক আছ?'

কানে এল পরিচিত কণ্ঠস্বর। চোখের পাতা খুলে মিটমিট করে তাকাল মুসা প্রফেসর ডেমিরনের চোখে চোখ পড়ল

'যে ভাবে পড়েছ,' আবার বললেন তিনি, 'হাড়গোড় কিছু আস্ত থাকার কথা নয়। ভেঙেছে?'

নাড়াচাড়া দিয়ে দেখল মুসা 'না...মানে হয় না ...তবে ভাঙতে পারত ঘাড়টাও মটকে যেতে পারত ' আচমকা রাগ যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল চিৎকার করে উঠল, 'সব দোষ আপনার চুপি চুপি এসে এ ভাবে ঘোড়াটাকে চমকে না দিলে...কেন এসেছেন?'

ঝুঁকে মুসার হাত চেপে ধরে তোলার জন্যে টান দিলেন প্রফেসর 'তোমাকে সাবধান করতে এলাম,' ফিসফিস করে বললেন। চারপাশে তাকিয়ে দেখে নিলেন কেউ দেখছে কিনা 'আমি জানতাম, তুমি আসবে, রুপানি; তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। জানতাম তুমি আসতে না চাইলেও তোমাকে টেনে নিয়ে আসা

হবে। নিজের বিপদ বুঝতে পারবে না তুমি।'

'মিনাকুয়োকে কবর দেননি?'

'দিয়েছি। কিন্তু তারপরেও বলা যায় না কিছু। তার আসল কবর খুলে ফেলা হয়েছে। যদি জাদুর ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়? ভয়ঙ্কর মূর্তি নিয়ে সবাইকে খুন করতে আসবে সে।'

বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল মুসার। উঠে বসে চারপাশে তাকাল ঘোড়াটার জন্যে। দেখলেই দৌড়ে গিয়ে পিঠে চড়ে বসবে। পাগলা প্রফেসরের কাছ থেকে পালানো দরকার। মিনাকুয়োর চেয়ে প্রফেসরকে বেশি ভয় পাচ্ছে সে।

কিন্তু চোখে পড়ল না কমেটকে। নিশ্চয় বাড়ি রওনা হয়ে গেছে ওটা। ভয় পেলে এমন করে ঘোড়ারা। তার নিজেকে এখন হেঁটে ফিরে যেতে হবে। দূরত্ব কম না।

সব কিছুর জন্যে প্রফেসরকে দায়ী করল মুসা। ঝাঁজাল কণ্ঠে বলল, 'মোটেও টেনে আনা হয়নি আমাকে। আমি নিজের ইচ্ছেতেই এসেছি। ছাড়ুন আমাকে।'

ঝাড়া দিয়ে ছাড়াতে গিয়ে টের পেল মুসা, কি সাংঘাতিক শক্তি প্রফেসরের হাতে। এক চুল ঢিল করতে পারল না সে। পাগলের শক্তি বেশিই থাকে। টান মেরে তাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন প্রফেসর। আরেকবার হাত ছাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল মুসা

'দেখুন,' চিৎকার করে বলল সে, 'আমাকে ছেড়ে দিন। আমি রুপানি-ফুপানি কিছু না। আমার নাম মুসা, মুসা আমান। আমি দেবতা নই, দেবতার কোন রকম ক্ষমতা নেই আমার মধ্যে, আমি অতি সাধারণ একটা ছেলে।'

হাতের চাপ ঢিল হলো প্রফেসরের, কিন্তু চোখের বন্যতা গেল না।

মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করল মুসা। 'আমার ঘোড়াটাকে ধরা দরকার ওটাকে একা ফিরতে দেখলে দুশ্চিন্তায় মা পাগল হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, তাই তো, মুসার হাত ছেড়ে দিলেন প্রফেসর চোখের নিচেটা চুলকালেন 'তোমার নাম তাহলে মুসা?'

'হ্যাঁ।

অবাক দৃষ্টি ফুটল প্রফেসরের চোখে 'তবে কি আমি ভুল করছি?' বিড়বিড় করতে লাগলেন, 'ভুল করছি?'

'তাই তো করছেন ...দ্বিধায় পড়ে গেছেন আরকি

'দ্বিধা? হ্যাঁ, তাই হবে।...ঘোড়াটাকে ধরবে কি করে?'

'জানি না তবে চিন্তা নেই "ধরতে না পারলেও ঠিকই বাড়ি ফিরে যাবে ওটা। রাস্তা চেনে।' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা 'কষ্টটা হবে আমারই হেঁটে যেতে হবে অতটা পথ।'

'তোমার মা চিন্তা করবেন বললে না? যদি ফোন করে দাও, তাহলেই তো হয়। বলবে, তুমি ভাল আছ। আমার বাড়িতে টেলিফোন আছে

প্রফেসরের প্রস্তাবটা ভাল হলেও আবার সেই ভূতুড়ে মিল হাউসে ফিরে যেতে ইচ্ছে করল না মুসার 'না না, ফোন আর করা লাগবে না'

'কিন্তু তুমি তোমার মাকে দুশ্চিন্তামুক্ত করতে চাও, প্রফেসর বললেন খপ

করে আবার হাত চেপে ধরলেন মুসার। 'সেটাই তোমার করা উচিত। আমি তোমাকে বেকায়দায় ফেলেছি. সমস্যার সমাধান করা আমার দায়িত্ব। তোমার মাকে ফোন করে দাও। তারপর গাড়িতে করে আমি তোমাকে পৌছে দিয়ে আসব। এতটা পথ হেঁটে যাওয়ার কোন মানে নেই।'

সন্দেহ দেখা দিল মুসার চোখে। সত্যি উপকার করতে চাইছেন প্রফেসর? না পাগলের পাগলামি! পাগল শান্ত রয়েছে, শান্তই থাক; তাকে আর খেপাতে চাইল না। পাগলের মতে মতে থাকল। বলল. 'ফোন করতে পারলে আপনার আর কষ্ট করে গিয়ে দিয়ে আসা লাগবে না। আমার মা-ই এসে গাড়িতে করে নিয়ে যেতে পারবে আমাকে।' মাথা ঝাঁকাল সে। 'চলুন. ফোনই করব।'

গাছপালার ফাঁক দিয়ে এগোচ্ছে দুজনে। প্রফেসরকে এখন একেবারে স্বাভাবিক মানুষ মনে হলো মুসার।

কিন্তু মিল হাউসে ঢোকার পর আবার সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। রোম খাড়া হয়ে গেল তার। পেছনের দরজা দিয়ে তাকে এনে ঢুকিয়েছেন প্রফেসর। রান্নাঘর পার করিয়ে নিয়ে এলেন হলঘরে। একটা খোলা দরজার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ প্রচণ্ড ধাক্কা মারলেন। হুমড়ি খেয়ে গিয়ে একটা ঘরের মধ্যে পড়ল সে। উঠে দাঁড়ানোর আগেই শুনতে পেল দরজাটা লাগিয়ে দিচ্ছেন প্রফেসর।

দরজায় কিল মারতে মারতে চিৎকার করে ডাকতে লাগল সে. 'প্রফেসর. প্রফেসর. দরজা খুলুন! প্রফেসর!'

'ওখানেই থাকো.' ভারী কাঠের দরজার অন্যপাশ থেকে ভেসে এল প্রফেসরের কণ্ঠ. 'বিপদ না কাটা পর্যন্ত। ও তোমাকে ডাকছে. রুপালি। শয়তান-দেবতা মিনাকুয়ো। তার দিকে টেনে নিতে চাইছে তোমাকে। রক্ষা করতে হবে আমার। ভয় নেই, আমি তোমাকে বাঁচাবই।'

কিল মারা বন্ধ করল না মুসা। 'প্রফেসর. দোহাই আপনার, খুলুন!'

কিন্তু আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না ওপাশ থেকে। প্রচণ্ড হতাশায় গুঙিয়ে উঠে দরজার গায়ে হেলান দিল মুসা। কাঁধটা পাল্লায় ঠেকিয়ে রেখেই খসে পড়ার মত ধীরে ধীরে বসে পড়ল মেঝেতে।

'তুমি আমাকে শয়তান-দেবতার হাত থেকে রক্ষা করবে, বুঝলাম.' বিড়বিড় করল সে. 'কিন্তু তোমার মত পাগলের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করবে কে!'

চোদ্দ

চমকের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যেতে নিজেকে রক্ষা করতে তৈরি হলো মুসা।

যে ঘরটাতে বন্দি করা হয়েছে তাকে, তাতে কার্পেট নেই। কাঠের তৈরি দু'চারটা ভারী কাঠের আসবাব, পুরু ধুলোয় ঢাকা। ছোট, ময়লা লাগা. মাকড়সার জালে ঢাকা একটা জানালা আছে। সেটা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব।

কাঁচ ভাঙার জন্যে একটা কিছু খুঁজতে শুরু করল সে। খুঁজতে গিয়ে একটা দরজাও আবিষ্কার করে ফেলল। এমন ঘরে বন্দি করেছেন প্রফেসর. যেটা থেকে

সহজেই বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব–ভাবতে হাসি পেল মুসার, এ সব কাজে একেবারেই আনাড়ি তিনি। দরজাটা রয়েছে একটা ওয়ারড্রোবের পেছনে। প্রফেসরের বোধহয় মনেই ছিল না দরজা আছে ওখানে।

ওয়ারড্রোবটা সরানোর জন্যে ঠেলতে শুরু করল সে ভীষণ ভারী। নড়াতে পারছে না। উল্টো দিকের দেয়ালে পা ঠেসে ধরে ওয়ারড্রোবের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে ঠেলা দিল। এইবার নড়ল। কাঠের মেঝেতে শব্দ তুলে কয়েক ইঞ্চি সরে গেল ওয়ারড্রোবটা। কয়েকবারের চেষ্টায় অনেকখানি সরিয়ে ফেলল দেয়াল আর ওয়াড্রোবের মাঝের ফাঁক দিয়ে ঢোকা যায় এখন।

দরজার কোন হাতল নেই। তালাও লাগানো নেই। হাতলের জায়গায় একটা ছিদ্র। তারমানে হাতল ছিল এক সময়। খসে পড়ে যাওয়ার পর আর লাগানো হয়নি।

ঠেলা দিতেই ফাঁক হয়ে গেল দরজা। পুরোটা খুলল না, তবে যেটুকু খুলেছে অন্যপাশে যাওয়ার জন্যে যথেষ্ট। ঝুরঝুর করে মাথায় ঝরে পড়ল ধুলো-ময়লা।

ফাঁক গলে অন্যপাশে চলে এল সে। আবছা অন্ধকার একটা ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। ধুলোর অভাব নেই। কোন কিছুতে সামান্য নাড়া লাগলেই ঝরে পড়ছে। আর আছে মাকড়সার জাল। হাতে-মুখে জড়িয়ে যাচ্ছে। নিঃশব্দে সরে যাচ্ছে মাকড়সা। ঘাবড়ে গেল সে। বনের মধ্যে বাড়ি। বিষাক্ত মাকড়সা থাকা সম্ভব। ব্ল্যাক উইডো স্পাইডার! নাহ, এই এলাকায় উইডোরা থাকে না–নিজেকে বোঝাল সে কিন্তু বুঝতে চাইল না মন। যদি থাকে!

চোখে আলো সয়ে আসতে দেখল যন্ত্রপাতিতে ভরা ঘর। বড় বড় জাঁতা, যেগুলো দিয়ে শস্য পেষা হত এককালে। মিল রুম। উল্টো দিকের দেয়ালের খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে নদীর ওপরের বিরাট চাকাটার একাংশ।

হঠাৎ বিল্ডিঙের কোনখান থেকে ভেসে এল ফাঁপা, ভোঁতা শব্দ। ধাতব নকারে বাড়ি মারার। বাইরে এক রকম লাগে শব্দটা, ভেতর থেকে আরেক রকম।

ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে প্রফেসরের সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছে কে এল?

কথা শোনা গেল। দূর থেকে আসায় বিকৃত শোনাল। একটা কণ্ঠ প্রফেসরের–রেগে যাওয়া; অন্যটাও পুরুষের। চেনা চেনা লাগল। চিৎকার করছে দুজনেই।

ভ্রূকুটি করল সে। চেনা কণ্ঠটা কার? কোথাও শুনেছে। দু'চারদিনের মধ্যেই। মনে করতে পারছে না।

এগিয়ে আসছে কথা বলার শব্দ হঠাৎ চিনে ফেলল সে। ডিপ গ্রেগরি। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল একটা দরজা হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলেন প্রফেসর।

বড় বড় যন্ত্রপাতিগুলোর আড়ালে লুকিয়ে পড়ল সে। সাবধানে মাথা তুলে তাকাল দাঁত-কাটা একটা বিশাল চাকার ওপর দিয়ে। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ডিপ গ্রেগরিকে।

'আপনার প্রলাপ শুনতে আমি আসিনি এখানে,' গ্রেগরি বলল। 'আমি জানতে চাই, মূর্তিটাকে কি করেছেন।'

'রেখে দিয়েছি ওটা যেখান থেকে উঠে এসেছে সেখানেই, মাটির নিচে,'

প্রফেসর বললেন। 'জেগে উঠেছে শয়তান-দেবতা। ক্রমেই ক্ষমতা বাড়ছে ওর। কেউ রেহাই পাবে না।'

সরু হয়ে এল গ্রেগরির চোখের পাতা। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'মাথাটা পুরোই গেছে!...এ সব নিয়ে এত বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন, মগজে গ্যাঁট হয়ে বসে গেছে। গাঁজাখুরি গল্পগুলোই বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছেন।...মিস ড্যানহ্যামের মাথায় আপনিই বাড়ি মেরেছিলেন, তাই না? তখনই যদি বুঝতাম...এত কাছে এসেও হাতছাড়া হত না মূর্তিটা...সর্বনাশের মূলে আমার গাড়ির চাকা, ফুটো হওয়ার আর সময় পেল না। আসতে দেরি হয়ে গেল বলেই দেখতে পাইনি বাড়িটা কে মেরেছে। দেখলে আপনি কোনমতেই সরাতে পারতেন না ওই মূর্তি...' ঘরে ঢুকল সে। হাত নাড়ল প্রফেসরের দিকে। 'এই যে মিস্টার, আমার কথা কি কিছু ঢুকছে আপনার কানে?'

প্রফেসরকে পিছিয়ে যেতে দেখল মুসা। 'শয়তান দেবতার সঙ্গে হাত মিলিয়েছ তুমি। তোমার চেহারাতেই সেটা স্পষ্ট।'

বিরক্তিতে মুখ বাঁকাল গ্রেগরি। 'নাহ্, পাগলের সঙ্গে কথা বলাই ঝকমারি। একটা বললে বোঝে আরেকটা। কারও সঙ্গে হাত মেলাইনি আমি।...ইস্, কাল মিস ড্যানহ্যামকে পড়ে থাকতে দেখে মাথা গরম করে ওভাবে কেন যে পালালাম! মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা করলে বুঝে যেতাম আপনার কাজ, আজ আর ঝামেলা করতে আসা লাগত না তাহলে। কালই নিয়ে যেতে পারতাম মূর্তিটা। বিক্রি করে পায়ের ওপর পা তুলে কাটিয়ে দিতে পারতাম বাকি জীবনটা।...প্রফেসর ড্যানহ্যামকে ফাঁসানোর জন্যেই এত কাণ্ড করেছি, বুঝলেন। আমি ওকে চোর বানাতে চেয়েছি। পুলিশকে বোঝাতে চেয়েছি ক্যারাভানের মাল সে নিজেই চুরি করেছে—বিক্রি করে ফান্ডের টাকা জোগাড়ের জন্যে। ক্যারাভানের মাল চুরির ব্যাপারে পুলিশ তাকে সন্দেহ করলে, মূর্তি চুরির দায়টাও চাপত তার ঘাড়ে। মাঝখান থেকে আমি খালাস। আমার দিকে নজরই দিত না পুলিশ। কিন্তু গোল বাধালেন আপনি। যাকগে, এখনও সময় আছে, পুলিশ ঠিকই সন্দেহ করেছে মিস ড্যানহ্যামকে।' সামনের দিকে মুখ বাড়িয়ে দিল গ্রেগরি। 'মূর্তিটা কোথায় লুকিয়েছেন?'

'বলব না...'

প্রফেসরের কথা শেষ হলো না। বেজে উঠল নকার।

সতর্ক হয়ে গেল গ্রেগরি। কান পাতল শব্দের দিকে। আবার বাজল নকার। হঠাৎ সচল হলো সে। খপ করে প্রফেসরের কাঁধ চেপে ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল। 'কোথায় রেখেছেন? জলদি বলুন!'

'বলছি,' গ্রেগরির হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্যে হাঁসফাঁস করতে লাগলেন প্রফেসর। 'গুহার মধ্যে। কিন্তু সেখানে যাওয়া উচিত হবে না। বিপদটা বুঝতে পারছ না তুমি? মিনাকুয়োকে বাইরে রাখলে সবাই মরব আমরা। কেউ রেহাই পাব না।...কাউকে ছাড়বে না ওই অপদেবতা!'

জ্বলজ্বল করছে গ্রেগরির চোখ। 'জাহান্নামে যাক আপনার রূপকথা! গুহাটা কোনখানে?'

'বনের কিনারে, পাহাড়ের ঢালে...' শরীর মুচড়ে ঝাঁকি দিয়ে কাঁধটা ছাড়িয়ে

নিলেন প্রফেসর।

আবার ধরতে এল গ্রেগরি। তক্তায় পা বেধে পেছনে উল্টে পড়ে যাচ্ছিলেন প্রফেসর, থাবা মেরে লম্বা একটা কাঠের লিভার ধরে পতন ঠেকালেন। ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল পুরানো কাঠের যন্ত্র। দেহের ভারে নিচে নেমে গেল লিভারটা। ঝুঁকে দাঁড়াল গ্রেগরি। প্রফেসরকে মেরেই বসবে মনে হচ্ছে।

দাঁত-কাটা চাকাটার সঙ্গে সেঁটে রয়েছে মুসা। বাধা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। চোখের সামনে একজন বুড়ো মানুষকে মারবে একটা শয়তান লোক, চুপচাপ দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখা সম্ভব নয়।

ঘড়ঘড়, মড়মড়, গোঁ-গোঁ, নানা রকম বিচিত্র আওয়াজ তুলল যন্ত্রপাতিগুলো। চাকা ঘুরছে। বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল মুসার। শব্দগুলো চাপ দিচ্ছে মগজে।

লিভারে চাপ লেগে নিশ্চয় খুলে গেছে নদীর ওপরের বিশাল চাকার লকটা, ঘুরতে শুরু করেছে চাকা। চালু করে দিয়েছে মিল।

দাঁত-কাটা চাকার কাছ থেকে সরে যেতে চাইল মুসা। হ্যাঁচকা টান লাগল শার্টের কোণায়। ফিরে তাকাল। আতঙ্কিত চোখে দেখল, কাপড় আটকে গেছে চাকার দাঁতে। ক্ষুধার্ত দানবের মত টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

পিছলে গেল পা। ক্রমেই টেনে নিচ্ছে তাকে চাকাটা।

ঝনঝন শব্দ হলো। কাঁচ ভাঙল জানালার। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল সে।

পনেরো

'মুসার কমেট একলা ফিরে এসেছে,' রিসিভারটা ধরে রেখে রবিনের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে বলল কিশোর। লাইন কেটে গেছে ওপাশের। আস্তে করে ক্রেডলে রেখে দিল রিসিভার। 'আর বসে থাকা যায় না। ভাল মনে হচ্ছে না আমার। মুসার কিছু হয়েছে। গিয়ে দেখা দরকার, কি হলো।'

ডেস্কের ওপাশের চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল সে।

রবিনও উঠল এ পাশের টুল থেকে। হেডকোয়ার্টারের মেঝের ঢাকনাটা তুলল। এটা দিয়ে একটা পাইপে নামতে হয়। হামাগুড়ি দিয়ে বেরোতে হয় বাইরে। তিন গোয়েন্দার অনেকগুলো গুপ্তপথের একটা–নাম দুই সুড়ঙ্গ।

সকালে উঠেই রবিনকে ফোন করেছিল কিশোর। ইয়ার্ডে চলে আসতে বলেছিল। মূর্তির কেসটা নিয়ে আলোচনার জন্যে। তারপর করেছে মুসাদের বাড়িতে। তাকে পাওয়া যায়নি। মিসেস আমান জানিয়েছেন, কমেটকে দৌড়াতে নিয়ে গেছে মুসা।

তারপর থেকে অপেক্ষা করে বসে ছিল কিশোর। রবিন চলে এসেছিল কয়েক মিনিটের মধ্যেই। কিন্তু মুসার দেখা নেই। বার বার ফোন করেছে ওদের বাড়িতে। বার বার একই জবাব–মুসা ফেরেনি। তারপর এইমাত্র তার আম্মা ফোন করে

জানালেন, কমেট একলা ফিরে এসেছে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে।

মুসাদের বাড়িতে ছুটল দুজনে। ঘোড়াটা কোনদিকে গিয়েছিল আবিষ্কার করতে সময় লাগল না। একটু ভাবতেই অনুমান করে ফেলল কিশোর, কোথায় গেছে মুসা। কিন্তু যে ডেভিল'স রিজকে ভয় পায়, সেদিকে কেন গেল বুঝতে পারল না।

নরম মাটিতে ঘোড়ার পায়ের ছাপ অনুসরণ করে আসা গেল সহজেই। বনের মধ্যে মিল হাউসটা চোখে পড়ল।

সাইকেল থেকে নামল ওরা। গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখল সাইকেল দুটো। মিলের দিকে এগোল। কয়েক পা গিয়েই কিশোরের হাত খামচে ধরল রবিন, 'কিশোর, গাড়িটা চিনতে পারছ?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ডিপ গ্রেগরি! এখানে কি করছে?'

'পাগলা প্রফেসরের দোস্ত নাকি?'

'কি জানি। তুমি এখানে দাঁড়াও। চোখ রাখো। আমি গিয়ে বাড়ির ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখে আসি।'

বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল সে। নকারে বাড়ি দিল। সাড়া নেই। আবার বাড়ি দিল। ভুরু কুঁচকে তাকাল ওটার দিকে। শব্দটা অন্য রকম লাগছে মনে হলো আজ। কেমন ভোঁতা ভোঁতা। তীক্ষ্ণতা নেই।

নকারটা অযথাই রাখা হয়েছে। একদিনও এসে এটাতে বাড়ি দিয়ে প্রফেসরের সাড়া পায়নি।

মিলের পাশ দিয়ে সাবধানে এগোল কিশোর। থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। চালু হয়ে গেছে মিল। অদ্ভুত শব্দ। ফিরে তাকাল। স্রোতের টানে ঘুরতে আরম্ভ করেছে বিশাল চাকাটা। অবাক লাগল তার। মিল চালু করল কে?

জাঁতাঘরের কাছে এসে দাঁড়াল সে। পুরু পাথরের দেয়াল। ছোট জানালাটা দিয়ে উঁকি দিল ভেতরে। চিত হয়ে আছেন প্রফেসর ডেমিরন। তাঁর ওপর ঝুঁকে রয়েছে গ্রেগরি। ডান হাত তুলেছে ঘুসি মারার ভঙ্গিতে।

পলকে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর। একটা পাথর তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল জানালার কাঁচে।

ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙল। পরক্ষণে তীক্ষ্ণ চিৎকার। মুসার গলা চিনতে পারল কিশোর।

জানালার দিকে ঘুরে গেল গ্রেগরির মুখ।

ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে কাঁচের টুকরো। কাঁচ ভেঙেই পাথরটার ক্ষমতা শেষ। ওটাও পড়ে গেছে মেঝেতে।

ঝটকা দিয়ে সোজা হলো গ্রেগরি। সতর্ক বেড়ালের মত তাকিয়ে রইল জানালার দিকে। পাথরটা কোনখান থেকে এসেছে বোঝার চেষ্টা করছে। আচমকা ঘুরে দৌড় দিল দরজার দিকে।

আবার শোনা গেল মুসার চিৎকার। ঘরের ভেতর থেকে আসছে সন্দেহ নেই, কিন্তু দেখা গেল না ওকে। আরেকটা পাথর তুলে নিয়ে ঠুকতে লাগল কিশোর। ভাঙা কাঁচগুলো ফেলে দিয়ে পুরো সাফ করে ফেলল জানালাটা। জানালা গলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

প্রফেসর ডেমিরন উঠে দাঁড়িয়েছেন। দুই হাতে চেপে ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করছেন লিভারটা। কিশোরকে দেখে চিৎকার করে উঠলেন, 'জলদি এসো! একা পারছি না। তোমার বন্ধুকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মেশিনের চাকা।'

'কিশোর!'

চিৎকার শুনে মুখ ফেরাল কিশোর। দেখতে পেল মুসাকে। নিজেকে ছাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে। জিনসের শার্ট গায়ে দিয়েছে সে। কাপড় সাংঘাতিক শক্ত। ছিঁড়তে পারছে না। দাঁত-কাটা একটা চাকা টেনে নিচ্ছে তাকে।

লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল কিশোর। হাত লাগাল প্রফেসরের সঙ্গে। দুজনের মিলিত শক্তির কাছে হার মানল লিভার। ধীরে ধীরে উঠতে আরম্ভ করল।

ঝাঁকি দিয়ে থেমে গেল চাকাটা। থেমে গেল শব্দ। বড় বেশি নীরব মনে হতে লাগল এখন ঘরটা। মুসার ভারী নিঃশ্বাসের কাঁপা কাঁপা শব্দ কানে আসছে।

লিভার ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'মুসা, ঠিক আছ তুমি?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'আছি। আরেকটু হলেই গেছিলাম আজ।' কেঁপে উঠল সে।

'জখম-টখম?'

'নাহ্। কিন্তু নড়তে তো পারছি না এখনও। শার্টটা আটকে রয়েছে।'

'দাঁড়াও, আসছি।'

চাকাটার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল কিশোর। বুঝল কি বাঁচাটাই না বেঁচেছে মুসা। ওই চাকার মধ্যে ঢুকে গেলে কিমা হয়ে যেত তার শরীর।

পাশে এসে দাঁড়ালেন প্রফেসর, 'ও ভাল আছে?'

'আছে,' জবাব দিল কিশোর।

'শার্টটা খুলছ না কেন?'

'খুলছি।'

দুজনে মিলে টানাটানি করে শার্টটা চাকার দাঁত থেকে খুলে আনল। কাপড় নষ্ট হয়ে গেছে। পরার যোগ্য নেই আর। তবে তা নিয়ে মাথা ঘামাল না মুসা। বেঁচেছে যে এই বেশি।

'একেবারে সময়মত হাজির হয়েছ,' ছেঁড়া শার্টের কোণাটা সমান করতে করতে মুসা বলল। 'আজ আর বাঁচার আশা ছিল না।...এলে কি করে?'

কিভাবে এসেছে জানাল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু তুমি এখানে এসেছিলে কেন?'

খুলে বলল মুসা। কমেটকে দৌড় করাতে বেরিয়ে রেড রিভারের লাল পানি দেখার কৌতূহল, বনের মধ্যে ঢোকা, প্রফেসরের খপ্পরে পড়া, বন্দী-ঘর থেকে বেরোনো, সব কথা।

পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল রবিন। কিশোরের দেরি দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে চলে এসেছে। মুসা আর কিশোরকে নিরাপদ দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। প্রফেসরকে বলল, 'সরি, স্যার, আপনার সদর দরজা খোলা...আমার বন্ধুরা বিপদে পড়েছে ভাবলাম...' কিশোরের দিকে তাকাল সে, 'অত ভাবতাম না, যদি

গ্রেগরিকে ওভাবে ছুটে বেরিয়ে যেতে না দেখতাম।'

অনেক ধকল গেছে প্রফেসরের ওপর দিয়ে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না আর। তাঁকে টলতে দেখে তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল কিশোর। 'চলুন, আপনাকে বসিয়ে দিই।'

ধরে ধরে তাঁকে বসার ঘরে নিয়ে এল ওরা। একটা আর্মচেয়ারে নেতিয়ে পড়লেন তিনি। বিধ্বস্ত লাগছে তাঁকে। বিস্মিত চোখ মেলে তাকাতে লাগলেন ওদের দিকে। 'কি করেছি আমি, বলো তো?'

'কি করেছেন মানে?' কপাল কুঁচকাল কিশোর। 'কিছুই মনে করতে পারছেন না?'

জবাব দিলেন না প্রফেসর। কিংবা দিতে পারলেন না। চোখ বুজলেন। মাথাটা এলিয়ে পড়ল চেয়ারের বাইরে।

'প্রফেসর ড্যানহ্যামের মাথায় গ্রেগরি বাড়ি মারেনি,' মুসা বলল।

'তাহলে কে মেরেছে?' ভুরু নাচাল রবিন

'প্রফেসরের কাছ থেকে মূর্তিটা কেড়ে নিতে এসেছিল গ্রেগরি। লুকিয়ে থেকে ওদের কথা সব শুনেছি আমি।'

ডেমিরন আর গ্রেগরির মাঝে কি কি কথা হয়েছে, সব জানাল মুসা।

হঠাৎ খুলে গেল প্রফেসরের চোখ। 'পুলিশ!...পুলিশকে ফোন করা দরকার!' যেন শুধু এই কথাটা বলার জন্যে চোখ মেলেছিলেন। বন্ধ করে ফেললেন আবার।

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'রবিন, গ্রেগরি কোন্‌দিকে গেছে?'

'সেটাই তো অবাক লাগল আমার। গাড়ির দিকে যায়নি। গেছে উল্টো দিকে। বনের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে।'

'খাইছে!' মুসা বলল, 'তারমানে গুহার দিকে গেছে। মূর্তিটা নিতে।'

'কোন্‌ গুহা? চেনো নাকি?' উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'গুহা একটা দেখেছি বটে। ওখান থেকেই ধরে এনেছেন আমাকে প্রফেসর...তবে যদি ওই গুহাটাই হয়। জলদি চলো।'

ষোলো

নদীর ধার ধরে দৌড়ে চলল তিন গোয়েন্দা।

ঢুকে পড়ল বনের মধ্যে। আগে আগে চলেছে মুসা। কান খাড়া। চোখ সতর্ক। সামনে বাঁক নিয়ে এগিয়েছে নদীটা। উঁচু হতে শুরু করেছে ভূমি। পাহাড়টা রয়েছে সামনেই।

ছুটতে ছুটতেই গাছপালায় ছাওয়া ঢালটা খুঁজছে মুসার চোখ যেটাতে রয়েছে গুহা

আশেপাশেই কোথাও থাকতে পারে গ্রেগরি। সাবধান রইল ওরা। শব্দ না করে এগোনোর চেষ্টা করল।

পাহাড়ের ঢালটা দেখা গেল অবশেষে

'ওই যে,' হাত তুলে গুহাটা দেখাল মুসা।
পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছে থামল না ওরা। দৌড়ে উঠে চলল ঢাল বেয়ে, গুহা লক্ষ্য করে। গুহামুখের কাছে এসে তারপর দাঁড়াল। গুহামুখের হাঁ করা মুখটা দিয়ে কালো সুড়ঙ্গটাকে লাগছে মানুষের গলার মত।
গ্রেগরিকে দেখা গেল না। চারপাশে তাকাল কিশোর। আসেনি এখনও? নাকি ঢুকে গেছে গুহার মধ্যে?
'যা অন্ধকার,' সুড়ঙ্গের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল রবিন, 'ঢুকতে হলে আলো লাগবে।'
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'সাইকেলের ল্যাম্প আছে। মুসা, থাকো এখানে। চোখ রাখো। গ্রেগরি এলে লুকিয়ে পড়বে। তোমাকে যেন না দেখে।'
'দেখবে না।'
'এসো,' রবিনকে বলে আবার দৌড় দিল কিশোর।
গুহামুখের কয়েক গজ তফাতে একটা ঘন কাঁটাঝোপের দিকে এগোল মুসা।
বনের মধ্যে দিয়ে সাবধানে এগোল রবিন আর কিশোর। কড়া নজর রাখল। কিছুতেই গ্রেগরির চোখে পড়তে চায় না।
ল্যাম্প খুলে নিয়ে আবার গুহার কাছে ফিরে চলল দুজনে। হঠাৎ কিশোরের হাত আঁকড়ে ধরল রবিন। 'দেখো!'
বিশ-পঁচিশ গজ দূরে গাছপালার আড়ালে আড়ালে এগিয়ে চলেছে একটা কালো ছায়া। গ্রেগরি। ওদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে সে। বিড়বিড় করে গাল দিচ্ছে।
নীরব হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। 'পথ হারিয়েছে মনে হচ্ছে। গুহাটা খুঁজে পায়নি,' ফিসফিস করে বলল সে। 'এই সুযোগে মূর্তিটা খুঁজে বের করে ফেলা দরকার।'
ওরা কাছে যেতেই ঝোপের ওপরে মাথা তুলল মুসা।
'আসেনি এদিকে,' বলল সে। 'মনে হয় অন্য কোনদিকে গেছে।'
'হ্যাঁ, অন্যদিকেই গেছে,' রবিন বলল। 'এইমাত্র দেখে এলাম। উল্টো দিকে।'
'কথা বলে সময় নষ্ট,' কিশোর বলল। 'খুঁজে খুঁজে আবার চলে আসতে পারে এদিকে।'
গুহামুখটা ছোট, চার ফুট উঁচু। খোঁচা খোঁচা পাথর বেরিয়ে আছে।
ভেতরে ঢুকল কিশোর। আলোটা বাড়িয়ে ধরল। নিচু ছাতওয়ালা খিলানের মত সুড়ঙ্গটা দেখল। ফিরে তাকিয়ে মুসাকে বলল, 'তুমি মুখের কাছেই থাকো। পাহারা দাও। গ্রেগরিকে বিশ্বাস নেই।'
মাথা নিচু করে রেখে রবিনকে নিয়ে এগিয়ে চলল কিশোর। ল্যাম্পের আলোয় দেয়ালের গায়ে কিম্ভূত লাগছে ওদের ছায়া দুটো।
'দেখতে পাচ্ছ কিছু?' জিজ্ঞেস করল রবিন। অদ্ভুত চাপা শোনাল তার কণ্ঠস্বর। চারপাশের পাথরের জন্যেই এমন হচ্ছে, শুষে নিচ্ছে যেন শব্দ।
'কোনখানে রেখেছেন যদি তা-ও বলতেন,' মূর্তিটা রাখা যেতে পারে এমন কোন তাক কিংবা ছোট খোঁড়ল আছে কিনা দেখতে দেখতে চলেছে কিশোর।
কিছুই চোখে পড়ল না। সামনে কালো অন্ধকারের ওপারে গিয়ে শেষ হয়ে

গেছে সুড়ঙ্গ। বালিতে ঢাকা মেঝে। পাথর ছিটিয়ে আছে ইতস্তত।

একটা গুহায় ঢুকেছে ওরা। মাঝারি আকারের কামরার সমান। বড় বড় পাথরের চাঙড় বিচিত্র ছায়া ফেলেছে দেয়ালে। গুহার পেছনে অন্ধকার একটা ফাটল—আরেকটা সুড়ঙ্গ, ভাবল কিশোর।

কিশোরের আগে রবিনের চোখে পড়ল জিনিসটা। আলোটা ধরে রেখে বলল, 'মিস ড্যানহ্যামের ব্রীফকেস!'

ছুটে গেল কিশোর। ব্রীফকেসটা খুলল। কিন্তু কাগজ আর দলিলপত্র ছাড়া অন্য কিছু নেই তাতে। মূর্তিটা নেই।

ল্যাম্প তুলে পাথর বিছিয়ে থাকা মেঝেটার ওপর ফেলল সে। ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে এনে ভাল করে দেখতে লাগল।

ঝিক করে উঠল মনে হলো সোনালি রঙের কিছু। ছোট্ট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে। 'ওই যে!' গুহার শেষ প্রান্তে একটা চ্যাপ্টা পাথরের ওপর পড়ে আছে মূর্তিটা। 'রবিন, পেয়ে গেছি!'

এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল সে। খুব ভারী।

পেছনে শব্দ হলো এই সময়। ঘুরে দাঁড়াল দুজনে। দেখল, মুসা এসে দাঁড়িয়েছে। শঙ্কিত কণ্ঠে জানাল মুসা, 'গ্রেগরি! দোষটা আমারই। কাছাকাছি ঘুরঘুর করছিল। শব্দ শুনে মাথা তুলেছিলাম। দেখে ফেলল। আসছে। কি করব এখন?'

'একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ব,' রবিন বলল। 'ও জানে না আমরা তিনজনেই আছি।'

'মারপিটের মধ্যে না গিয়ে অন্য কিছু করা যায় কিনা ভাবা দরকার,' কিশোর বলল। 'ওর কাছে পিস্তল থাকতে পারে। পিস্তল দেখিয়ে সহজেই কেড়ে নেবে মূর্তিটা।' গুহার অন্য প্রান্তের ফাটলটার দিকে তাকাল। 'ওটা হয়তো বেরোনোর পথ। আর কিছু না হোক লুকিয়ে তো থাকতে পারব।'

'কিন্তু ফাটলটা ওর চোখেও পড়তে পারে,' রবিন বলল। 'পিছু নেবে আমাদের।'

'তা নেবে হয়তো। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেও ছাড়বে না। কেটে পড়ার চেষ্টা করাই ভাল।'

পায়ের শব্দ ভেসে এল গুহামুখের কাছ থেকে

'এসে গেছে!' বলে উঠল মুসা।

আর দ্বিধা করল না ওরা। এক সারিতে ঢুকে পড়ল কালো ফাটলটার মধ্যে। কিশোর হাঁটছে আগে আগে, মুসা সবার শেষে। ছাত দেখা গেল না সুড়ঙ্গটার, ওপরে আলো ফেললে কেবল পাথর চোখে পড়ে। দুদিক থেকে ঠেলে এসে গায়ে গায়ে লেগে ছাতের মত হয়ে আছে আসল ছাত ওটা নয়।

যতই এগোচ্ছে, ধীরে ধীরে চওড়া হয়ে আসছে ফাটলটা। আরেকটা গুহা পাওয়া গেল। চতুর্দিকে অসংখ্য সুড়ঙ্গ বেরিয়ে গেছে এটা থেকে।

'এবার কি?' মুসার প্রশ্ন।

'লুকিয়ে পড়ব,' একটা সুড়ঙ্গ-মুখে আলো ফেলল কিশোর।

সুড়ঙ্গের ছাত এতই নিচু, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হলো ওদের। চার হাত-পায়ে

ভর দিয়ে এগিয়ে চলল চতুষ্পদ জন্তুর মত।
'আলো নিভিয়ে দাও,' কিশোর বলল। 'আলো দেখলে বুঝে যাবে আমরা কোনদিকে গেছি।'
নিভিয়ে দেয়া হলো ল্যাম্পগুলো। ঘন অন্ধকারে নিজেদের নিঃশ্বাসের শব্দকেও অনেক বেশি জোরাল শোনাল।
কান খাড়া করে আছে পেছন থেকে শব্দ আসে কিনা শোনার জন্যে।
সবার পেছনে রয়েছে মুসা। সুড়ঙ্গের মুখের দিক থেকে আসা আলোর ঝিলিকটা তার চোখে পড়ল সবার আগে।
দম বন্ধ করা উত্তেজনা।
এগিয়ে আসছে আলোটা। টর্চ নয়। কাঁপা কাঁপা ম্লান আলো।
গুহার মধ্যে পায়ের শব্দ। জুতো পড়ছে পাথরে।
সুড়ঙ্গ-মুখে জুতোর ছাপ দেখেই বুঝে ফেলবে কোনদিকে গেছি আমরা—ভাবল কিশোর।
তার আশঙ্কা সত্যি হলো। সুড়ঙ্গের মধ্যে আলো বাড়তে শুরু করল। ফিরে তাকিয়ে সাদা আলোর ক্ষুদ্র শিখাটা নাচতে দেখল মুসা।
ওদের মতই হামাগুড়ি দিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকেছে গ্রেগরি। এক হাতে উঁচু করে ধরে রেখেছে একটা সিগারেট লাইটার।
'তাহলে ঠিকই অনুমান করেছি!' গ্রেগরি বলল। এগিয়ে আসতে শুরু করল দ্রুত। থাবা মারল মুসার পা ধরার জন্যে।
লাথি মেরে তার হাতটা সরিয়ে দিল মুসা।
'পালিয়ে বাঁচবে মনে করেছ!' হিসিয়ে উঠল গ্রেগরি। 'পারবে না! কোনমতেই পালাতে দেব না তোমাদের!'
'তাই নাকি?' রেগে গেল রবিন। 'কি করবেন?'
'ভাল চাও তো মূর্তিটা দাও!' চিৎকার করে উঠল গ্রেগরি। আরেকটু এগোল। ধূসর দেয়ালে ছায়া নেচে উঠল।
পেছন দিকে আবার লাথি মারল মুসা। গ্রেগরির হাত থেকে ফেলে দিল লাইটারটা।
হঠাৎ করে আলো নিভে যাওয়ায় অন্ধকারটা অনেক বেশি গাঢ় মনে হলো।
রবিনের হাত ধরে টান দিল কিশোর। যতটা দ্রুত সম্ভব এগিয়ে গিয়ে ফাঁকি দিতে হবে গ্রেগরিকে। তার বিশ্বাস, বেরোনোর কোন না কোন পথ নিশ্চয় আছে সামনে।
এগোতে এগোতে আচমকা হাতটা আর মাটিতে পড়ল না কিশোরের। শুধুই শূন্যতা।
ধড়াস করে এক লাফ মারল তার হৃৎপিণ্ড। উঠে চলে এল যেন গলার কাছে। সামনের দিকে ঝুঁকে গেল শরীরটা। নিচু হয়ে পড়ে যাচ্ছে। ঠেকানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। মাথা নিচু করে পিছলে নেমে চলল দেহটা।
চিৎকার করে উঠল কিশোর।
কিশোরের কিছু একটা হয়েছে, বুঝতে পারল রবিন। ধরার জন্যে হাত বাড়াল

অন্ধকারে। কিশোরের পায়ে ছোঁয়া লাগল বটে, কিন্তু ঠেকাতে পারল না। বরং পিছলে গেল সে-ও। কিশোরের মত একই ভাবে নিচে পড়তে শুরু করল। চিৎকার করে উঠল।

সতেরো

দুজনের চিৎকারই শুনতে পেল মুসা। ভারী দেহ দুটো গড়িয়ে পড়া, সেই সঙ্গে হড়হড় করে নেমে যাওয়া পাথরের শব্দ। গভীর অন্ধকারে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়ল সে।

কান পেতেও আর কিছু শুনতে পেল না।

কি ঘটেছে অনুমানের চেষ্টা করল সে। ঠিক তার সামনেই ছিল ওরা। মুহূর্ত আগেও ছিল। এখন নেই। স্তব্ধ নীরবতা। বুঝতে পারছে, সে এখন একা।

পেছনে গ্রেগরির নিঃশ্বাসের শব্দ কানে আসছে। সেই সঙ্গে পাথরে হাতড়ানোর। লাইটারটা খুঁজছে গ্রেগরি।

কি করবে বুঝতে পারছে না মুসা। পড়ে যাবার ভয়ে আগে বাড়তে সাহস করছে না। ভয়ানক এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে রয়েছে যেন। তবে ঘুমের দুঃস্বপ্নের চেয়ে এটা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর, এটা থেকে জেগে গিয়ে বাঁচার উপায় নেই।

ভাল বিপদে পড়েছে। আগে বাড়লে কিশোর আর রবিনের অবস্থা হবে। থেমে থাকলে লাইটারটা খুঁজে বের করে গ্রেগরি এসে তাকে ধরে ফেলবে।

ও কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগেই খস করে শব্দ হলো। জ্বলে উঠল গ্রেগরির লাইটার। দেয়ালে নেচে উঠল কালো কালো ছায়া।

কানের কাছে শিরাগুলোতে শোঁ-শোঁ করছে রক্ত। গলায় ঝোলানো ডবি স্টোনটা চেপে ধরল মুসা। পরক্ষণে সরিয়ে আনল হাত। এটা তাকে দিয়েছেন প্রফেসর ভূতের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে। গ্রেগরি মানুষ। তাকে ঠেকাতে হলে অন্য অস্ত্র দরকার। আর কিছু না হোক, একটা পাথর পেলেও হয়। ছুঁড়ে মারতে পারবে গ্রেগরির কপালে।

পাথর খুঁজতে গিয়ে হাতে ঠেকল একটা ল্যাম্প। কিশোর বা রবিনেরটা হবে। ফেলে গেছে।

গ্রেগরির বিরুদ্ধে কোন অস্ত্র নয় এটা। আলোটা হাতে পেতেই মনে হলো জাহান্নামে যাক গ্রেগরি!–আগে রবিন আর কিশোরের কি হয়েছে দেখা দরকার। সুইচ টিপে আলো ফেলল সামনের দিকে।

চিৎকার করে উঠল গ্রেগরি।

কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল মুসা। গ্রেগরি এগিয়ে আসছে কিনা দেখল। আবার তাকাল সামনের দিকে। কয়েক ফুট দূরে একটা গর্ত। গর্তের মেঝেটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে।

বুকের মধ্যে ধুড়ুস ধুড়ুস করছে। নিচে নিশ্চয় এখন বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে রবিন আর কিশোর। কিংবা আরও খারাপ কিছুও ঘটে থাকতে পারে।

হামাগুড়ি দিয়ে গর্তটার একেবারে কিনারে চলে এল সে। আলো ফেলল নিচের দিকে। তল দেখা গেল না। আলোর সীমানার ওপারে গাঢ় অন্ধকার।

'কিশোর! রবিন!' চিৎকার করে ডাকল সে।

আলো ঘুরিয়ে দেখতে গিয়ে পাথরের খাঁজে একটা চকচকে জিনিস চোখে পড়ল তার। সোনার মূর্তিটা আটকে আছে। হাত বাড়িয়ে তুলে আনল।

'কিশোর!' চিৎকার করে ডাকল আবার।

জবাবে নিচ থেকে অস্পষ্ট সাড়া এল বলে মনে হলো। কিন্তু সেটা তার চিৎকারেরই প্রতিধ্বনি কিনা নিশ্চিত হতে পারল না।

পেছনে শব্দ হতে ঝট করে ফিরে তাকাল। ভুলেই গিয়েছিল গ্রেগরির কথা।

তার পা চেপে ধরল গ্রেগরি। কঠিন স্বরে আদেশ দিল, 'মূর্তিটা দাও!'

'আমার বন্ধুরা,' গলা শুকিয়ে গেছে মুসার, স্বর বেরোতে চাইছে না, 'নিচে পড়ে গেছে। হাত-পা ভেঙে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতে পারে।'

'তাই?' মুসার হাতের মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে চোখ চকচক করছে গ্রেগরির।

'আমাকে সাহায্য করুন,' মরিয়া হয়ে বলল মুসা। 'ওদের জন্যে কিছু করা দরকার।'

'মূর্তিটা দাও!' ধমকে উঠল গ্রেগরি।

'না!' হাতটা গর্তের দিকে বাড়িয়ে ভয় দেখাল মুসা, 'আমাকে সাহায্য না করলে গর্তে ফেলে দেব এটা।'

মুসার পা ছেড়ে দিল গ্রেগরি। লোভে চকচক করছে চোখ। ধীরে ধীরে কুটিল হাসি ফুটল মুখে। 'করব।' হাত বাড়াল সে, 'দাও।'

কিশোরের মনে হলো, পতনটা শেষ হবে না কোনদিন। চারপাশে তার সঙ্গে গড়িয়ে নামছে পাথর। পাহাড়ের ভেতরে ধস শুরু হলো কিনা বুঝতে পারল না সে। শঙ্কিত হয়ে আছে, যে কোন মুহূর্তে নিচ থেকে মাটি সরে যাবে, অনন্ত শূন্যে ভাসতে ভাসতে কোন্ অতলে গিয়ে পড়ে ভর্তা হবে তার শরীর কে জানে!

প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল তার শরীর। মনে হলো হাড়গোড় তার আস্ত নেই একটাও। ফুসফুসের সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেছে। দম নেয়ার জন্যে হাঁসফাঁস শুরু করল। গায়ের ওপর পাথরবৃষ্টি হচ্ছে।

চোখ মেলে তাকাল। অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না।

গায়ের ওপর এসে পড়ল ভারী কিছু। বুঝল, আরেকটা দেহ। কাশি শুনে বুঝতে পারল, রবিন

'রবিন?' দম নিতে গিয়ে নাকে ঢুকে যাচ্ছে বালি

'হ্যাঁ,' জবাব এল মৃদু কণ্ঠে।

'হাড়টাড় ভেঙেছে?'

'বুঝতে পারছি না সারা গায়েই তো ব্যথা।'

'ভাল করে দেখো।

ভাল করে দেখে জানাল রবিন, 'হাড় তো মনে হচ্ছে আস্তই আছে তবে চামড়া নেই এক ইঞ্চিও। সব ছড়ে গেছে।'

'আমারও নেই,' কনুই ডলতে ডলতে বলল কিশোর।

দাঁড়ানোর চেষ্টা করল রবিন। আবার ঝুরঝুর করে পাথর ঝরে পড়ল কয়েকটা। 'ল্যাম্পটা আছে তোমার হাতে?'

'না। পড়ে গেছে।' উঠে বসল কিশোর। 'মুসার খবর কি?'

'এখনও মনে হয় ওপরেই আছে। আমার পেছনেই ছিল।' হতাশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'কিশোর, কি করব আমরা এখন?'

'হাতড়াতে থাকো। ল্যাম্পগুলোও গড়িয়ে পড়ার কথা। আমারটা হাতেই ছিল, কখন যে ছেড়ে দিয়েছি মনে নেই।'

'ওপরে কোথাও আটকে গিয়ে থাকলে আর পাব না।'

অন্ধকারে হাতড়াতে শুরু করল দুজনে। মিহি পুরু বালিতে ঢাকা মেঝে। এই বালির কারণেই মারাত্মক জখম কিংবা হাড় ভাঙা থেকে বেঁচে গেছে ওরা।

হাতড়াতে হাতড়াতে যখন কিশোরের মনে হলো আর পাবেই না, ঠিক তখন একটা ল্যাম্প হাতে ঠেকল তার। তুলে নিয়ে জ্বালতে যাবে, কানে এল অস্পষ্ট চিৎকার।

'শুনলে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'মুসা!' জোরে এক হাঁক ছাড়ল কিশোর, 'আমরা এখানে!'

জবাবের আশায় কান পেতে রইল।

এল না জবাব।

সুইচ টিপল কিশোর। গাঢ় অন্ধকারে সূর্যের আলোর মত উজ্জ্বল মনে হলো ল্যাম্পের আলো। পরম স্বস্তিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল ওরা। দুজনেই দুজনের চেহারা দেখল। মাথা, সারা গা বালিতে মাখামাখি। কাপড় ঝাড়তে গেল রবিন। থাবা দিতেই ধুলোর ঝড় উঠল। থেমে গেল সে।

কোথায় পড়েছে, আলো ফেলে দেখতে শুরু করল কিশোর। নিচু ছাতওয়ালা বড় একটা গুহার মধ্যে পড়েছে।

ঢালু গর্তের মত সুড়ঙ্গটা দিয়ে ওপরে তাকাল রবিন, যেটা দিয়ে পড়েছে। 'ওঠা অসম্ভব। ওপর থেকে দড়ি ফেললে পারা যায়…মুসা ফেলবে, তাই না?'

'পাবে কোথায়?'

কিশোরও তাকিয়ে আছে ঢালটার দিকে। বেঁকে যাওয়া ছাত দৃষ্টি আটকে দেয়। ওপরে কি আছে দেখা যায় না।

'আমরা এখানে আছি জানাতে হবে ওকে,' বলল সে।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে চিৎকার করার জন্যে তৈরি হলো দুজনে।

'রেডি?' কিশোর বলল।

মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'রেডি।'

বুক ভরে বাতাস নিয়ে, ওপর দিকে মুখ তুলে বিকট চিৎকার করে উঠল ওরা। অন্ধকারে ভয়াবহ প্রতিধ্বনি তুলল সে-শব্দ।

আঠারো

গ্রেগরিকে বিশ্বাস করতে পারল না মুসা। মূর্তিটা দিতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে হাতটা সরিয়ে আনল। গর্তের দিকে তাকাল। আবার দিতে গেল। ঠিক এই সময় কানে এল চিৎকার। ঝট করে সরিয়ে নিল হাত।

রাগে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ফেলল গ্রেগরি। ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল মুসার ওপর।

'খবরদার!' হুমকি দিল মুসা, 'গায়ে হাত দেবেন না। ভাল হবে না তাহলে। প্রফেসর ডেমিরন পুলিশকে ফোন করে দিয়েছেন। বেশি দূর যেতে পারবেন না। ধরা পড়ে যাবেন।'

কিন্তু হুমকির পরোয়া করল না গ্রেগরি। শুরু হলো ধস্তাধস্তি। হাত থেকে আলোটা পড়ে গেল মুসার। কিন্তু মূর্তি ছাড়ল না।

থামল না গ্রেগরি। দুজনেই যে সরে যাচ্ছে ঢালু গর্তের দিকে সে খেয়ালই রইল না।

শেষ পর্যন্ত মুসার হাত থেকে মূর্তিটা কেড়ে নিল গ্রেগরি। মুসা তখন গর্তের মুখে পড়ে গেছে। মরিয়া হয়ে অন্ধকারেই থাবা মারল। পা আঁকড়ে ধরল গ্রেগরির। ওকে ভর করে ওপরে উঠে যেতে চাইল।

টান লেগে গর্তের দিকে কয়েক ইঞ্চি সরে গেল গ্রেগরি। হাতে মূর্তিটা না থাকলে হয়তো পাথর আঁকড়ে ধরে বাঁচতে পারত। এক হাতে সুবিধে করতে পারল না। মুসার ওজন তাকে নামিয়ে নিয়ে এল।

তারপর শুরু হলো পতন।

গড়াতে গড়াতে পড়তে লাগল দুজনে। এত কিছুর মধ্যেও গ্রেগরির পা ছাড়ল না মুসা।

ওপর থেকে আবার পাথরের ধস নেমে আসছে দেখে লাফ দিয়ে দুদিকে সরে গেল রবিন আর কিশোর। ধুপ ধুপ করে দুটো দেহ এসে আছড়ে পড়ল, ধাক্কা খেল দেয়ালে—ঠিক ওরা যেমন করে পড়েছিল।

বিস্ময়ের প্রথম ঘোরটা কাটলে দেখল, মুসা আর গ্রেগরি পড়েছে।

মুসাকে উঠতে সাহায্য করল ওরা।

গোড়ালি চেপে ধরে গোঙাচ্ছে গ্রেগরি। ককিয়ে উঠল, 'বাবাগো, পা'টা গেছে আমার! এই শয়তান ছেলেটা শেষ করে দিয়েছে!'

পরীক্ষা করে বোঝা গেল, গোড়ালি মচকে গেছে ওর। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। ব্যথায় চিৎকার দিয়ে বসে পড়ল আবার।

পড়ার সময় মুসা ওর পা চেপে ধরে রেখেছিল, তাতেই ঘটেছে অঘটন। গড়ানোর সময় মোচড় লেগে মচকে গেছে। তবে এত কিছুর মধ্যেও মূর্তি ছাড়েনি। হাতেই রয়েছে তার।

'যত নষ্টের গোড়া হচ্ছে এই মূর্তিটা,' রবিন বলল। 'এটার জন্যেই আটকা পড়লাম এখানে।' কিশোরের দিকে তাকাল, 'ভেবেছিলাম মুসা টেনে তুলবে, সেই

ভরসাও তো শেষ। কি করা যায় এখন?'

নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটছে কিশোর। আলো ফেলল দেয়ালটার ওপর, যেটাতে ধাক্কা খেয়েছিল। ফিরে তাকিয়ে দুই সহকারীকে বলল, 'চলো, এগিয়ে দেখা যাক কোথায় গেছে।'

'গিয়ে কি কোন লাভ হবে?' মুসার প্রশ্ন।

'তাই বলে তো আর বসে থাকা যায় না। একটা কিছু তো করতে হবে। ওঠো, এসো।'

'আমার কি হবে?' ককিয়ে উঠল গ্রেগরি।

'তার আমরা কি জানি?' কিশোর বলল, 'পড়ে থাকুন আপনার মূর্তি নিয়ে। ওটার জন্যেই তো এতসব, বলুন না এখন ওটাকে, আপনাকে বাঁচাক।'

'দেখো, আমাকে ফেলে যেয়ো না, প্লীজ!'

'তো কি করব?'

'সঙ্গে নিয়ে যাও।'

'কি করে নেব? দাঁড়াতেই তো পারছেন না।'

'তোমরা সাহায্য করলে পারব।'

'কিন্তু কেন করব আমরা? আপনার হাত থেকে পালাতে গিয়েই তো এখন এই বিপদ।'

'দেখো, যা হবার হয়েছে। আমার ভুল আমি বুঝতে পারছি। জাহান্নামে যাক এটা!' মূর্তিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল গ্রেগরি। অন্ধকারে পাথরের ওপর পড়ার শব্দ হলো। 'আমার দরকার নেই।'

'আমার একার মতে তো হবে না, দেখি ওরা কি বলে,' দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। 'এই, কি বলো তোমরা?'

'ভুল বুঝতে পারলে আর কারও ওপর রাগ থাকা উচিত নয়,' রবিন বলল।

'দেখো, ও মানুষ ভাল না,' মুসা বলল, 'ভেজালে পড়ব বলে দিলাম। তারচেয়ে থাকুক এখানে। আমরা বেরিয়ে গিয়ে পুলিশকে বলব...'

'না না! আমাকে ফেলে যেয়ো না!' কেঁদে ফেলবে যেন গ্রেগরি। 'একলা থাকলে আমি মরে যাব! ক্লসট্রোফোরিয়া আছে আমার! দোহাই তোমাদের। আমাকে নিয়ে যাও।'

'নিয়েই নিই,' মুসাকে বলল কিশোর। 'ঝামেলা করলে তখন ফেলে দিয়ে চলে যেতে পারব।'

মূর্তিটা কোথায় দেখার জন্যে আলো ফেলেই স্থির হয়ে গেল কিশোর। নীরবে তাকিয়ে রইল ওটার দিকে। ধড় থেকে মুণ্ডটা আলাদা হয়ে গেছে। ভাঙা গলাটা ধূসর রঙের।

'কি হলো?' বলতে গিয়ে রবিনেরও নজর পড়ল। চিৎকার করে উঠল, 'হায় হায়, নকলটা!'

'খাইছে!' মুসা বলল। 'এটার জন্যে এত কাণ্ড করলাম! প্রফেসর আমাদের ঠকিয়েছে।'

ভাঙা টুকরো দুটো তুলে নিয়ে পকেটে ভরল কিশোর।

'এগুলো আর নিলে কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'প্রমাণ।'

'কিসের?'

'জুয়াচুরির। নাও, চলো। বেরোনোর চেষ্টা করা দরকার।'

আগে আগে পথ দেখে এগিয়ে চলল সে। দেয়ালের কিনার ঘেঁষে। পেছনে মুসা আর রবিনের কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোচ্ছে গ্রেগরি

এক ভাবে এগিয়ে গেছে দেয়ালটা। সুড়ঙ্গের অন্য পাশের দেয়াল কখনও চেপে আসছে, কখনও সরে যাচ্ছে। পায়ের তলে বালিতে কখনও ঢেউ, কখনও উঁচুনিচু ঢিবি, কখনও সমান। শ'খানেক গজ এগোনোর পর কান পাতল কিশোর, 'কিছু শুনছ?'

'হ্যাঁ, ভূতেরা গোসল করছে!' গলা কেঁপে উঠল মুসার।

চাপা, অদ্ভুত কলকল শব্দ।

'পানি!' কিশোর বলল।

'পানি!' উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন। 'তাহলে তো খুব ভাল। এ জিনিসটাই এখন আমাদের দরকার। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।'

'খাওয়ার উপযুক্ত হলে তবে তো গলা ভেজানো,' শুরুতেই বেশি আশা করে নিরাশ হতে চায় না কিশোর। 'চলো, এগিয়ে দেখি।'

মোড় নিল দেয়াল। বালির উঁচু পাড় দেখা গেল। তাতে চড়ল ওরা। ছাত লেগে গেল মাথায়। পাড়ের ওপাশে লাল কাদা। তার কিনার ঘেঁষে বয়ে চলেছে কালো পানি। হয়তো পরিষ্কারই, গুহার ভেতরে অন্ধকারে ওরকম কালো লাগছে।

পাতালের নদী। পাহাড়ের নিচে থাকে। এ ধরনের নদী আগেও দেখেছে ওরা। কোন কোনটা বেরিয়ে যায় বাইরে। ওগুলোর পাড় ঘেঁষে এগোলে বাইরে বেরোনো যায়। তবে কোন্ দিকে যেতে হবে জানা থাকলে। উল্টো দিকে গেলে পাহাড়ের আরও গভীরে ঢুকে যাবে। বেরোনো তো দূরে থাক, বিপদ বাড়বে।

পানিতে আলো ফেলে ভাবতে লাগল কিশোর। কি করা যায়? কোনদিকে যাবে?

ভালমত আলো ফেলে দেখার পর বোঝা গেল, পানির রঙ কালো নয়, মরচে-লাল। মুখে দিয়ে দেখে এল মুসা। বলল, 'চমৎকার। লোহা লোহা একটা গন্ধ আছে বটে, তবে খুব মিষ্টি।'

পানি খেয়ে এল তিনজনে। গ্রেগরিকে নিয়ে যাওয়া ঝামেলা, তারচেয়ে রেখে যাওয়া ভাল। কাপড় ভিজিয়ে এনে ওর মুখে চিপে দিল মুসা।

'কোন্ দিকে যাওয়া যায়, বলো তো?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'কোন্ দিকে গেলে বেরোনো যাবে, বোঝা বোধহয় খুব একটা কঠিন না,' কিশোর বলল। 'পানির ধর্ম কি? ঢালুর দিকে বয়ে যাওয়া। স্রোতটা কোন দিকে চলেছে সেটা দেখলেই বোঝা যাবে ভাটি কোনটা, আর উজান কোনটা। উজান হলো উৎস, সেদিকে যাব না। মুখটা ভাটির দিকেই থাকবে।'

'ঠিক বলেছ,' আনন্দে চিৎকার করে উঠল রবিন। স্রোতের গতি দেখে নিয়ে আঙুল তুলল, 'ওদিকে যাব।'

মুসা হাসল না। কিশোরের হাতের ল্যাম্পের দিকে নজর। আলোর উজ্জ্বলতা

কমে গেছে। জিজ্ঞেস করল, 'কিশোর, ব্যাটারি কবে ভরেছ?'

'তা তো মনে নেই!...আরে, আলো তো কম!'

'জলদি বেরোতে হবে আমাদের,' শঙ্কিত হয়ে বলল মুসা। গ্রেগরিকে দেখিয়ে বলল, 'এই ঝামেলাবাজটা না থাকলে আরও তাড়াতাড়ি বেরোতে পারতাম আমরা। এই মিয়া, উঠুন, আমার কাঁধেই উঠুন। আপনার হেঁটে যাওয়ার চেয়ে বরং বয়ে নিলে সময় অনেক কম লাগবে। বাড়ি গিয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে হবে আরকি আমাকে। পিঠের ব্যথার সেঁক দিতে হবে। ঠেকায় যখন পড়েছি, আর কি করা।'

'তোমাদের এই বিপদে ফেলার জন্যে আমি দুঃখিত,' মিনমিন করে বলল গ্রেগরি।

'হয়েছে, উঠুন!'

উনিশ

নদীর পাড় ধরে স্রোতের দিকে এক সারিতে এগিয়ে চলল ওরা। পাড় খুব সরু। পাশ থেকে চেপে এসেছে দেয়াল। মাঝে মাঝেই বাঁক নিচ্ছে। পায়ের নিচে বালির পাড়েও পাথরের ছড়াছড়ি। চোখা পাথর আছে প্রচুর। এ ছাড়া আছে আলগা পাথর। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে পা হড়কালে গ্রেগরির অবস্থা হবে। সবচেয়ে অসুবিধে হচ্ছে মুসার, পিঠে ভারী বোঝা নিয়ে। মুখ বুজে সহ্য করছে সে। কোন অভিযোগ নেই।

কিছুদূর গিয়ে সামনে বালি শেষ হয়ে গেল। নদীর পাড় এখন নিরেট পাথরে তৈরি। আলোয় চকচক করছে। পানিতে ভেজা। স্রোতের শব্দ বদলে গেছে।

বদলে যাওয়ার কারণ বোঝা গেল আরও খানিকটা এগোনোর পর। সামনে পাথরের দেয়াল আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে আছে নদীর ওপর। নিচে চওড়া, মস্ত ড্রেনের মত ফোকর দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে পানি।

সেদিকে তাকিয়ে দমে গেল মুসা। গ্রেগরিকে পিঠ থেকে নামিয়ে দিয়ে হতাশ কণ্ঠে বলল, 'নাহ্, আর পারলাম না। ওটার মধ্যে দিয়ে যাওয়া অসম্ভব।'

'কে বলল?' পাহাড় সহজে দমাতে পারে না রবিনকে। 'ড্রেনের ওপর দিকটায় ফাঁক আছে দেখছ না। মাথা তুলে রাখতে পারব, বাতাসও পাওয়া যাবে।'

'নদীটা কতখানি গভীর, জানি না। যদি ঠাঁই পাওয়া না যায়?'

'দেখলেই হয়। ঠাঁই না পেলে সাঁতরে যাব। খুব অসুবিধে হবে না। বরং স্রোতের সাহায্য পাব। ঠেলে নিয়ে যাবে।'

পানিতে নেমে পড়ল রবিন। বুক সমান পানি। ফিরে তাকিয়ে হাসল, 'যাওয়া যাবে। এসো।'

নেমে পড়ল সবাই। রবিন চলল আগে আগে। আলোটা তার হাতে দিল কিশোর। মাঝখানে রইল সে। সবার পেছনে মুসা। পানিতে গ্রেগরির ভার অনেকখানি কমে গেল।

ড্রেনের মধ্যে গর্জন করে বয়ে চলেছে পানি। পেছন থেকে ধাক্কা মারছে স্রোত। তাতে সুবিধেই হচ্ছে। স্রোতের অনুকূলে যাচ্ছে। প্রতিকূল হলে বিপদে

পড়ত।

ল্যাম্পের আলো অনেক কমে গেছে। হলুদ, ঘোলাটে। ব্যাটারি প্রায় শেষ। যে কোন মুহূর্তে নিভে যেতে পারে।

সুড়ঙ্গটা এখানে মোটামুটি সোজাই এগিয়েছে। বাঁক কম। তবে মাথার ওপর ক্রমেই নিচু হয়ে আসছে ছাত। মাথা নামাতে নামাতে থুতনি ঠেকে যাচ্ছে এখন পানিতে। এ হারে চলতে থাকলে ওপরে ফাঁকা জায়গা বলতে আর কিচ্ছু থাকবে না। ফাঁকা না থাকলে বাতাসও থাকবে না। এগোবে কি করে তখন?

ফিরে তাকাল রবিন। কিশোরের হাত ধরে চাপ দিয়ে বলল, 'ফাঁক বন্ধ হয়ে গেলেও থামব না। ডুব দিয়ে হলেও এগোব।'

'যদি বেশি লম্বা হয় সুড়ঙ্গটা?' পেছন থেকে মুসা বলল। 'দম ফুরিয়ে যাবে। কোনদিনই ভেসে ওঠা হবে না আর।'

জবাব দিল না রবিন। এ সব ভাবতে গেলে এগোনো হবে না।

কিশোর বলল, 'বেরোতে হলে ঝুঁকি এখন নিতেই হবে। দেরি করলে আলো নিভে যাবে। তখন হবে আরও বিপদ।'

আরও নেমে এল ছাত। থুতনি, গাল ডুবে গেল। নাকের ফুটোর নিচে পানি। নড়াচড়া করতে গেলেই ফুটোয় ঢুকে যায়।

বিপদের ওপর বিপদ বাড়াতে ঠিক এই সময় ল্যাম্পটা গেল নিভে। ঝাঁকি দিয়ে, সুইচ টেপাটেপি করে জ্বালানোর চেষ্টা করল রবিন। কাজ হলো না। ব্যাটারি শেষ। শত চেষ্টা করেও আর জ্বালানো যাবে না।

প্রফেসর ডেমিরনের কথা মনে পড়ল মুসার–রুপানি, মিনাকুয়ো তোমার ওপর প্রতিশোধ নেবেই! তার মনে হলো, অদৃশ্য থেকে ওই পিশাচ দেবতাই একের পর এক বিপদে ফেলছে ওদের। তার একার জন্যে বাকি সবাই বিপদে পড়েছে। কিন্তু ভূতের তো অসীম ক্ষমতা। ওটা কি বুঝতে পারছে না সে রুপানি নয়! নিজের অজান্তেই আবার হাত চলে গেল গলায়। পাথরের লকেটটা চেপে ধরল।

এগোনো বন্ধ হলো না ওদের। পেছন দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে নাক ওপরে তুলে দম নিতে নিতে এগোল। পানির গর্জন বেড়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অন্য একটা শব্দ। পানি পড়ার। জলপ্রপাত!

আশা বাড়ল রবিনের। জলপ্রপাত হওয়ার একটাই মানে–সামনে সুড়ঙ্গ শেষ, পানি ঝরে পড়ছে নিচে। চলার গতি বেড়ে গেল তার।

সুড়ঙ্গের মুখে পৌঁছে গেল। পেছন থেকে প্রবল বেগে ধাক্কা দিচ্ছে পানি। মুখ বাড়িয়ে দেখা মুশকিল। এর মধ্যেই কোনমতে দেখে নিল, প্রপাতটা বড় না। ড্রেনের মুখ থেকে সবেগে কয়েক গজ নিচে পানি ঝরে পড়ে একটা ছোট পুকুর সৃষ্টি করেছে।

লাফ দিল সে। প্রপাতের পানির সঙ্গে সে-ও পড়ল পুকুরে। ডুবে গেল। পানি পড়ে পড়ে যথেষ্ট গভীর করে দিয়েছে। ভুশ করে মাথা তুলল আবার। সাঁতরে সরে গেল কিছুটা। পায়ের নিচ মাটি ঠেকতে ফিরে তাকাল।

কিশোরও পড়ল পানিতে।

তার পর পরই মুসা লাফ দিল গ্রেগরিকে পিঠে নিয়ে। লাফ দিল মানে নিচের

দিকে ছেড়ে দিল শরীরটা। প্রচণ্ড ব্যথায় চিৎকার করে উঠল গেগ্ররি। নিচে পড়ে পানির বাড়ি লেগেছে তার আহত পায়ে। প্রপাতের শব্দকে ছাপিয়ে তার চিৎকার বিকট প্রতিধ্বনি তুলল গুহার দেয়ালে।

পুকুরের কিনারে এসে বালিতে উঠে বিশ্রাম নিতে বসল রবিন। একটানা হেঁটে এসে ক্লান্ত।

সবাই পানি থেকে উঠে এসে বসল তার পাশে।

ককাতে ককাতে গ্রেগরি বলল, 'উফ্, মরে গেছি! পা'টা একেবারে শেষ!' ফুলে ওঠা গোড়ালিতে হাত বোলাতে লাগল সে।

জবাব দিল না কেউ।

গুহার মধ্যে পানি পড়ার একটানা শব্দ। পুকুরের পানি বাড়ছে না। এক জায়গায় স্থির। তারমানে বাড়তি পানি বেরিয়ে যাচ্ছে কোনখান দিয়ে।

'আলো আসছে কোত্থেকে?' এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বলল কিশোর।

তাই তো! গুহার মধ্যে অন্ধকার থাকার কথা। ল্যাম্প আগেই নিভে গেছে। কিন্তু অন্ধকার নেই। সব দেখতে পাচ্ছে। যদিও অস্পষ্ট।

আলো আসছে মাথার ওপরের একটা ফাটল দিয়ে। চুইয়ে চুইয়ে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রবিন। 'দাঁড়াও। দেখে আসি।'

গলা টানটান করে দিয়েও ফাটলটা পর্যন্ত চোখ পৌঁছে না। কোন কিছুর ওপরে দাঁড়াতে পারলে দেখতে পারত। পাথরের অভাব নেই। তিনজনে মিলে অনেক চেষ্টা করে বড় একটা পাথর গড়িয়ে এনে রাখল ফাটলের নিচে। তাতে উঠে দাঁড়াল রবিন। ফাটলটার ভেতরে কি আছে উঁকি দিয়ে দেখল।

ফাটলের ওপাশ থেকে আলো আসছে। আরেকটা খাটো সুড়ঙ্গই বলা চলে। আনন্দে বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল তার। ওপাশেই রয়েছে পাহাড়ের ঢাল। দিনের আলো আসছে। চিৎকার করে জানাল সে-কথা।

গুহায় ঢোকার পর এই প্রথম একটা আশার কথা শুনল ওরা।

ফাটলটায় ঢোকা ওদের তিনজনের জন্যে কঠিন নয়, কিন্তু গ্রেগরি উঠবে কি করে? ঠিক হলো, মুসা উঠে যাবে প্রথমে। নিচ থেকে গ্রেগরিকে তুলে ধরবে কিশোর আর রবিন। ওপর থেকে তুলে নেবে মুসা।

বলা সহজ। কিন্তু আহত একটা ভারী শরীরকে ওরকম বেকায়দা জায়গায় টেনে তোলা মোটেও সহজ নয়। ফাটলে উঠে বসল সে। গ্রেগরিকে তোলার চেষ্টা করল। কিন্তু জোর পেল না। পা গেল হড়কে। আরেকটু হলে গ্রেগরিকে সহ নিচে পড়ত। পাথরের ওপর মাথা নিচু করে পড়লে তার নিজের কি অবস্থা হত, ভাবতে চাইল না। শেষে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ফাটলে। হাত বাড়িয়ে দিল। বহু কষ্টে টেনে তুলল গ্রেগরিকে। তারপর রবিন আর কিশোরকে উঠতে সাহায্য করল সে।

শেষবারের মত পুকুরটার দিকে ফিরে তাকাল রবিন। আনমনে বিড়বিড় করল, 'দারুণ জায়গা! আবার আসব আমি এখানে। বেড়াতে। পুকুরটার তুলনা হয় না!'

তার সঙ্গে সুর মেলাল মুসা, 'হুঁ, সাঁতার কাটতেও ভীষণ ভাল লাগবে। যদি অবশ্য ভূতে তাড়া না করে।'

হাসল রবিন। 'কিশোরকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। পালাতে পথ পাবে না

ভূতের দল।'

ফাটলটা বেশি লম্বা না হলেও বেরোনো অত সহজ হলো না। অতিরিক্ত সরু। একজন মানুষের কোনমতে জায়গা হয়। ছাতও এত নিচু, দাঁড়ানো সম্ভব না। শেষে হামা দিয়ে, বুকে হেঁটে পৌঁছল এসে শেষ মাথায়। গ্রেগরিকেও এই পথটুকু ক্রল করে এগোতে হলো।

'রোদ! রোদ!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'বেরিয়ে গেছি আমরা!'

আনন্দে হেসে উঠল কিশোর।

ঘাসের ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ল মুসা।

গ্রেগরি হাঁপাচ্ছে আর ককাচ্ছে। মনে করিয়ে দিল, 'এখনও বহু পথ যেতে হবে।'

পাহাড়ের ঢালে বসে নিচে তাকাল কিশোর। ঝর্নাটা দেখতে পেল। ওদের নিচে বিশ-পঁচিশ গজ দূরে চওড়া একটা ফাটল। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে লাল পানি। লাল কাদার কারণে পানির এই রঙ। যে পাতাল নদীটা দেখে এসেছে ওরা, ওটা আসলে নদী নয়—এতক্ষণে বুঝতে পারল, আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেন। বৃষ্টি হলে পানিতে ভরে যায়। বেরিয়ে আসে ঢালের ওই ফাটল দিয়ে। নদীতে গিয়ে মেশে। নদীর পানি লালচে করে দেয়।

যাক, আরেকটা রহস্যের সমাধান হলো। রক্ত-কূপেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। মিথ্যে গুজব নয়।

রোদে গা শুকানোর পর একে অন্যের দিকে অবাক হয়ে তাকাতে লাগল ওরা। চামড়া লাল লাগছে। কোন ধরনের খনিজ এত বেশি মিশে যাচ্ছে ওই পানিতে, লাল বানিয়ে দিচ্ছে সব।

'আমার খিদে পেয়েছে,' আচমকা ঘোষণা করল মুসা। 'বাড়ি যাব।'

তার কথায় সবার পেটই মোচড় দিয়ে উঠল। উত্তেজনা কেটে যেতেই খিদে টের পাচ্ছে সবাই।

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'আগে প্রফেসর ডেমিরনের বাড়ি যেতে হবে। সাইকেলগুলো দরকার। হেঁটে তো আর বাড়ি ফিরতে পারব না।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

বনের ভেতর দিয়ে বহু কষ্ট আর পরিশ্রম করে গ্রেগরিকে নিয়ে প্রফেসর ডেমিরনের বাড়িতে হাজির হলো ওরা।

বাড়ির সামনে একটা পুলিশের গাড়ি দাঁড়ানো দেখল।

'নিশ্চয় পুলিশকে ফোন করেছেন প্রফেসর,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'কিন্তু পুলিশ গুহায় গেল না কেন...?' পুলিশের গাড়ির পাশে দাঁড়ানো একটা অ্যাম্বুলেন্সের ওপর চোখ আটকে দিল তার।

প্যারামেডিকের পোশাক পরা তরুণ একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে অ্যাম্বুলেন্সের পেছনে। খোঁড়া গ্রেগরি আর গোয়েন্দাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। মুসার কাঁধ ছেড়ে দিয়ে যখন আচমকা ধপাস করে পড়ে গেল গ্রেগরি, দৌড়ে এল লোকটা।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল সে।

'সে অনেক কথা,' কিশোর বলল। 'অ্যাম্বুলেন্স কেন? কারও শরীর খারাপ?'

'প্রফেসর ডেমিরন। পুলিশকে ফোন করেছিলেন। কিন্তু ওরা এসে তাঁকে বেহুঁশ অবস্থায় পেয়েছে। অ্যাম্বুলেন্সের জন্যে ফোন করেছে পুলিশ।'

'খুব খারাপ নাকি অবস্থা?' শঙ্কিত হলো কিশোর।

'বোঝা যাচ্ছে না। তবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা।'

দৌড় দিল তিন গোয়েন্দা। অ্যাম্বুলেন্সের পেছনে স্ট্রেচারে চিত হয়ে আছেন প্রফেসর। গলা পর্যন্ত কম্বল টানা। হুঁশ ফেরানোর চেষ্টা করছেন একজন ডাক্তার।

'ওই বুড়ো ছাগলটার কথা ছাড়ুন,' খেঁকিয়ে উঠল গ্রেগরি। 'পুলিশকে আসতে বলুন।' জ্বলন্ত চোখে মুসাকে দেখিয়ে বলল, 'এই ছেলেটা আমার পা ভেঙে দিয়েছে। ওর বিরুদ্ধে নালিশ আছে আমার।'

মুসা হতবাক। বলে কি লোকটা!

'এই ছেলেগুলোকে অ্যারেস্ট করা দরকার, বিশেষ করে এটাকে,' মুসাকে দেখাল গ্রেগরি। 'আমাকে জখম করার দায়ে।'

বিশ

প্রফেসরকে নিয়ে চলে গেল অ্যাম্বুলেন্স। তাঁর আর্মচেয়ারটায় এখন গ্রেগরি বসেছে। মচকানো পা'টা তুলে দিয়েছে একটা টেবিলে। চেয়ারে বসেছে দুজন পুলিশ অফিসার আর তিন গোয়েন্দা। তাদের মধ্যে অফিসার মরিস ডুবয়ও রয়েছে।

'ছেলেগুলোকে হাতকড়া লাগাচ্ছেন না কেন?' গ্রেগরি বলল। 'ওই ড্যানহ্যাম মেয়েমানুষটাকে সহ। সে-ও রয়েছে এর মধ্যে। ওদের শয়তানির পুরো গল্পটাই শোনাতে পারি। শুনবেন?'

'বিশ্বাস করবেন না!' রাগে চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'ওর মত মিথ্যুক, অকৃতজ্ঞ, নির্লজ্জ মানুষ জীবনে দেখিনি আমি।'

ভ্রূকুটি করল মরিসের সঙ্গী অফিসার, 'তোমার কথা পরে শুনব।' গ্রেগরির দিকে ফিরল সে, 'আসলে কি বলতে চান?'

'বলতে চাই, প্রফেসর ড্যানহ্যামের সহকারী হিসেবে কাজ করছে এই ছেলেগুলো।...আপনারা কি ডেভিল'স রিজে খননের খবর শুনেছেন?'

'শুনেছি,' অফিসার বলল। 'ক্যারাভানে ডাকাতির খবরও শুনেছি। প্রফেসর ড্যানহ্যাম এখন থানায়, পুলিশের তদন্তে সাহায্য করছেন; জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তাঁকে। মূর্তির ব্যাপারটা কি, খুলে বলুন তো?'

'ড্যানহ্যাম মেয়েমানুষটা আপনাদের বলেছে, মূর্তিটা চুরি হয়ে গেছে, তাই না? মিথ্যে কথা। ও ওটা লুকিয়ে ফেলেছে। একটা নকল মূর্তি কায়দা করে প্রফেসর ডেমিরনের হাতে তুলে দিয়েছে। ডেমিরনের মাথা খারাপ থাকায় চিনতে পারেনি। তাকে জিজ্ঞেস করলেই সব জানতে পারবেন।'

'কথা বলার মত অবস্থায় আসতে অনেক সময় লাগবে প্রফেসর ডেমিরনের,' অফিসার বলল।

'অ। গতকাল আমাকে এখানে দেখা করতে বলেছিল মিস ড্যানহ্যাম। মূর্তিটা

সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল প্রফেসরকে দেখাতে। দেখানোর পর বিক্রি করে দিতে চাপাচাপি করেছিল আমাকে। আমি মানা করে দিয়ে চলে গেলাম। তারপর শুনলাম, সে নাকি ডাকাতের কবলে পড়েছে। ডাকাত তাকে পিটিয়ে বেহুঁশ করে মূর্তি নিয়ে চলে গেছে। শুনে তো আমি থ। আজ বুড়ো পাগলটার সঙ্গে কথা বলতে ছুটে এলাম। বুড়ো বলল, মূর্তিটা সে-ই কেড়ে নিয়েছে। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম মূর্তিটা যাতে মিউজিয়ামকে দিয়ে দেয়। সে বলল, মূর্তিটা গুহায় লুকিয়ে ফেলেছে। বের করে আনতে গেলাম। পাওয়া গেল বটে, তবে সেটা নকল। তারমানে আসলটা এখনও ড্যানহ্যাম মেয়েমানুষটার কাছেই আছে। ওই মেয়েমানুষটা প্ররোচিত করেছে এদের,' বুড়ো আঙুল কাত করে তিন গোয়েন্দাকে দেখাল গ্রেগরি। 'আমি কি করি না করি দেখার জন্যে লেলিয়ে দিয়েছে পেছনে। আমার পিছে পিছে গুহায় ঢুকল এই তিন বদমাশ।...ভালভাবে আমি বোঝাতে গেলাম। চড়াও হলো আমার ওপর। মেরেধরে কি অবস্থা করেছে, দেখতেই তো পাচ্ছেন।'

আর সহ্য করতে পারল না মুসা। চিৎকার করে উঠল, 'মিথ্যে কথা! ও-ই আমাদের পিছু নিয়ে গুহায় ঢুকেছিল। তাড়া করেছিল সুড়ঙ্গের মধ্যে। মূর্তি কেড়ে নিতে গিয়ে ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে নিচে পড়েছে। পা মচকেছে...'

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল গ্রেগরি। পুলিশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ড্যানহ্যাম মেয়েমানুষটার চর ওরা, বুঝতে পারছেন না কেন! আপনারা এই বিচ্ছুগুলোর কথা বিশ্বাস করবেন, না আমার?'

'তার আগে আরেকটা প্রশ্ন করি আপনাকে, মিস্টার গ্রেগরি,' এতক্ষণে মুখ খুলল ডুবয়। 'গুহার ভেতরে আপনার পা মচকেছিল, এটা তো ঠিক, তাই না?'

'হ্যা,' মুসাকে দেখাল গ্রেগরি, 'এই ছেলেটা ভেঙেছে। সেজন্যেই তো ওকে অ্যারেস্ট করতে বলছি।'

গ্রেগরির কথা কানে তুলল না ডুবয়। 'কথা হলো, তারপর অনেকটা পথ আসতে হয়েছে আপনাকে। কি করে এলেন?'

সতর্ক হয়ে গেল গ্রেগরি। 'কি বলতে চান?'

'বলতে চাই, টেবিলে পা তুলে দিয়ে বসে আছেন, এতটাই ব্যথা। হেঁটে এলেন কি করে?'

'আ-আ-আমি...ওরা আমার পা ভেঙেছে, লজ্জায় পড়ে নিজেরাই...'

'থামলেন কেন, বলুন? ওরা বয়ে এনেছে, এই তো বলতে চাইছিলেন? সেটাই ওদের স্বভাব—মানুষকে সাহায্য করা। আপনি যত যা-ই বলুন না কেন, মিস্টার গ্রেগরি, আমরা জানি—পুলিশ জানে, ওরা খুব ভাল ছেলে।' রুক্ষ হয়ে উঠল ডুবয়ের কণ্ঠস্বর, 'আমার ধারণা, আপনি রকি বীচে নতুন, কিংবা চোরাই অ্যানটিক ছাড়া দুনিয়ার আর কোন খবর রাখেন না—নইলে তিন গোয়েন্দার নাম না শোনার কথা নয়। ওরা শখের গোয়েন্দা। পুলিশ ওদের সুনজরে দেখে।'

গ্রেগরির চোখে সাপের বিষাক্ত দৃষ্টি দেখতে পেল কিশোর। ডুবয়ের দিকে তাকাল, 'থ্যাংক ইউ, অফিসার। এখন আমি কিছু বলি?'

'বলো।'

'ক্যারাভানে চুরিটা অন্য কেউ করেনি, এই লোক করেছে,' গ্রেগরিকে দেখাল কিশোর। 'প্রফেসর ড্যানহ্যাম ওকে আসতে বলেননি, সে নিজেই এসেছিল, তাঁকে ফাঁসানোর জন্যে। চুরি করা জিনিসগুলো এনে রেখে দিয়েছিল প্রফেসর ড্যানহ্যামের গাড়িতে। আমরা তখন এদিকেই আসছিলাম। গাড়ি নিয়ে পালাতে দেখেছি ওকে। ফাঁসানোর জন্যেই যে ওগুলো রেখেছিল, আফসোস করে নিজেই সে-কথা বলেছে আজ প্রফেসর ডেমিরনকে। মুসা শুনেছে। কি, মুসা?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা, 'হ্যাঁ। গ্রেগরি বলেছে: প্রফেসর ড্যানহ্যামকে ফাঁসানোর জন্যেই এত কাণ্ড করেছি। আমি ওকে চোর বানাতে চেয়েছি। পুলিশকে বোঝাতে চেয়েছি ক্যারাভানের মাল সে নিজেই চুরি করেছে–বিক্রি করে ফান্ডের টাকা জোগাড়ের জন্যে। ক্যারাভানের মাল চুরির ব্যাপারে পুলিশ তাকে সন্দেহ করলে, মূর্তি চুরির দায়টাও চাপত তার ঘাড়ে। মাঝখান থেকে আমি খালাস। আমার দিকে নজরও দিত না পুলিশ।'

ভুরু কুঁচকে গ্রেগরির দিকে তাকাল ডুবয়, 'এ ব্যাপারে আপানার কি বক্তব্য, মিস্টার গ্রেগরি?'

সাপের মত ফুঁসে উঠল গ্রেগরি, 'আমার কথা তো বিশ্বাস করবেন না, বুঝতেই পারছি। আমার উকিলকে সামনে না রেখে আপনাদের আর কোন প্রশ্নের জবাব দেব না আমি।'

'হুঁ,' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল ডুবয়, 'আসল মূর্তিটা কি সত্যি প্রফেসর ড্যানহ্যামের কাছে আছে?'

'মনে হয় না। প্রফেসর ডেমিরন নিজের মুখে স্বীকার করেছেন, তাঁকে আঘাত করে মূর্তিটা কেড়ে নিয়েছেন তিনি। তা ছাড়া নকল মূর্তিটাও নিয়ে এসেছিলেন মিউজিয়াম থেকে, আমাদের সামনে।' কথাটা বলে আড়চোখে গ্রেগরির দিকে তাকাল কিশোর। তার নিচের চোয়াল ঝুলে পড়তে দেখে মুচকি হাসল। 'নকলটা সুড়ঙ্গে রেখে এসেছেন তিনি লোভী চোরগুলোকে ধোঁকা দেয়ার জন্যেই,' আড়চোখে আবার তাকাল গ্রেগরির দিকে। 'আসলটা, আমার ধারণা, এ বাড়িরই কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন। রাকারুয়া হিলে নিয়ে গিয়ে যেখান থেকে ওটা তুলে এনেছেন, সেখানেই পুঁতে ফেলার ইচ্ছে ছিল। সুযোগ পাননি।'

'বের করতে পারবে?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ডুবয়। 'চলো তাহলে।' সহকর্মীর দিকে তাকাল, 'এটাকে পাহারা দাও। আমরা আসছি।'

দুই সহকারী আর ডুবয়কে নিয়ে সোজা বাইরে চলে এল কিশোর। এসে দাঁড়াল নকারটার সামনে। হাত ঢুকিয়ে দিল ওটার হাঁ করা মুখে। সবার দিকে তাকিয়ে হেসে চোখ টিপল, 'আছে।'

শয়তানের মুখের ভেতর থেকে সোনার মূর্তিটা বের করে আনল সে। বাড়িয়ে দিল ডুবয়ের দিকে, 'নিন।'

'কি করে বুঝলে তুমি এটা এখানে আছে?' প্রশ্ন না করে আর পারল না রবিন।

'কাল যখন বাড়ি মেরেছিলাম, তীক্ষ্ণ ছিল আওয়াজটা; আজ বাড়ি মেরে শুনলাম

ভোঁতা। ঘণ্টার গায়ে কিছু লেগে থাকলে ঠিকমত বাজে না, ঝনঝনানিটা নষ্ট হয়ে যায়।'

'তারমানে সুড়ঙ্গে ঢোকার আগেই ব্যাপারটা লক্ষ করেছ তুমি। এত কষ্ট করে আর ঢুকলে কেন তাহলে?'

'শব্দটা যে অন্য রকম হচ্ছে, খেয়াল করেছিলাম বটে, কিন্তু গুরুত্ব দিইনি তখন। এত সব ঘটনা ঘটে গেছে এরপর. উত্তেজনায় ভাবার সময় পাইনি। তা ছাড়া তখন জানিও না, নকল মূর্তিটা গুহায় লুকিয়েছেন প্রফেসর। মূর্তিটা ভেঙে গেলে যখন জানলাম ওটা নকল, একটু চিন্তা করতেই বুঝে ফেললাম আসলটা কোথায় রেখেছেন প্রফেসর।'

তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে আবার ঘরে ফিরে এল ডুবয়। গ্রেগরিকে মূর্তিটা দেখিয়ে ভুরু নাচাল, 'এবার কি বলবেন? প্রফেসর ড্যানহ্যামের কাছে নাকি আছে?'

'উকিল ছাড়া কথা বলব না, বললামই তো!' দুই দুইবার এত কাছে থেকে মূর্তিটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে ক্ষোভে, দুঃখে চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে গ্রেগরির, মুখ দেখেই বোঝা গেল।

সহকর্মীর দিকে তাকাল ডুবয়। 'তাহলে আরকি, যাওয়া যাক, চলো।' গ্রেগরির দিকে ফিরল, 'থানায় চলুন। ডাক্তার, উকিল, দুটোই পাবেন।'

'থানায় যাব কেন? আপনারা কি আমাকে অ্যারেস্ট করছেন নাকি?'

কঠিন হলো ডুবয়ের চোয়াল। 'সে গেলেই বুঝবেন।' তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাল, 'এক গাড়িতে এত লোকের জায়গা হবে না। তোমরা সাইকেল নিয়ে এসো। শহরে ফিরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব থানায় দেখা কোরো।'

থানার ইন্টারভিউ রুমে ঢুকে দেখল তিন গোয়েন্দা, অফিসার ডুবয় বসে আছে তার ডেস্কে। নোট লিখছে। মুখ তুলে ওদের দেখে বলল, 'বসো।'

'ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার এসেছেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'না, তিনি তো এখনও আসেননি। জিজ্ঞাসাবাদ যা করার আমরাই করছি।'

'মিস্টার ড্যানহ্যামের কি খবর?'

নোটের দিকে তাকাল ডুবয়। 'প্রফেসর ড্যানহ্যামের গাড়িতে চোরাই মাল গ্রেগরি রেখেছে—এ কথা ঠিক হলে, ক্যারাভানে চুরির অভিযোগ থেকে তাঁকে রেহাই দেয়া যায়। কিন্তু মিউজিয়ামের মূর্তি চুরির অভিযোগ থেকে অত সহজে রেহাই পাবেন না।'

'তাঁকে অ্যারেস্ট করেছেন নাকি!'

'থানাতেই আছেন এখনও, কাগজ-পত্রে অ্যারেস্ট দেখানো হয়নি। তাঁর সহকারী ডোনাল্ড ইয়ানমারকেও সন্দেহ করছে পুলিশ।'

সামনে ঝুঁকল কিশোর। 'ডোনাল্ড এখন কোথায়?'

'বাসায় নেই। বাড়ির সামনে পাহারা দিচ্ছে পুলিশ। এলেই ধরবে। থানায় নিয়ে আসবে। প্রফেসর ড্যানহ্যাম অবশ্য তার পক্ষে সাফাই দিয়েছেন—বলেছেন, ডোনাল্ড এ সবে জড়িত নেই।'

নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'গ্রেগরি দোষ স্বীকার করেছে?'

'এত সহজে কি আর করে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ডোনাল্ডের জন্যে অপেক্ষা করছি আমরা। আমার বিশ্বাস, ও এলে কাহিনীর মোড় ঘুরবে।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল কিশোর, বাইরের করিডরে হই-চই শুনে থেমে গেল। সবাই ফিরে তাকাল খোলা দরজার দিকে। দুজন পুলিশ দুদিক থেকে পাহারা দিয়ে নিয়ে এল ডোনাল্ডকে।

ঢুকেই থমকে দাঁড়াল ডোনাল্ড। তাকিয়ে রইল কিশোরের দিকে। চিৎকার করে উঠল, 'কি বলেছ তুমি ওদের? মায়ার নামে কি বলেছ?'

'যা সত্যি তা-ই বলেছি,' জবাব দিল কিশোর। 'আমি পুলিশকে জানিয়েছি, ডেভিল'স রিজে মূর্তি পাওয়ার ঘটনাটা একটা জঘন্য জুয়াচুরি।'

'কিন্তু সেই জুয়াচুরিটা তো মায়া করেনি! ওর কোন দোষ নেই। সে কিছু জানেও না।' চিৎকার করে বলল ডোনাল্ড, 'ওটা আমি করেছি! সব দোষ আমার!'

একুশ

'ডন! চুপ করো! কিচ্ছু বোলো না ওদের!'

দরজার বাইরে করিডরে দেখা গেল মায়া ড্যানহ্যামকে। একজন পুলিশম্যানের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন।

'কিন্তু ওদের তো ধারণা তুমি চুরি করেছ,' ডোনাল্ড বলল। 'ওদের সত্যি কথাটা বলে দেয়া দরকার।'

পাশের ঘর থেকে এসে ঢুকল আরেকজন পুলিশ অফিসার। অফিসার নটিংটন। 'এত চেঁচামেচি কিসের?...অ, তুমিই ডোনাল্ড?'

'হ্যাঁ, আমাকে আনার জন্যেই আমার বাসার সামনে গাড়ি বসিয়ে রেখেছিলেন। আমি বলছি, মায়া চুরি করেনি।' ডোনাল্ড বলল, 'আপনাদের কি জানানো হয়েছে আমি জানি না, তবে মায়া এ সবে নেই। ও এ সবের কিছুই জানে না।'

'ডন!' চিৎকার করে উঠল ড্যানহ্যাম। 'দোহাই তোমার, কিছু বোলো না ওদের! একটা শব্দও না!'

ড্যানহ্যামের দিকে তাকিয়ে রইল ডোনাল্ড। 'কেন বলেছ ওদের আমি কিছু বুঝি না মনে করেছ?' নটিংটনের দিকে তাকাল সে। 'মায়া আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে, অফিসার। ওকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাদের সব বলছি।'

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে রইল নটিংটন। 'বোসো।' এগিয়ে গিয়ে একটা ডেস্কের সামনে বসল সে নিজেও। নোটবুক আর পেন্সিল বের করে রেডি হলো। 'বলো। সত্যি কথাগুলো জানা দরকার আমাদের।'

ঘরে ঢুকলেন প্রফেসর ড্যানহ্যাম। ডোনাল্ডের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। 'কেন করেছ এ কাজ? কেন অপেক্ষা করলে না? কবরটা খুললেই তো সব পেয়ে যেতাম আমরা।'

'আমার ভয় ছিল, কিছুই পাওয়া যাবে না,' ডোনাল্ড বলল। 'ঝুঁকি নেয়ার সাহস হচ্ছিল না। আমি জানতাম মূল্যবান কিছু পাওয়ার জন্যে কি রকম মরিয়া হয়ে

উঠেছিলে তুমি। তোমার জন্যে এ কাজ করেছি আমি। আমাদের দুজনের জন্যে যাতে একসঙ্গে ফ্রান্সে যেতে পারি।'

'ওহ্, ডন!' কপাল চাপড়ালেন প্রফেসর ড্যানহ্যাম। 'কোন প্রয়োজন ছিল না এ সবের। ফ্রান্সে যাওয়াটা এত জরুরী ছিল না যে নিজেদের তোলা মাল নিজেদেরই চুরি করতে হবে।'

তাকিয়ে রইল ডোনাল্ড। 'ক্যারাভানে চুরির কথা বলছ? মূর্তিটা আমিই মাটিতে পুঁতে রেখেছিলাম, কিন্তু ক্যারাভানের জিনিস তো আমি চুরি করিনি।'

ঝুলে পড়ল প্রফেসর ড্যানহ্যামের চোয়াল। 'আমি তো ভাবলাম তুমি করেছ। সে-জন্যে নিজের ঘাড়ে দোষটা নিয়ে নিয়েছিলাম। বলেছি চুরি করে নিয়ে গিয়ে আমার গাড়িতে আমিই রেখেছি ওগুলো।'

আঙুল তুলল ডুবয়, 'এক মিনিট। তারমানে ক্যারাভানে চুরি আপনারা করেননি? কে করেছে, তা-ও জানেন না?'

আস্তে মাথা নাড়লেন প্রফেসর ড্যানহ্যাম, 'ডোনাল্ড যদি না করে থাকে, আমিও করিনি।'

ডোনাল্ড বলল, 'আমি করিনি।'

নটিংটনের দিকে তাকাল ডুবয়, 'গ্রেগরিকে চেপে ধরতে হবে।' তিন গোয়েন্দাকে বলল, 'আপাতত তোমাদের কাজ শেষ। আবার প্রয়োজন পড়লে খবর দেব।'

পরদিন স্কুল ছুটির পর স্কুলের কাছের একটা বুদ থেকে থানায় ফোন করল কিশোর। ইয়ান ফ্লেচারকে পাওয়া গেল। গ্রেগরি কিছু স্বীকার করেছে কিনা, জানতে চাইল সে।

ক্যাপ্টেন বললেন, 'সময় থাকলে চলে এসো না। সামনা-সামনিই সব বলা যাবে।'

বুদ থেকে বেরোতেই জিজ্ঞেস করল রবিন, 'কি হলো?'

'ক্যাপ্টেন থানায় যেতে বলেছেন।'

'মুখ খুলেছে নাকি গ্রেগরি?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'মনে হয়

মুসা বলল, 'ওখানে নিশ্চয় অনেক সময় লাগবে। কিছু খেয়ে গেলে কেমন হয়? একআধটা বার্গার? না খেয়ে এতক্ষণ থাকা যাবে না।'

'ঠিক আছে, চলো। পথে কোন দোকান থেকে খেয়ে নেয়া যাবে

থানায় ঢুকল তিন গোয়েন্দা।

ডিউটি অফিসার ওদের দেখে হাসল 'তোমাদের অপেক্ষাই করছেন ক্যাপ্টেন।'

ইয়ান ফ্লেচারের অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। দরজায় টোকা দিল কিশোর।

'এসো,' সাড়া এল ভেতর থেকে

ভেতরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা।

উঠে হাত বাড়িয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। হেসে বললেন, 'ডেভিল'স রিজের ভূত তাড়িয়েই ছাড়লে।'

'কিশোর পাশা যখন পিছে লেগেছে,' রবিন বলল, 'ভূতের সাধ্য কি সেখানে থাকে?'

'তোমরাও কম নও।...বোসো।...মুসা, কি খাবে?'

'আপাতত কিছু লাগবে না, স্যার,' খেয়ে আসায় মনে মনে হতাশই হলো যেন মুসা। 'পেট ভরা। এইমাত্র তিনটে বার্গার সাবাড় করে এলাম।'

শব্দ করে হাসলেন ক্যাপ্টেন। 'তাই। ঠিক আছে, পেটে জায়গা তৈরি হলে জানিয়ো।'

চেয়ারে হেলান দিলেন ক্যাপ্টেন। 'মিস ড্যানহ্যাম, ডোনাল্ড, গ্রেগরি, সবাই স্বীকারোক্তি দিয়েছে। প্রথম দুজনের কথা তো নিজের কানেই অনেকখানি শুনে গেছ তোমরা। ওরা পরস্পরকে ভালবাসে, সেটাও নিশ্চয় বুঝেছ। কিশোর, ডোনাল্ড কিভাবে মূর্তিটা চুরি করে এনেছিল, অনুমান করতে পারো?'

'পারি,' কিশোর বলল। 'ডেভিল'স রিজে কাজ করতে করতে মূর্তি চুরির ভাবনাটা মাথায় আসে ডোনাল্ডের, কারণ একই সময়ে মিউজিয়ামে গিয়ে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে প্রফেসর ডেমিরনের পাওয়া জিনিসগুলো নিয়েও গবেষণা চালাচ্ছিল সে। ওঅর্কশপে বসেই মাটি দিয়ে আসল মূর্তিটার একটা নকল তৈরি করে। সোনালি রঙ লাগায়। এতই নিখুঁত হয়েছিল, খালি চোখে দেখে চট করে বোঝার উপায় ছিল না ওটা নকল। সে জানত, বেশ কিছুদিন ওটা ডিসপ্লেতে দেয়া হবে না। কাজেই বিশেষজ্ঞ কারও চোখে পড়ারও সম্ভাবনা ছিল না। সুযোগটা কাজে লাগায় সে। আসলটার জায়গায় নকলটা রেখে, আসলটা নিয়ে গিয়ে পুঁতে রাখে ডেভিল'স রিজে।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকালেন ইয়ান ফ্লেচার। 'তারপর?'

'তার পরিকল্পনার কথা কিছুই জানতেন না প্রফেসর ড্যানহ্যাম। মূর্তিটা পাওয়ার পরও সঙ্গে সঙ্গে কিছু বুঝতে পারেননি, কারণ মূর্তি পাওয়ার আনন্দ আর উত্তেজনায় ভাল করে দেখার মত অবস্থা ছিল না তাঁর। ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা করতে বসে নিশ্চয় এমন কোন চিহ্নটিহ্ন বা কিছু দেখেছেন মূর্তির গায়ে, যাতে তাঁর সন্দেহ হয়।

আবার মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন, 'হ্যাঁ, তোমার এই অনুমানও ঠিক। রাকারুয়া হিলে পাওয়া মূর্তিটা তিনি আগে দেখেছেন। ডেভিল'স রিজেরটার ওপর সন্দেহ হয়েছিল। তারপর?'

'সন্দেহ নিরসনের জন্যেই ছুটে গিয়েছিলেন প্রফেসর ডেমিরনের কাছে,' কিশোর বলল। 'কারণ একমাত্র ডেমিরনই নিশ্চিত বলতে পারবেন কোনটা তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। পাগল হলেও মূর্তিটা দেখেই বুঝে গিয়েছিলেন ডেমিরন, কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। প্রফেসর ড্যানহ্যাম তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর চুপচাপ তাঁকে অনুসরণ করলেন। মাথায় বাড়ি মেরে বেহুঁশ করে মূর্তিটা নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখলেন নকারে। তারপর আসল ঘটনাটা কি ঘটেছে জানার জন্যে মিউজিয়ামে গেলেন খোঁজ নিতে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন।

এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল কিশোর. 'যাই হোক, এদিকের ব্যাপার তো গেল। গ্রেগরির খবর কি? মিস ড্যানহ্যামের গাড়িতে জিনিস রাখার কথা স্বীকার করেছে?'

'করেছে। প্রফেসর ড্যানহ্যাম যখন মূর্তি দেখানোর জন্যে প্রফেসর ডেমিরনের বাড়িতে যান, পিছে পিছে গ্রেগরিও যায়। চোরাই মালগুলো সঙ্গেই ছিল তার। প্রফেসর ড্যানহ্যামকে বেহুঁশ পড়ে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি তাঁর গাড়িতে রেখে দিয়েই পালায়।...মূর্তিটা হাতানোই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ভজকট করে দেন প্রফেসর ডেমিরন।'

'যাকগে, শেষ পর্যন্ত তো আর কিছু করতে পারল না। হারই হলো তার।...প্রফেসর ডেমিরনের কি অবস্থা?'

'নার্ভাস ইগ্‌জশনে ভুগছেন তিনি,' ক্যাপ্টেন জানালেন। 'ডাক্তাররা আশা করছেন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবেন, তবে সময় লাগবে। মাথায় বাড়ি মারার জন্যে নালিশ করছেন না প্রফেসর ড্যানহ্যাম, কাজেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে প্রফেসর ডেমিরনকে আপাতত আমাদের দরকার নেই।'

'মূর্তিটা কই?'

'আমাদের কাছেই আছে। প্রমাণের জন্যে দরকার হবে। কাজ শেষ হলেই মিউজিয়ামকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।'

'তারমানে ভালয় ভালয় শেষ হচ্ছে সব,' রবিন বলল।

মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। 'তোমাদের জন্যেই হচ্ছে। মূর্তিটা নিয়ে গ্রেগরি পালিয়ে গেলে তাকে ধরা কঠিন হত।'

'ভাল কথা, ডোনাল্ডের খবর কি?' জানতে চাইল কিশোর।

'কিছু শাস্তি তাকে ভোগ করতেই হবে, কারণ জুয়াচুরি তো একটা করেছে—সেই সঙ্গে চুরি। তবে মূর্তিটা যেহেতু ফেরত পাওয়া গেছে, আর অকপটে সব কথা স্বীকার করেছে সে, বিচারক নিশ্চয় এ দিকটা দেখবেন।'

সব প্রশ্নের জবাব জানা হয়েছে। কারোরই আর কোন প্রশ্ন নেই। ঘড়ি দেখল কিশোর। উঠে দাঁড়াল : 'আজ তাহলে যাই, স্যার।'

দেখাদেখি মুসা আর রবিনও উঠল।

মুসার দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন, 'কি, পেটে জায়গা খালি হয়নি এখনও? আইসক্রীম আনাব?'

'আনাবেন?' দ্বিধায় পড়ে গেল মুসা। দুই বন্ধুর দিকে তাকাল। কোন সহযোগিতা পেল না ওদের কাছ থেকে। সিদ্ধান্তটা তার একলারই নিতে হলো। 'ঠিক আছে, আনান। এত করে বলছেন যখন, না খাওয়াটা অভদ্রতা হবে।' আস্তে করে বসে পড়ল আবার সে।

***
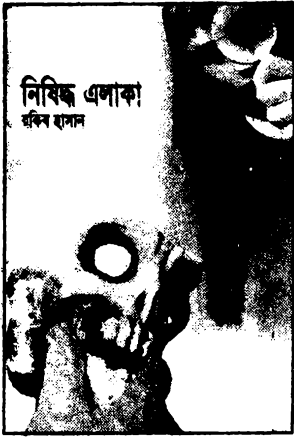
নিষিদ্ধ এলাকা

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

'আবার বাজাও,' মুসা বলল।

বাজাল রবিন।

সাড়া নেই এবারেও।

বাড়ির সামনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। বার বার বেল-পুশ টিপছে রবিন। বাড়ির ভেতরে ঘণ্টা বাজছে শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু কেউ দরজা খুলছে না।

আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে কিশোর বলল, 'গাড়ি তো একটা নিশ্চয় আছে তোমার ফুপুর, তাই না?'

'গাড়ি? আছে। কেন?' অবাক হলো রবিন

'গ্যারেজটার দিকে তাকাও, তাহলেই বুঝতে পারবে। কি রকম ভাঙা। গাড়ি রাখা সম্ভব না। ড্রাইভওয়েতেও গাড়ি নেই। তারমানে তিনি বাইরে।'

তাই তো! এতক্ষণ খেয়াল করেনি ব্যাপারটা। 'তাহলে কি করব?'

'তোমার ফুপুর বাড়ি, তুমি জানো, আমি আর কি বলব।'

'পেছন দিকে গিয়ে দেখা যেতে পারে। হয়তো ওদিকের দরজা খোলা।'

কিন্তু পেছনের দরজায়ও তালা দেয়া।

ভ্রূকুটি করল রবিন। 'আশ্চর্য! ফুপু জানে, আমরা আসব। বাড়িতেই তো থাকার কথা ছিল।'

'হয়তো রুটিটুটি আনতে গেছে,' মুসা বলল।

মাথা নেড়ে রবিন বলল, 'মনে হয় না। হঠাৎ করে কোন বাড়ির খোঁজ পেয়ে গেছে হয়তো, দেখতে গেছে।'

'তা হতে পারে,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'সেই সম্ভাবনাই বেশি।'

মিস এনিড মিলফোর্ড একজন এস্টেট এজেন্ট–জমি, বাড়িঘর বেচাকেনার কাজ করেন। আগে ইয়র্কের একটা বড় অফিসে চাকরি করতেন। এখন ফ্রেমলিতে এসে নিজেই ব্যবসা শুরু করেছেন।

'মাত্র দুজন এজেন্ট তো এখানে,' রবিন বলল, 'তাই ফোন পেয়ে আর দেরি করেনি ফুপু, প্রতিদ্বন্দ্বীর ভয়ে। আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে কাল গেলে ব্যবসাটা হাতছাড়া হয়ে যেতে পারত।'

'ওই যে, দোতলার একটা জানালা খোলা,' কিশোর বলল।

নিজের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে বারান্দার একটা চেয়ারে এলিয়ে পড়ল মুসা। 'তোমাদের যা ইচ্ছে করো। আমি আর কিছু মুখে না দিয়ে পারছি না।' ব্যাগ থেকে মার্স কোম্পানির চকলেট বের করে, রোদের দিকে মুখ তুলে দিয়ে কামড় বসাল। 'আহ্, ইংল্যান্ডের রোদ তো বেশ আরামের। চকলেটটাও মজা।'

জানালাটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর আর রবিন। পাল্লা সামান্য ফাঁক। চেষ্টা

করলে পৌঁছানো যাবে ওখানে।

জানালার নিচের খুদে ব্যালকনিতে প্রায় ঠেকে রয়েছে একটা গাছের ডাল। কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল রবিন, 'ভার রাখতে পারবে আমার?'

'চিকনই তো মনে হচ্ছে,' ভরসা করতে পারছে না কিশোর।

তবু একবার চেষ্টা করে দেখা যাক। ব্যাগ-সুটকেস নামিয়ে রেখে গিয়ে গাছ বেয়ে উঠতে শুরু করল সে। ঢুকে গেল ঘন পাতার আড়ালে। ওর ভারে কাত হয়ে গেল গাছ।

'সাবধান!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'ভেঙে ফেলো না। নিশ্চয় এটা আন্টির শখের গাছ।'

সাজানো বাগানের অন্যান্য গাছগুলোর দিকে তাকাল সে। বাগান করতে যে পছন্দ করেন এনিড আন্টি, দেখেই বোঝা যায়।

ব্যালকনিতে উঠে গেল রবিন। ওখানে দাঁড়িয়ে জানালা খুলে ভেতরে ঢুকতে সময় লাগল না। কয়েক মিনিটের মধ্যে নিচে নেমে এসে সামনের দরজা খুলে দিল। দিয়েই বলল, 'যত বড় মনে করেছিলাম, জায়গাটা তারচেয়ে বড়। আর দৃশ্য...বহুদূর পর্যন্ত চোখে পড়ে। কয়েক মাইল। দ্বীপটাও দেখলাম।'

দ্বীপের কথা শুনে কান খাড়া হয়ে গেল মুসার। 'তারমানে নৌকা নিয়ে চলে যাওয়া যাবে?'

'তা বোধহয় পারা যাবে না। ফুপু জানিয়েছে, ওটা নিষিদ্ধ এলাকা। কেন নিষিদ্ধ কে জানে। আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করলাম। আলোর মত কি যেন ঝিলিক দিচ্ছিল ওখানে।'

'হতে পারে কাঁচটাচে রোদ লেগেছিল,' কিশোর বলল। 'কিন্তু নিষিদ্ধই যদি হবে, অন্য লোক গেল কিভাবে?...থাক, এটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে। কোনখানে থাকব আমরা, দেখাও দেখি।'

বাড়িটা রবিনের জন্যে নতুন নয়, আগেও এসেছে। তবে মুসা আর কিশোরকে নিয়ে এই প্রথম ইংল্যান্ডের ফ্রেমলিতে এসেছে বেড়াতে।

দুই ধাপ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল ওরা। তিনটে ঘর দেখাল রবিন। এক সময় সার্ভেন্টস কোয়ার্টার ছিল। দোতলায় রবিনের ফুপুর বিশাল বেডরুমটার তুলনায় অতিরিক্ত খুদে মনে হলো এগুলোকে। ঢালু ছাত। জানালার ওপরের দিকটা লেগে গেছে প্রায়। ছোট হলেও ফিটিংস আর আসবাবপত্র যা যা দরকার সবই আছে, আর বেশ সাজানো-গোছানো। দেয়ালের চমৎকার রঙ। প্রতিটি ঘরেই একটা করে ওয়াশবেসিন আছে। বাথরুম আছে, শাওয়ার আছে, এমনকি খুদে সিটিং-রুম, টেলিভিশন সেট আর গান শোনার জন্যে স্টেরিও সেটও আছে।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'খুব সুন্দর তো!'

খোয়া বিছানো রাস্তায় টায়ারের শব্দ হলো। দড়াম করে বন্ধ হলো গাড়ির দরজা।

'ওই যে, এসে গেছে ফুপু,' রবিন বলল। 'চলো, দেখি।'

দৌড়ে নিচতলায় নেমে এল ওরা এনিড আন্টি তখন দরজা খুলে ঘরে ঢুকছেন ছেলেদের দেখে বললেন, 'সরি, বয়েজ, দেরি হয়ে গেল। অনেক আগেই

আমার চলে আসার কথা ছিল। আটকে গেলাম।'

'তোমাকে না পেয়ে,' রবিন বলল, 'শেষে তোমার বেডরুমের জানালা দিয়ে ঢুকেছি।'

'তাই নাকি! খুব কষ্ট হয়েছে তোদের বুঝতে পারছি,' গলাটা কেমন শুকনো মনে হলোএনিড আন্টির। রবিন লক্ষ করল, তাঁর হাত কাঁপছে। মুখ লাল। ঝগড়া করে এলেন নাকি কারও সঙ্গে? আশ্চর্য! ফুপুকে কখনও রাগতে দেখেনি সে

'ফুপু,' পরিচয় করিয়ে দিল রবিন। 'ও কিশোর...আর ও মুসা...'

'বলা লাগবে না, দেখেই বুঝেছি কে কোন জন,' অধৈর্য ভঙ্গিতে বললেন এনিড আন্টি। 'এখন আমার কথা বলতে ভাল লাগছে না। কাপড় ছেড়ে গোসল করে আগে মানুষ হয়ে নিই।...ফ্রিজে খাবার আছে। ইচ্ছে মত খেয়ে নে। আমি আসছি।'

দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলেন তিনি। পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা।

রবিনের মুখ লাল। বিব্রত।

তাকে সহজ করার জন্যে কিশোর বলল, কিছু একটা হয়েছে আন্টির...চলো, খেয়ে নিই।'

আন্টি যখন ওপর থেকে নামলেন আবার, স্যান্ডউইচ হাতে টিভির সামনে বসে গেছে তিন গোয়েন্দা।

'বাহ্, জমিয়ে ফেলেছ,' খানিক আগের কর্কশ ভঙ্গিটা নেই আর এখন তাঁর মধ্যে। কিশোরের দিকে তাকালেন। 'তোমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছি, তাই না? কিছু মনে কোরো না। ওই এস্টেট এজেন্টটার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছি তো।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সহজ হয়ে গেল পরিস্থিতি।

এনিড আন্টি জিজ্ঞেস করলেন, 'রবিন তোদের গোয়েন্দাগিরির খবর কি? লেটেস্ট কেসটার কথা বল।'

গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনতে লাগলেন তিনি। ছেলেদের খাওয়া শেষ হলে বললেন, 'এত দূর থেকে এসেছিস, কাহিল লাগছে না? যা, একটু গড়িয়ে নে-গে তারপর আবার শুনব। আমি ইতিমধ্যে রান্নাটা সেরে ফেলি।'

সন্ধ্যার পর খাওয়া শেষ করে, এঁটো বাসন-পেয়ালাগুলো রান্নাঘরে রেখে আসতে লাগল ওরা, এই সময় জানালার কাঁচে পড়ল গাড়ির হেডলাইটের আলো কয়েক সেকেন্ড পরই যেন উত্তেজিত হয়ে বাজতে শুরু করল দরজার ঘণ্টা।

ডিশ ওয়াশারে বাসন ঢোকাতে ঢোকাতে থেমে গেলেন এনিড আন্টি। দরজা খুলতে রওনা হলেন। কিন্তু তর সইছে না বেল-বাদকের আবার বাজাল।

একটা ভুরু ওপরে উঠে গেল কিশোরের 'তাড়া খুব বেশি মনে হচ্ছে লোকটার!...এসো, আমাদের কাজ আমরা শেষ করে ফেলি '

টেবিল পরিষ্কারের কাজ চালিয়ে গেল ওরা হলওয়েতে চড়া গলায় কথা শোনা

গেল। শেষ কয়টা বাসন নিয়ে গিয়ে ডিশ ওয়াশারে রেখে এল কিশোর। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল লিভিং-রুমের দরজা লম্বা একজন লোক ঘরে ঢুকল। শরীর-স্বাস্থ্য ভাল। বয়েস পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ।

পেছন পেছন এলেন আন্টি। কিশোরের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল লোকটা। আন্টিকে বলল, 'আরেকটা কথা, হ্যারল্ডদের ফার্মটা বিক্রির দায়িত্ব আমাদের দেয়া হয়েছে। আপনি এতে নাক গলাচ্ছেন কেন?'

'দেখুন, মিস্টার ফক্স,' শীতল কণ্ঠে জবাব দিলেন আন্টি, 'নাক গলানো আমিও পছন্দ করি না। ছয় মাস ধরে তো দিয়ে রাখা হয়েছে আপনাদের ফার্মের কাছে, কিছুই তো করতে পারেননি। আজ বিকেলে মিসেস হ্যারল্ড আমাকে ফোন করে জানতে চেয়েছেন আমি কোন সাহায্য করতে পারব কিনা। আপনাদের কি ইচ্ছে সারা জীবন ধরে ওটা বিক্রির আশা নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকুক মিসেস হ্যারল্ড?'

'দেখুন, আপনি এখানে নতুন এসেছেন,' শাসানির ভঙ্গিতে বলল ফক্স, 'ফ্রেমলিতে মাত্র ছয় মাস। আর হয়ার অ্যান্ড ফক্স কোম্পানির বয়েস জানেন কত? ষাট বছর।'

বাঁকা চোখে তাকালেন এনিড আন্টি। 'আপনার কি ষাট হয়েছে, মিস্টার ফক্স?'

মুখ লাল হয়ে গেল ফক্সের। কিশোরের মনে হলো, এখুনি ফেটে পড়বে। একটা অঘটনের ভয় করতে লাগল সে। এঁটো প্লেট হাতে নিয়ে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াল। ফিসফিস করে দুই সহকারী–বিশেষ করে রবিনকে বলল, 'তৈরি থাকো!'

হাসল রবিন। 'আমার ফুপুকে তুমি চেনো না। ভয় নেই। কিচ্ছু করতে পারবে না মিস্টার ফক্স।'

ডিশ ওয়াশারে বাসন-পেয়ালাগুলো সব ভরে রেখে, রান্নাঘর পরিষ্কার করতে শুরু করল ওরা। ওদের কাজও শেষ হলো, লোকটাও চলে গেল।

'গেছে,' দরজায় উঁকি দিয়ে বললেন আন্টি। 'তোরাও দেখি সেরে ফেলেছিস। খুব ভাল। নিশ্চিন্তে এখন কফি খাওয়া যাবে।'

কফির ট্রে এনে টেবিলে রাখল কিশোর। 'এত রাগারাগির কারণ কি, আন্টি?'

'কারণ আর কি হবে? নিজেকে সাংঘাতিক ভাবাটাও তো একটা বড় কারণ,' আন্টি বললেন। 'আমারটা বাদে ফ্রেমলিতে আর একটা মাত্র এস্টেট এজেন্সি আছে, হয়ার অ্যান্ড ফক্স। ওটার জুনিয়ার পার্টনার এই ক্রেগলি ফক্স। বুড়ো মিস্টার হয়ার লোক খারাপ না, তাঁর সঙ্গে আমার বনিবনতা ভালই। কিন্তু তিনি কাজ-কর্ম আর কিছু দেখেন না এখন। হপ্তায় দুদিন আসেন অফিসে। যত মাতব্বরি এখন ফক্সের ভাবভঙ্গিতে মনে হয় শুধু অফিসটা না, পুরো এলাকারই মালিক সে।' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন আন্টি। 'লোকটা সন্দেহ জাগিয়ে দিয়েছে আমার। কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল আছে।'

'কি সন্দেহ?' কৌতূহলী হয়ে উঠেছে কিশোর।

দ্বিধা করছেন আন্টি। 'ঠিক বোঝাতে পারব না! আজ বিকেলে মিসেস হ্যারল্ডের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে মনে হলো সব স্বাভাবিক নয়।' আবার দ্বিধা করতে

লাগলেন তিনি।

'অস্বাভাবিক কি দেখলেন?' জ্বলজ্বল করছে কিশোরের চোখের তারা।

'মিসেস হ্যারল্ড বিধবা মানুষ ফ্রেম বাইটে একটা ফার্ম আছে তাঁর।'

'তাতে কি?'

'জায়গাটা সাগরের একেবারে কিনারে। খুব নির্জন। কাছাকাছি শুধু আছে বাইট কুনার নামে একটা খামার। ওখান থেকে দ্বীপটা বেশি দূরে না। মিসেস হ্যারল্ড বলেছেন আমাকে, সন্দেহজনক লোকেরা নাকি ওখানে ঘোরাঘুরি করে। রাতে আলোর ঝিলিকও দেখেছেন। তাঁর ফার্ম আর জেটির মাঝের রাস্তাটায় টায়ারের শব্দ শুনেছেন।' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে আন্টি বললেন, 'কথাটা কতখানি সত্যি আর কতখানি তাঁর কল্পনা, বুঝতে পারছি না তাঁর বয়েস হয়েছে। এ বয়েসে উল্টোপাল্টা দেখাটা অস্বাভাবিক নয়।'

'উল্টোপাল্টা দেখেননি,' রবিন বলল, 'আলো আমিও দেখেছি, এই তো আজ বিকেলেই দ্বীপ থেকে আসছিল। তোমার বেডরুমের জানালা দিয়ে যখন ঘরে ঢুকছিলাম।'

অবাক হলেন এনিড আন্টি। 'অসম্ভব। ওই দ্বীপে কাউকে যেতে দেয়া হয় না। ওটা নিষিদ্ধ এলাকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ওখানে জীবাণু নিয়ে গবেষণা হত, জীবাণু-যুদ্ধের জন্যে জীবাণুটার নাম সম্ভবত অ্যানথ্রাক্স। মারাত্মক জীবাণু। যে কারণে এখনও জায়গাটা বিপজ্জনক। তুই ভুল করে অন্য কিছু দেখেছিস। মাছধরা বোটের জানালায় রোদ লেগেছিল হয়তো।'

বাকি কথাগুলো শোনার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে কিশোর। 'আলোর কথা থাক।...আন্টি, তারপর? যা বলছিলেন।'

'মিসেস হ্যারল্ডকে বললাম, হয়ার অ্যান্ড ফক্সকে ফোন করে জানিয়ে দিতে, সম্পত্তি বিক্রির দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলেন তিনি। ক্রেগলি ফক্স তখন আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইল। বাড়িতে আসার জন্যে চাপাচাপি শুরু করল কি আর করব আসতে বললাম। এসে তো কি করল নিজের চোখেই দেখলে। যাই হোক, মিসেস হ্যারল্ডের সন্দেহ, তাঁর বাড়ি বিক্রিতে বাদ সাধছে বাইট কুনারের নতুন মালিক—শার্ক আর ব্যারাকুডা ওশন। ওরা দুই ভাই...'

'বাহ্, নাম তো রেখেছে দারুণ!' না বলে আর পারল না মুসা। 'শার্ক আর ব্যারাকুডা, সাগরের দুই হিংস্র প্রাণী। সাগরে বাস বোঝানোর জন্যেই বুঝি নামের শেষে ওশন যোগ করে দিয়েছে...'

'ওশনটা তো পদবী,' রবিন বলল।

'সেটাই তো বলছি। পদবীর সঙ্গে মিলিয়েই নাম রেখেছে আরও কত প্রাণীই তো আছে সাগরে, নীরিহ প্রাণী, সেগুলোর নাম রাখলেও পারত। তারমানে দুই ভাই লোক ভাল না...'

'নাম খারাপ হলেই সব ক্ষেত্রে খারাপ হয় না মানুষ,' আন্টি বললেন। 'ভাবছি, দু'একদিনের মধ্যেই দেখা করতে যাব ওদের সঙ্গেও। মিসেস হ্যারল্ডের পড়শী যেহেতু...'

'আমাদের নেবেন?' কিশোর বলল।

'নিতে আপত্তি নেই, তবে আমি যাব ব্যবসার কথা বলতে। এ সময় তোমাদের সামনে থাকা উচিত হবে না। তার চেয়ে নিজেরাই যাও, ফার্ম দেখতে ইচ্ছে করলে দেখে এসো বেড়াতে এসেছ, যত খুশি ঘোরো।'

রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে তিনতলার খুদে সিটিং-রুমে আলোচনায় বসল তিন গোয়েন্দা। ডায়মন্ড-শেপ জানালার কাঁচের ভেতর দিয়ে এসে কার্পেটে খোপ খোপ ছায়া সৃষ্টি করেছে চাঁদের আলো। বাতি নিভিয়ে দিয়েছে ওরা। গ্যাসের আগুনের আভায় চেহারা দেখতে পাচ্ছে নিজেদের।

'আমার প্রশ্ন,' কিশোর বলল, 'ওই ক্রেগলি ফক্স লোকটা জমি বেচতে এনিড আন্টিকে বাধা দিচ্ছে কেন? নিজে সময় পেয়েছে ছয় মাস, তখন বেচল না কেন?'

হর্স অ্যান্ড হাউন্ড নামে একটা পত্রিকার পাতা থেকে মুখ তুলল মুসা, বইয়ের তাকে খুঁজে পেয়েছে ওটা। ঘোড়া নিয়ে একটা চমৎকার লেখা লিখেছে পত্রিকাটায়। হেসে বলল, 'হয়তো নারী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয়। ভেবেছে মহিলাদের ঘরে থেকে ঘরের কাজ করাই মানায় ভাল, বাইরে বেরিয়ে পুরুষের কাজে টক্কর দেয়া উচিত নয়।'

'তা বলেছ ভাল,' হেসে বলল রবিন।

'কাল একবার দেখতে যেতে চাই,' কাজের কথায় এল কিশোর। 'রবিন, জায়গাটা এখান থেকে কত দূর?'

'ঠিক বলতে পারব না একবার তো মাত্র এসেছিলাম, বাবার সঙ্গে, বেশিদিন থাকিওনি। ঘুরতে পারিনি তেমন।'

'হুঁ, এতক্ষণে বুঝলাম,' মাথা দোলাল কিশোর, 'দ্বীপটার কথা, জীবাণু গবেষণার কথা আমাদের জানাওনি কেন। অবাকই লাগছিল আমার। জানই না তো জানাবে কি। যাই হোক, রহস্যময় আলোর ঝিলিকটা...'

'এতে আবার রহস্য দেখলে কোথায়?' মুসা বলল, 'অতি স্বাভাবিক কোন ব্যাখ্যা আছে এর ' হাই তুলতে লাগল সে। 'যাকগে, তোমরা গল্প করলে করো। আমার ঘুম পাচ্ছে আমি গেলাম।' ম্যাগাজিনটা বগলদাবা করে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে

'মাঝে মাঝে জন্তু-জানোয়ার নিয়ে ওর এই মাতামাতিটা বড় বেড়ে যায়,' রবিন মন্তব্য করল

'মাতামাতি দেখলে কোথায়? ঘোড়া পোষে, সে-জন্যেই ঘোড়া সম্পর্কে কোন লেখা দেখলে...'

কথা শেষ করতে পারল না কিশোর। চিৎকার শোনা গেল মুসার, 'কিশোর! রবিন! দেখে যাও, জলদি!'

লাফ দিয়ে উঠে দৌড় দিল দুই গোয়েন্দা দেখে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মুসা মেঘমুক্ত গম্বুজের আকৃতির আকাশের নিচে যেন ঝুলে রয়েছে উজ্জ্বল চাঁদটা দিগন্তে কালো ছায়ার মত লাগছে দ্বীপটাকে আলোর রশ্মি ঝিলিক দিয়ে চলেছে

ওখান থেকে: সাদা। সবুজ। সাদা। লাল।

মূল ভূখণ্ড থেকে তার জবাব গেল আলোর রশ্মি দিয়েই–তিন বার সবুজ, একবার সাদা। সাদা আলোটা জ্বলে থাকল সবুজের চেয়ে বেশি সময় ধরে।

দুই

পরদিন সকালে নিচে নেমে দেখল তিন গোয়েন্দা এনিড আন্টি বেরিয়ে গেছেন

'রাতে অনেক ভেবেছি,' কিশোর বলল। 'ওই আলোর সঙ্কেত মোর্স কোড নয়। গাইড বুক দেখলেই মোর্স কোড সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়–দেখে নিয়েছি। তাতে আলোর প্রয়োজন পড়ে না, ড্যাশ আর ডটের মধ্যে বিরতিও এতটা সময় ধরে দিতে হয় না। তবে মেসেজ যে দিয়েছে ওরা, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'কাল বিকেলবেলা আমি যেটা দেখেছিলাম,' রবিন বলল, 'সেটা কিন্তু এমন ছিল না। বেশিক্ষণ দেখা যায়নি তো, রঙ বলতে পারব না। বেশ উজ্জ্বল ঝিলিক। তবে বোটের জানালার যে নয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার।'

নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন দু'বার চিমটি কাটল কিশোর। 'আরেকটা প্রশ্ন আছে আমার। এসেই আমরা আলোর সঙ্কেত দেখে ফেললাম–দুই দুইবার, কিন্তু এখানকার আর কেউ দেখল না কেন?'

'আমরা হলাম গিয়ে গোয়েন্দা, দেখবই তো,' টোস্টারে আরেক টুকরো রুটি ভরে দিল মুসা। 'তা ছাড়া আর কেউ দেখেনি কে বলল তোমাকে? ভুলে গেছ, মিসেস হ্যারল্ডের কথা?'

'না, ভুলিনি,' আনমনে মাথা নাড়ল কিশোর। 'আমি ভাবছি, অন্য আর কারও চোখে পড়ল না কেন? জীবাণুর দ্বীপে আলোর সঙ্কেত, নিশ্চয় লোকে ওটার অন্য অর্থ করত। গুজব ছড়াত। জমি বেচাকেনার কাজ করেন এনিড আন্টি, লোকের সঙ্গে প্রচুর কথা বলতে হয়, নানা রকম মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়। গুজবটা তাঁর কানে আসতই। আর এলে মিসেস হ্যারল্ড যে আলো দেখেছেন–এ কথা বলার সময় গুজবের কথাও কাল আমাদের বলতেন।'

'এমন হতে পারে,' মুসা বলল, 'শহর থেকে দেখাই যায় না আলোটা পাহাড়ের জন্যে সাগরের দিকটা চোখে পড়ার কথা নয় শহরের লোকের। তা ছাড়া অনেক ওপরে, তিনতলা থেকে দেখেছি আমরা।'

'কিন্তু দোতলার জানালা থেকেও দেখেছি আমি,' রবিন বলল।

'তাহলে, প্রশ্ন জাগে,' কিশোর বলল, 'এনিড আন্টির চোখে পড়ল না কেন? তাঁর বেডরুম থেকেই তো তুমি দেখেছ।'

জানার একটাই উপায়–দোতলার যে জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল রবিন, আবার সেটার সামনে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করে দেখা। কিন্তু ঠেকায় পড়ে একজন মহিলার বেডরুমের জানালা দিয়ে ঘরে ঢোকা, আর তাঁর বিনা অনুমতিতে ইচ্ছে করে ঢোকাটা এক কথা নয়। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল তিনজনে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। তবে কৌতূহল দমাতে পারল না কোনমতে

দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিল কিশোর। ঘরটার মেজাজও এনিড আন্টির মতই ঠাণ্ডা আর আভিজাত্যে ভরা। দেয়াল, আসবাব, জিনিসপত্র বেশির ভাগই সাদা কিংবা ধূসর; গদির কাপড় আর ল্যাম্পের শেড গাঢ় নীল। একপাশের দেয়াল ঘেঁষে দেয়াল-সমান একটা ওঅরড্রোব। আরেক পাশের দেয়াল ঘেঁষে রাখা একটা ডাবল-বেড খাট। এক কোণে আড়াআড়ি করে রাখা হয়েছে বিরাট এক ড্রেসিং টেবিল, কাছে একসারি জানালা, যেগুলো খোলে খুদে ব্যালকনিটার দিকে।

আরেকবার দ্বিধা করে মন থেকে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দিল কিশোর। কাজটা সারতেই হবে। রবিনকে জিজ্ঞেস করল, 'আলোটা যখন জ্বলল, ঠিক কোনখানে ছিলে তুমি দেখাও তো।'

ঘর পেরিয়ে এগিয়ে গেল রবিন। 'এই জানালাটা খোলা ছিল।' ড্রেসিং টেবিলের আয়নার পেছনে একটা জানালা দেখাল সে। 'এটা দিয়ে ঢুকছিলাম।'

'তারমানে ড্রেসিং টেবিলের পেছনে ছিলে তুমি, আলোটা যখন জ্বলল?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

ড্রেসিং টেবিলের পেছনের সরু ফাঁক দিয়ে ত্রিকোণ ছোট্ট জায়গাটায় ঢুকল কিশোর। জানালা দিয়ে দূরে তাকাল।

মিনিটখানেকের মধ্যেই বুঝে ফেলল সে, বেডরুম থেকে কেন আলোটা দেখতে পাননি আন্টি।

'সাধারণত ড্রেসিং-টেবিলের পেছনে দাঁড়াতে যায় না কেউ,' যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর। 'সামনে দাঁড়ায়, কিংবা বসে, আয়নার দিকে তাকানোর জন্যে। কাছাকাছি জানালা থাকলে জানালা দিয়ে অবশ্যই বাইরে চোখ পড়ে। কিন্তু এই আয়নার পেছন থেকে দ্বীপের যে অংশটা চোখে পড়ে, সামনে দাঁড়ালে সেটা পড়ে না। ঘরের অন্য কোন জানালা দিয়েই পড়ে না।'

'তিন তলায় হলে কি দেখা যেত?' মুসার প্রশ্ন।

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'তা-ও যেত না। সামনে বাধা থাকলে কি করে দেখা যাবে?'

'তারমানে উচ্চতাটা কোন ব্যাপার নয়?'

'ব্যাপার তো অবশ্যই। উঁচু জায়গায় না হলে যেখানেই দাঁড়াবে তুমি, দ্বীপ চোখে পড়বে না।'

'বুঝলাম,' রবিন বলল। 'এখানে তো দেখা হলো। চলো এবার তিনতলায়, দিনের বেলাতে দেখি কতখানি চোখে পড়ে।'

মুসার ঘরে এসে ঢুকল ওরা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। গাছপালায় ঘেরা একটা বড় বাড়ি চোখে পড়ল। চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উড়ছে। তার ওপাশে একটা কটেজ আর ওটাকে ঘিরে কতগুলো ছোট-বড় টিনের চালা, ছাউনি আর বিল্ডিং। সাগর বেশি দূরে না।

'ওই জায়গাটাই নিশ্চয় ফ্রেম বাইট,' কিশোর বলল 'বড় বাড়িটা বাইট কুনার, আর তার পরের কটেজওয়ালা বাড়িটা হ্যারল্ডদের ফার্ম। আলো দেখা গেছে ফার্মের শেষ মাথা কিংবা আরও দূর থেকে। রাতের বেলা দেখলাম তো, ঠিক কত দূরে ছিল

আন্দাজ করা মুশকিল।...চলো, ঘুরে আসি জায়গাটা থেকে।'

'আমি তো ভেবেছিলাম,' মুসা বলল, 'সী-বীচে যাব আজ। বাইটে কাল গেলে হয় না?'

'না, আজই যাব,' কিশোর বলল। সব কিছুর আগে রহস্যের সমাধান করা দরকার। নইলে স্বস্তি নেই তার। 'তা ছাড়া সী-বীচেই তো যাচ্ছি আমরা। এদিক আর ওদিক।'

চুপ হয়ে গেল মুসা।

পনিরের স্যান্ডউইচ বানিয়ে, আর ফ্রিজ থেকে কোকের বোতল বের করে একটা ঝুড়িতে ভরে নিল ওরা। বাইটে দোকান-পাট পাওয়া না গেলে, আর কোন কারণে দেরি হলে বাইরে বসেই খেয়ে নিতে পারবে। বাড়ি ফেরার তাগাদা থাকবে না।

টাম্বল অ্যাভেনিউর একেবারে চূড়ায় এনিড আন্টির বাড়ি। এঁকেবেঁকে নেমে যাওয়া ঢালু রাস্তার দুই ধারে গাছের সারি। এককে অংশে বাড়ি আছে দশটা করে। কোন কোনটা র‍্যাঞ্চ-স্টাইলে বানানো একতলা বাড়ি, চারপাশ ঘিরে আঙিনা, সুইমিং পুলও আছে। কোনটা দুই কিংবা তিনতলা, কিন্তু ভিন্ন দিকে মুখ করা; সাগরের দিকে মুখ করা তিনতলা বাড়ি একটাই আছে এখানে—এনিড আন্টিরটা। এবং সবগুলো বাড়িই আন্টির বাড়ির চেয়ে নিচে।

অন্য কোন বাড়ি থেকে আলো দেখতে না পাওয়ার এটাই কারণ—ভাবল কিশোর।

'চলো,' বলে হাঁটতে শুরু করল কিশোর। রাস্তা চেনে না। ফ্রেমলি হয়ে ঘুরে বাইটে যেতে হবে নাকি সরাসরিই যাওয়া যাবে, জানে না। তার উদ্দেশ্য, হাঁটলে কোথাও না কোথাও তো পৌঁছাবেই। দরকার হয় রাস্তায় কাউকে জিজ্ঞেস করে নেবে। সমস্যাটা হলো, এদিকটা এতই নির্জন, ওরা বাদে চতুর্থ কোন লোক চোখে পড়ল না।

হাঁটতে হাঁটতে এসপ্ল্যানেডে পৌঁছে মনে হলো অনন্তকাল ধরে নামতে থাকলেও এই নামার যেন আর শেষ হবে না।

'বাপরে,' মুসা বলল, 'এমন রাস্তা তো জীবনে দেখিনি। নামলাম তো ভালই, ফিরে যাওয়ার সময় উঠতে বোঝা যাবে ঠ্যালা কাকে বলে। আবার বৃষ্টিও নামবে মনে হচ্ছে।'

'বৃষ্টি?' আকাশের দিকে তাকাল কিশোর, 'না, মনে হয় না। এখানে আকাশের রঙই যেন কেমন।'

উপকূলের এক প্রান্তে পৌঁছে ঘুরে আবার রাস্তাটা ঢুকে গেছে মূল ভূখণ্ডে। কমোন নামে একটা জায়গায় পৌঁছার পর দেখা দিল ঘন কুয়াশা। সাগরের দিক থেকে উঠে এল কুয়াশার চাদর, সঙ্গে নিয়ে এল বৃষ্টির ছাট। এসপ্ল্যানেডের পর দু'চারজন মানুষ যা-ও বা ছিল, এখন আর কাউকেই চোখে পড়ল না।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'কি, বলেছিলাম না বৃষ্টি আসবে? কেমন ভুতুড়ে জায়গারে বাবা! আগা নেই মাথা নেই, ঝট করে কুয়াশা...এ তো জঘন্য!' রবিনের

দিকে তাকাল, 'সব সময়ই এ রকম হয় নাকি?'

'কি করে বলব? মাত্র তো একবার এসেছি,' রবিনের মনে হতে লাগল, না এলেই ভাল করত। 'তখন এ রকম দেখিনি।'

কুয়াশার মধ্যে পথ হারাল ওরা। রাস্তা থেকে নেমেই ভুলটা করেছে। এখন পেছনে আছে ওটা, না সামনে, তা-ও বলতে পারবে না। ঘাসে ঢাকা মুরল্যান্ডের মধ্যে দিয়ে চলেছে। খাটো, শক্ত ঘাসের মাথা খচমচ করছে পায়ের চাপে। কোথাও কোন রঙ নেই যেন এখন। ঝোপঝাড়, ঘাস, আকাশ, সব কিছুর একটাই রঙ–সীসার মত ধূসর। কুয়াশার ফাঁকে মাঝে মাঝে যে সূর্যটা উঁকি দিচ্ছে, সেটাকেও লাগছে ধূসর থালার মত। কেবল অনেক বেশি উজ্জ্বল, এই যা তফাৎ।

ঘাস মাড়ানোর শব্দ আর দূর থেকে আসা সাগরের ফোঁসফোঁসানি ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই গা ছমছম করতে লাগল মুসার।

'আগাথা ক্রিস্টির গল্প নিয়ে বানানো একটা ছবি দেখেছিলাম,' বলল সে, 'নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না এখন। তাতে এ রকম কুয়াশার মধ্যেই খুন হয়েছিল একটা মেয়ে, পাহাড়ের চূড়া থেকে পড়ে গিয়ে। রহস্য যখন ফাঁস হলো, জানা গেল একটা পলিসি করিয়েছিল মেয়েটা। বীমার টাকার জন্যে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল তার প্রেমিক।'

'তাতে তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই,' কিশোর বলল। 'এখানে পাহাড়ের চূড়াও নেই, আর বীমাও করাওনি তুমি। সে-রকম কুয়াশাই কেবল আছে।...ইস্, ভিজে গেলাম।'

'আমি কি আর শুকনো আছি নাকি?' মুসা বলল। 'এমন জানলে অ্যানোরাক ছাড়া কে বেরোত ঘর থেকে।'

এগিয়ে চলল ওরা। ক্রমেই ঘন হচ্ছে কুয়াশা। বাতাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওদেরকে ঘিরেই পাক খেয়ে ঘুরছে যেন। সামনে কয়েক হাতের বেশি চোখে পড়ছে না এখন।

'এক জায়গায় ঘুরছি না তো আমরা!' কিশোরের গলায় শঙ্কা।

হঠাৎ এক চিৎকার দিয়ে কিশোরের হাত আঁকড়ে ধরে, হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনল রবিন। খেয়াল করে দেখল কিশোর, একটা খাড়া পাড়ের একেবারে কিনারে চলে গিয়েছিল। রবিন দেখেছিল বলে রক্ষা।

'গেছিলে তো আরেকটু হলেই,' মুসা বলল, 'আগাথা ক্রিস্টির সেই মেয়েটার মত!'

নিচের দিকে তাকাল কিশোর। ধোঁয়াটে ঝিলিমিলির মত অস্পষ্ট চোখে পড়ছে সাগর। শব্দ শুনে বোঝা যায় আছড়ে পড়ছে পাথরের গায়ে। ওখানে পড়লে কি ঘটত ভাবতে চাইল না সে। বলল, 'বিপজ্জনক জায়গা। বেড়া দিয়ে রাখা উচিত ছিল। যে কেউ এসে পড়ে মরতে পারে।'

'তা মরবে না,' মুসা বলল, 'আমরা না জানলে কি হবে, এখানকার লোকে নিশ্চয় জানে তা ছাড়া সাইনবোর্ড আছে। ওই যে।'

পায়েচলা একটা পথের ধারে খাড়া করে রাখা হয়েছে ছোট সাইনবোর্ড। তাতে লেখা:

সাবধান!
বিপজ্জনক জায়গা!
বেশি কিনারে যাবেন না!
–আদেশক্রমে: প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

'সাইন বোর্ড থাকলেও এ ভাবে অরক্ষিত রেখে দেবে,' কিশোর বলল, 'আমার তা মনে হয় না।'

ভাল করে দেখার জন্যে কিনারে দাঁড়িয়ে গলা লম্বা করে নিচে উঁকি দিল সে কংক্রীটের খুঁটি সহ কাঁটাতারের বেড়া দলা-মোচড়া পড়ে আছে কয়েক ফুট নিচে।

'বললাম না, থাকবেই,' কিনার থেকে সরে এল সে। 'পাড় ভেঙে পড়েছে দু'চার দিনের মধ্যেই ঘটেছে ঘটনাটা।'

'ভাঙবে না তো কি!' মুসা বলল। 'যে রকম প্যাচপ্যাচে বৃষ্টি আর কুয়াশা।'

সামনে এগোনোর পথ নেই দেখে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। কিন্তু কোন্ দিকে যাবে? সব দিকই এখন একই রকম লাগছে।

'সাগরের শব্দকে পেছনে ফেলে এগোতে থাকলে, খুব একটা বিপদের সম্ভাবনা নেই,' কিশোর বলল। 'কুয়াশা হয়তো শীঘ্রি কেটে যাবে। ততক্ষণে কোন বাড়িঘরের সন্ধানও পেয়ে যেতে পারি।'

শীতে কেঁপে উঠল সে। পাতলা একটা টী-শার্ট পরে চলে এসেছে। কে আর জানত এই কাণ্ড হবে

কিছুদূর গিয়ে আরেকটা সাইনবোর্ড দেখতে পেল। এর পেছনে কাঁটাতারের বেড়া ঠিকই আছে। সাবধানবাণী সেই একই রকম। তবে আগেরটার সঙ্গে তফাৎ, এখানে ঘাস তো আছেই, কাঁটাঝোপ আর গাছপালাও আছে। তেমন কোন প্রয়োজন না পড়লে এগুলো ঠেলে এগোতে যাবে না কেউ।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'বেড়া ধরে ধরে এগোব। কোথাও না কোথাও শেষ হয়েছে এটা। এক জায়গায় ঘুরে মরা লাগবে না আর।'

কিন্তু স্বস্তিটা এক মুহূর্তের বেশি স্থায়ী হলো না। গুলির শব্দ শোনা গেল হঠাৎ। খুব কাছেই।

'খাইছে!' গলা কাঁপছে মুসার 'আমাদের করছে নাকি?'

'কি করে বলব?' কিশোরের জবাব। 'আমাদের করবে কেন?'

'হয়তো অনধিকার চর্চা করছি আমরা,' রবিন বলল 'বিনা অনুমতিতে এমন কোন জায়গায় ঢুকে পড়েছি, যেখানে ঢোকা উচিত না মিনিস্ট্রি অভ ডিফেন্সের সাইনবোর্ড দেখলাম ওদের গার্ড হতে পারে।'

'কিন্তু গার্ড আমাদের গুলি করবে কেন? আর যদি করার হুকুম থাকেও, করার আগে চ্যালেঞ্জ করবে। তা ছাড়া, কুয়াশার মধ্যে দেখবেই বা কি করে আমাদের?'

জবাব দিতে না পেরে চুপ হয়ে গেল দুই সহকারী। আবার গুলির আশঙ্কায় সাবধানে কোন রকম শব্দ না করে পা টিপে টিপে এগোল ওরা।

'বেড়া ধরেই এগোব,' ফিসফিস করে বলল রবিন, 'তাতে পাড়ের কিনার দিয়ে ভুল করে খাদে পড়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না।'

'তা ঠিক,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল মুসা। 'পাথরে পড়ে ভর্তা হওয়ার চেয়ে গুলি খেয়ে মরা অনেক আরামের।'

হেসে ফেলল রবিন। 'মরে দেখেছ নাকি কখনও?'

বেড়াটাকে একপাশে রেখে আবার হাঁটতে শুরু করল ওরা। ভেজা ঘাসে পা যেন এগোতে চাইছে না। মনে হতে লাগল ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে হেঁটে চলেছে। লোহার ঠেলাগাড়ি চালানোর একটা লাইন দেখল অবশেষে। দু'ধারে পাথরের দেয়াল। লাইন দেখে মনে হচ্ছে না খুব একটা ব্যবহার করা হয় এটা। কাদা জমে আছে।

'এ কোথায় এলাম?' রবিনের প্রশ্ন।

'আল্লাই জানে!' জবাব দিল মুসা।

'কোনদিকে হেঁটেছি, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আমিই কি পারছি ছাই!' কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'কি করব?'

'লাইন ধরে এগোতে থাকি। কোথাও না কোথাও, কারও না কারও সামনে পড়ে যাবই। সেই বন্দুকওলার সামনে পড়লেও এখন আর কেয়ার করি না আমি। শুধু এই অনিশ্চিত অবস্থার হাত থেকে বাঁচতে চাই।'

বেশিক্ষণ আর কষ্ট করতে হলো না। লাইন ধরে এগিয়ে গিয়ে মস্ত এক লোহার গেট চোখে পড়ল। পাল্লায় খিল লাগানো। আরও কিছুটা এগোতে দেখল, খোয়া বিছানো রাস্তা চলে গেছে গেটের অন্যপাশ থেকে। রাস্তার দুই ধারে বড় বড় গাছের ডাল এমন ভাবে গায়ে গায়ে লেগে আছে, সুড়ঙ্গের মত লাগছে দেখতে। ঝোড়ো বাতাসে পাগলের মত মাথা দোলাচ্ছে ডালপাতাগুলো।

খাদের মধ্যে একটা সাইনবোর্ড কাত হয়ে পড়ে থাকতে দেখল রবিন। আগাছায় প্রায় ঢেকে আছে।

নিচু হয়ে বোর্ডটা মুছতে গেল রবিন, কি লেখা পড়ার জন্যে। নাড়া লেগে বেরিয়ে এল অসংখ্য পোকা, দৌড়াদৌড়ি শুরু করল বোর্ডের ওপর।

ঝটকা দিয়ে হাতটা সরিয়ে আনল রবিন। 'জঘন্য জিনিস!'

তবে ততক্ষণে লেখার ওপরটা মোটামুটি মোছা হয়ে গেছে তার। পড়তে পারল: বাইট কুনার। মলিন হয়ে এসেছে সোনালী রঙে লেখা অক্ষরগুলো। বোর্ডের জায়গায় জায়গায় চিড় ধরেছে।

'হ্যারল্ড ফার্মের আশেপাশেই তাহলে ঘুরেছি আমরা এতক্ষণ...

কথা শেষ হলো না রবিনের। ছায়া থেকে বেরিয়ে এল বিরাট এক অ্যালসেশিয়ান, গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করল। ঝাঁপিয়ে পড়ল গেটের ওপর। পা দিয়ে খিল খোলার চেষ্টা করতে লাগল।

জানোয়ারটার পেছনে ছায়ার মত নিঃশব্দে এসে উদয় হলো একজন মানুষ। হাতে বন্দুক।

তিন

'থাম্, অক্টোপাস! থাম্!...আরে থাম্ না!'

চাপা গর্জনে রূপ নিল কুকুরটার চিৎকার। গেটের কাছে এগিয়ে এল লোকটা।

'কি চাও?'

গেট খোলার জন্যে হাত বাড়াল না। শিকের ফাঁক দিয়ে কথা বলছে। কর্কশ কণ্ঠস্বর। মাঝারি উচ্চতার মানুষ। কালো চুল। বয়েস চল্লিশ। কমও হতে পারে। এমন এক ধরনের চেহারা, সঠিক বয়েস বোঝা যায় না।

দ্রুত হয়ে এল কিশোরের নাড়ির গতি। এই লোকই কি গুলি করেছিল? গাট্টাগোট্টা শরীর, ডাকাতের মত চেহারা, কিন্তু আচরণে অভদ্রতা প্রকাশ পাচ্ছে না। হাতের ভাঁজের মধ্যে আলতো ভাবে ফেলে রেখেছে বন্দুকটা।

প্রশ্নের জবাব দিল রবিন, 'ফুপুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছি। ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে গেছি।'

'আমাকে কি করতে বলো?'

'একটা ফোন করা গেলে ফুপুকে জানাতে পারতাম কি অবস্থায় আছি,' অনুরোধের সুরে বলল রবিন। 'তারপর আপনার কাছে জেনে নিতে পারতাম ফ্রেমলি বে'টা কোনখানে। দেবেন একটা ফোন করতে? কলের খরচটা দিয়ে দেব। প্লীজ!'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তিন গোয়েন্দার আপাদমস্তক পরখ করল লোকটা। তারপর গেটের তালা খুলে দিয়ে বলল, 'এসো।' ওরা এল কি এল না দেখার জন্যে অপেক্ষা না করে সোজা ঘুরে হাঁটতে শুরু করল।

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। সবার আগে মনস্থির করে নিল রবিন। গেটটা ঠেলে খুলল। আড়চোখে তাকিয়ে আছে গজরাতে থাকা কুকুরটার দিকে।

'অক্টোপাস!'

ধমক খেয়ে মনিবের পেছনে ছুটল কুকুরটা।

একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বাইকুনারের মূল বাড়িটা। নিরানন্দ চেহারা, নির্জন। ভিকটোরিয়ান আমলে তৈরি বাড়ি তো না, যেন জেলখানা। আঙিনায় দাঁড়িয়ে আছে একটা ট্রাক্টর। তার পেছনে, কিশোরের চোখে পড়ল, গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে আছে একটা গাড়ির বনেট।

সামনের দরজা খুলল লোকটা। বুট দিয়ে ঠেলে দিল কুকুরটাকে, 'যা ওখানে।'

দরজায় স্ক্রু দিয়ে লাগানো নেমপ্লেট। তাতে লেখা:

ওশন ব্রাদার্স
স্ক্র্যাপ ডিলার

স্ক্র্যাপ ডিলার? অবাক লাগল কিশোরের। একজন পুরানো বাতিল মাল বিক্রেতা এ রকম জনহীন শূন্য জায়গায় করছেটা কি?

'ব্যারাকুডা!' শূন্য হলঘরে প্রতিধ্বনি তুলল তার কণ্ঠস্বর।

'আসছি,' জবাব এল।

ওপরে সিঁড়ির ল্যান্ডিঙে ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল। রেলিঙে পেট ঠেকিয়ে নিচে তাকাল আরেকজন অপেক্ষাকৃত কম বয়েসী লোক। শক্তিশালী ব্যায়াম করা শরীর, কাঁধের মাংসপেশী ফুলে উঠেছে প্যাডের মত। ভাইয়ের মতই এই লোকটারও কালো চুল। তবে অগোছাল নয়, সুন্দর করে ছাঁটা। হাতে একটা সোনার ব্রেসলেট আর দামী ঘড়ি।

'কি ব্যাপার?' রেলিঙের কাছ থেকে সরে গেল সে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করল, 'ছেলেগুলো কে?'

'পথ হারিয়ে এ দিকে চলে এসেছে,' জবাব দিল তার ভাই। 'একটা ফোন করতে চায়। ফোনটা দেখিয়ে দে তো।'

'এ সব ছেলেছোকরাকে আবার বাড়িতে ঢোকালে কেন?' বিরক্তিতে গজগজ শুরু করল ব্যারাকুডা। 'এ বার এসেছে ফোন করতে, পরের বার দেখবে দল বেঁধে আসবে, ছোঁকছোঁক করবে, মেশিনপত্রে হাত দেবে...'

হাসল ব্যারাকুডার বড় ভাই, 'অকারণে ভয় পাচ্ছিস তুই। আমার কিন্তু ভালই মনে হচ্ছে এদের। একেবারে সাদাসিধে।'

'দেখুন,' ব্যারাকুডার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'এখানে ঢোকার কোন ইচ্ছেই আমাদের নেই। ফোনটা করতে দিন। করতে পারলেই চলে যাব। জীবনে আর কখনও চেহারাও দেখবেন না আমাদের।'

'ভাই,' ভাইকে বলল ব্যারাকুডা, 'তুমি বুঝতে পারছ না, আমি পারছি। চোখ দেখেই বলে দিতে পারি আমি। সাদাসিধে মোটেও নয় এরা। জলদি তাড়াও।'

শক্ত হয়ে গেল বয়স্ক লোকটার চোয়াল। 'তোকে ফোনটা দেখাতে বললাম, দেখিয়ে দে। কথা বাড়াসনে।'

'তুমি দেখাওগে!' রাগ করে বেরিয়ে গেল ব্যারাকুডা। দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিয়ে গেল।

'সরি, কিছু মনে কোরো না!' রাগে কালো হয়ে গেছে শার্কের মুখ। 'ছোটদের একদম দেখতে পারে না আমার ভাই। ফ্রেমলিতে আসার পর অনেক জিনিস খোয়াতে হয়েছে আমাদের। যাকগে, আমার নাম শার্ক ওশন। এসো, ফোনটা দেখিয়ে দিচ্ছি।'

বন্দুকটার দিকে বার বার কিশোরকে তাকাতে দেখে মৃদু হাসল লোকটা। 'ভয় নেই, তোমাদের জন্যে বের করিনি। পাহাড়ের ওপরে বনের মধ্যে শিয়াল মারতে গিয়েছিলাম। বড্ড জ্বালায়।'

'ও, খানিক আগে তাহলে আপনিই গুলি করেছিলেন,' কিশোর বলল। 'আর আমরা ভাবলাম, না জানি কি।'

'শেয়ালটা মরেছে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

তার দিকে তাকাল শার্ক। মাথা নাড়ল, 'নাহ্, ভীষণ চালাক। মুহূর্তে পালিয়ে যায়। তবে যাবে কোথায়। মেরে ছাড়ব। কুয়াশার জন্যে পার পেয়ে গেল আজ।'

মুসার মনে হলো, কথাগুলো ওদের উদ্দেশ্য করেই বলল লোকটা। আজকে

ফাঁকা আওয়াজ করে ভয় দেখিয়েছে, অন্যদিনে মেরে বসবে। কিন্তু মারবে কেন? লোকটা কি চায় না, ওরা সাগর পাড়ে পাহাড়ের ওদিকটায় যাক?

বন্দুকটা রেখে একটা অফিস ঘরে ওদের নিয়ে এল শার্ক। অনেকগুলো ফাইলিং কেবিনেট দিয়ে বোঝাই করে ফেলা হয়েছে ঘরটা। গোটা দুই চেয়ার আছে। একটা টেবিলে কাগজপত্র উপচে পড়ছে। কতগুলো কাগজ সরিয়ে তার তলা থেকে ফোনটা বের করে দিল সে।

'ডিরেক্টরি আছে আপনার কাছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'ফুপুর অফিসের নম্বর আমি জানি না।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে রবিনের দিকে তাকাল শার্ক। অর্থাৎ, কোন্ অফিস?

'আমার ফুপু এস্টেট এজেন্টের ব্যবসা করে। মিস এনিড মিলফোর্ড।'

'ও, উনি,' ডিরেক্টরি বের করে দিল শার্ক। 'চিনি তো। ভীষণ কড়া মানুষ।'

কি ঘটেছিল ফুপুকে বোঝাতে বেশি কথা বলতে হলো না। তবে গুলির কথাটা চেপে গেল রবিন। কি না কি ভেবে বসেন ফুপু, তাঁকে অহেতুক দুশ্চিন্তায় ফেলতে চাইল না।

'বসে থাক তোরা ওখানে। আমি আসছি।'

'ঠিক আছে, গেটের বাইরে আছি।'

'মিস্টার ওশনকে একটু দে তো।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও শার্কের হাতে ফোন তুলে দিল রবিন। 'আমার ফুপু কথা বলবে।'

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর আর মুসা। ওদের কাছে সরে এল রবিন। কিশোরের চোখে উত্তেজনা দেখতে পেল রবিন। কি দেখে উত্তেজিত হলো কিশোর?

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রবিন। আগাছায় ভরা বাগান। তাতে মরচে পড়া পুরানো যন্ত্রপাতি পড়ে আছে বেশ কিছু। পাশে 'ওশন ব্রাদার্স' লেখা একটা পিক-আপ ট্রাক, আর একটা ছোট ট্রেলার। উত্তেজিত হওয়ার মত কিছু চোখে পড়ল না রবিনের।

ফোন রেখে দিল শার্ক। রবিনকে বলল, 'তোমার ফুপু আমার সঙ্গে হ্যারল্ড ফার্মের ব্যাপারে কথা বলতে চায়।...এসো।'

অফিসের চেয়ে লিভিং-রুমটা ভাল। আসবাবগুলো পুরানো, ধুলো পড়া, তবে ওগুলোতে অন্তত বাস করার চিহ্ন বর্তমান। ফায়ারপ্লেসের আগুন রোদশূন্য ঘরটার ঠাণ্ডা দূর করে দিয়েছে।

'কফি?' জিজ্ঞেস করল শার্ক। 'নাকি কোক বেশি পছন্দ?'

'কোক?' মাথা কাত করল রবিন। 'গলাটা একেবারে শুকিয়ে গেছে।'

'বহুত ঘোরাঘুরি করেছ তারমানে। এক মিনিট। এখুনি নিয়ে আসছি,' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল শার্ক।

'দেখেছ?' চাপা গলায় রবিনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কি?'

'পিক-আপ ট্রাকটার ছাতে?'

'সার্চলাইটটার কথা বলছ?'

'চুপ! আস্তে! কেন, ওটা দেখে কিছু মনে হয়নি তোমার? আলোর সঙ্কেতের কথা ভুলে গেছ?'

'কিন্তু তীরের দিক থেকে যে আলোটা দিয়ে সঙ্কেত দিচ্ছিল, ওটাকে সার্চলাইট বলে মনে হয়নি। উজ্জ্বলতা অনেক কম ছিল।'

'রঙিন কাগজ দিয়ে ঢেকে নিলে তো কমেই যাবে...'

কোক নিয়ে ফিরে এল শার্ক। নীরবে কোক খেতে লাগল তিন গোয়েন্দা। শার্কের সঙ্গে দু'একটা কথা বলে অস্বস্তিকর নীরবতা দূর করার চেষ্টা করল রবিন। কিন্তু কাজ হলো না। দরজার বেল বাজতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

লাফ দিয়ে আবার উঠে দাঁড়াল রবিন। 'ফুপু এসেছে।'

'তুমি বসো,' বাধা দিল শার্ক। 'আমি গিয়ে নিয়ে আসছি।'

'আমি জানতাম, বেরোলেই একটা না একটা কিছু ঘটাবি,' ঘরে ঢুকেই বলে উঠলেন এনিড আন্টি, তবে রাগ করে নয়, হেসে। শার্কের দিকে তাকালেন, 'আটকে যে রেখেছেন, আর কোথাও যেতে দেননি, সে-জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, মিস্টার ওশন।'

'আমি রাখিনি। ওরাই বসে আছে।...আপনি আমার সঙ্গে হ্যারল্ড ফার্ম নিয়ে কথা বলতে চেয়েছেন।'

লুকোছাপার মধ্যে গেলেন না আন্টি। 'ফার্মটা বিক্রি করতে চান মিসেস হ্যারল্ড, কিন্তু অদ্ভুত কিছু ঘটনা চোখে পড়েছে তাঁর, যে জন্যে চিন্তিত। সেগুলো আপনাকে জানিয়েছেনও তিনি, মিস্টার ওশন। আপনি কি ঘটনাগুলোর কথা কিছু বলতে পারবেন?'

'নিশ্চয় পারব। এ সব অভিযোগ বহুবার করেছেন তিনি,' কর্কশ হয়ে উঠল আবার শার্কের কণ্ঠ। 'আসলে, বুড়ো হয়েছে তো, পাগল হয়ে গেছে। রাতে নাকি গিয়ে তাঁর বাড়ির গেট খুলে দিয়ে আসি আমরা, জানোয়ারগুলো সাগরে পড়ে মরার জন্যে, তাঁর জানোয়ার চুরি করি...বদ্ধ পাগল না হলে এ সব কথা বলে কেউ?'

'শান্ত হোন, মিস্টার ওশন। আমি জানি আমার মক্কেলের বয়েস হয়েছে, আর বয়েস হলে চোখ-কানের ক্ষমতা কমে যায় মানুষের, কিন্তু এ কথাটা তো ঠিক যে তাঁর কিছু ভেড়া হারিয়ে গেছে। গত হপ্তায়ও একটা ভেড়া পাওয়া গেছে সাগরে। মৃত। গেটটা তো কেউ না কেউ খুলেছে। নইলে পড়ল কি করে?'

'কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় না কাজটা আমরাই করেছি। আর আলো এবং রহস্যময় শব্দের কথা যেটা বলা হচ্ছে...সব তাঁর কল্পনা। আমি আপনাকে বলছি, মহিলা পাগল। এ রকম একজন পড়শীকে নিয়ে স্বস্তি পাচ্ছি না। আমার ঘাড় থেকে পাগল সরানোর জন্যেই কেবল তার জায়গা-জমি কিনতে রাজি হয়েছি আমি—তবে যে দর হেঁকেছেন, সেই অস্বাভাবিক দামে নয়।'

'আপনি কত দিতে চান?'

এক টুকরো কাগজে হিসেব শুরু করল শার্ক। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ অনেকই

করল। তারপর কাগজটা বাড়িয়ে দিল এনিড আন্টির দিকে।

ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে কাগজটার দিকে তাকালেন এনিড আন্টি। 'অস্বাভাবিক কথা বলছেন, মিস্টার ওশন। অতি হাস্যকর। রবিন, আয় তোরা। ওঠ, যাই। গুড-বাই, মিস্টার ওশন।'

গাড়িতে উঠে ফিরে তাকাল কিশোর। শার্ককে দেখল বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। থমথমে চেহারা। আন্টির কথায় অপমানিত বোধ করেছে মনে হয়।

'দাম খুব কি কম বলেছে, আন্টি?' জানতে চাইল কিশোর।

হাসলেন এনিড আন্টি। 'না, অত কম না। চাপাচাপি করলে হয়তো আরও কিছুটা বাড়বে।'

'তারমানে যে সব ঘটনা ঘটেছে বলছ,' ফুপুকে বলল রবিন, 'সেগুলোর ব্যাপারে তোমারও সন্দেহ আছে? মিসেস হ্যারন্ডের কল্পনা ভাবছ? আসলে কিন্তু ঘটেছে। আলো তো আমরা আগেই দেখেছি। একটু আগে গুলিও করা হয়েছিল।'

'কি করা হয়েছিল!' সীটের ওপর ঘুরে বসলেন এনিড আন্টি।

আর কিছু না বলতে রবিনকে চোখ টিপল কিশোর। কিন্তু একবার যখন বলা হয়ে গেছে, আর এড়ানো যাবে না তাঁকে, সেটাও বুঝতে পারল।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়েছিলেন, বন্ধ করে দিলেন এনিড আন্টি। 'কি ঘটেছে, খুলে বল!'

'কুয়াশার মধ্যে পথ হারিয়ে ঘুরে মরছি,' রবিন বলল, 'এ সময় মিনিস্ট্রি অভ ডিফেন্সের একটা সাইনবোর্ড দেখলাম। কাঁটাতারের বেড়া ধরে এগোতে থাকলাম। হঠাৎ একটা গুলির শব্দ। ভাবলাম, আমাদের করেছে। পরে শার্ক ওশন বলল, শিয়াল মারতে বেরিয়েছিল সে। হয়তো সত্যি কথাই বলেছে।'

'মিথ্যে বলতে যাবে কেন?'

জবাবের আশায় কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।

'যা-ই বলুন, আন্টি,' প্রশ্নটা এড়ানোর জন্যে তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'স্ক্র্যাপইয়ার্ড বানানোর জন্যে জায়গাটা মোটেও উপযুক্ত নয়।'

'কেন নয়? শহরের কিনারে, বিরাট জায়গা, পুরানো মাল রেখে বিক্রির জন্যে এর চেয়ে ভাল জায়গা কোথায় পাবে?' চিন্তিত মনে হচ্ছে এনিড আন্টিকে। 'কিন্তু আমি ভাবছি, তোরা মিনিস্ট্রি অভ ডিফেন্সের সাইনবোর্ড দেখিস কি করে? আমার জানামতে এদিকে তো ওদের কোন জায়গা-টায়গা নেই। দ্বীপটা অবশ্য দখল করে রেখেছে জোর করে—বেশি দিন রাখতে পারবে না আর, ছেড়ে দিতেই হবে; কিন্তু এদিকটায় কোন জায়গাই নেই ওদের। শিওর দেখেছিস তো?'

'একদম শিওর। কয়েকশো গজ পর পরই রয়েছে নোটিশ। খাড়া একটা পাড়ের কাছে চলে গিয়েছিলাম, প্রথম নোটিশটা তখনই চোখে পড়ল। পাড় ধসে গিয়ে কাঁটাতারের বেড়া সহ নিচে পড়ে গেছে।'

ইঞ্জিন স্টার্ট দিলেন আবার এনিড আন্টি। গীয়ার দিতে দিতে বললেন, 'আশ্চর্য!'

খোয়া বিছানো পথ ধরে এসে মেন গেট দিয়ে বেরোল গাড়ি। হেডলাইট জ্বেলে দিলেন এনিড আন্টি। উইন্ডস্ক্রীন ওয়াইপার চালু করে দিলেন। 'এই কুয়াশা গেলে বাঁচি। সব কিছু ভিজিয়ে, ঠাণ্ডা বানিয়ে দিয়ে যায়।'

পথের প্রথম মোড়টা ঘুরতে আরেকটা গাড়ি দেখা গেল। উল্টো দিক থেকে আসছে। একটা বড় পিক-আপ। ভাব-সাব ভাল ঠেকল না কিশোরের। সরু রাস্তা ধরে অতিরিক্ত দ্রুত চালাচ্ছে। বেপরোয়া ভঙ্গি।

'আরি, সরে না কেন!' একপাশে গাছের বেড়ার কাছে সরে গেলেন এনিড আন্টি।

কিন্তু কেয়ারই করছে না বড় গাড়িটার ড্রাইভার। যেন চোখেই পড়েনি ওদের। পাশ কাটানোর জায়গা তো রাখেইনি, বরং আরও সরে এল ওদের দিকে।

সরে যাবে–আশা করল কিশোর–ড্রাইভার দেখতে পায়নি। যে কোন মুহূর্তে শোনা যাবে ব্রেক কষার পর টায়ারের শব্দ।

কিন্তু সরলও না ওটা, ব্রেকও কষল না। গাড়িটার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গেল সে।

'মাই গড!' চিৎকার করে উঠলেন এনিড আন্টি। 'ও তো আমাদের ধাক্কা মারতে আসছে!'

ব্রেক চেপে ধরলেন তিনি। স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে সরে যেতে চাইলেন গাছের বেড়ার দিকে।

ধাতুতে ধাতু ঘষা লাগার বিশ্রী শব্দ হলো। সামনের বাম্পারে গুঁতো মেরে পাশ কেটে সরে গেল বড় পিক-আপটা। সামনের দিকে উড়ে গেল যেন কিশোরের দেহটা। সীট-বেল্ট আটকে দিল তাকে। ঝটকা দিয়ে আবার পেছনে সরে গেল, হেডরেস্টে বাড়ি খেল মাথা।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দুই চাকার ওপর কাত হয়ে রইল গাড়িটা। তারপর আস্তে করে দাঁড়িয়ে গেল একপাশে, বেড়ার ভর না পেলে উল্টে যেত। কতক্ষণ ধরে কাত হয়ে পড়ে রইল, বলতে পারবে না কিশোর। অসুস্থ বোধ করছে। মাথায় আঘাত লেগেছে। সারা গা কাঁপছে থরথর করে।

'ঠিক আছ সবাই?' কানে এল এনিড আন্টির কণ্ঠ।

ডাকটা কোন্‌খান থেকে আসছে বুঝতে পারল না কিশোর। কাত হয়ে থেকে দেখতে হচ্ছে বলে সব কিছুই কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। এখন যে পজিশন, তাতে কিশোর ঝুলে আছে এনিড আন্টির ওপরে।

'কিশোর?'

'আমি ঠিকই আছি, আন্টি।...মুসা? রবিন, তোমরা?'

সাড়া দিল ওরাও। ভালই আছে।

দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মগজে। বেরোতে হবে। একটা পাশ দিয়েই বেরোনো সম্ভব–সে যেদিকে রয়েছে সেদিক দিয়ে, অন্য পাশ তো মাটিতেই ঠেকে আছে। সাবধানে বেরোতে হবে। বেশি নড়াচড়া করলে বেড়াও আর ঠেকাতে পারবে না গাড়িটাকে। উল্টে খাদে পড়ে যাবে।

'একজন একজন করে বেরোও,' কিশোরের মত একই ভাবনা খেলছে এনিড আন্টির মাথায়ও। 'তাড়াহুড়ো করবে না। কিশোর, তুমি আগে।'

সীট-বেল্টে ঝুলে থেকে হাত বাড়াল কিশোর। হাতল চেপে ধরে দরজা খোলার চেষ্টা করল। খুলল না। আটকে গেছে।

'গন্ধ কিসের?' নাক টানতে টানতে বলল মুসা।
'পেট্রল!' দরজা খোলার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল কিশোর। বহু চেষ্টার পর খুলল অবশেষে। পুরোটা নয়, তবে বেরোনো যাবে। দরজার ফাঁকে মাথা গলিয়ে দিয়ে মুচড়ে মুচড়ে বের করে আনল শরীরটা। এক মুহূর্তও দেরি না করে পেছনের দরজা খুলে দিল রবিনের বেরোনোর জন্যে। মাটিতে দাঁড়িয়ে দরজা খোলা অতটা কঠিন হলো না।
একে একে নিরাপদেই বেরিয়ে এল সবাই, রাস্তার পাশের ঘাসে ঢাকা ঢালু জায়গায়।
পেট্রল ট্যাংকটা দ্রুত একবার পরখ করে দেখল মুসা। 'না, ফাটে-ফোটেনি! আল্লাহ্ বাঁচিয়েছে! ফাটলে কাবাব হয়ে যেতাম।'
আগুন লাগবে না নিশ্চিত হয়ে নিয়ে, গাড়িটা ঠেলে সোজা করার চেষ্টা করতে লাগল সবাই মিলে।
চার চাকার ওপর বসল আবার গাড়ি। ঠেলেঠুলে রাস্তায় নিয়ে এল ওরা। পিক-আপটা ধাক্কা দিয়েই পালিয়েছে। 'সরি' বলার জন্যেও থামেনি। তারমানে ইচ্ছে করেই ধাক্কা দিয়েছে।
'আমাদের খুন করতে চেয়েছিল!' মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন এনিড আন্টি, বিশ্বাস করতে পারছেন না। 'গাড়ির নম্বরটা খেয়াল করেছ কেউ? আমি তো তাকানোরই সময় পাইনি। তোমরা?'
'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'কুয়াশা...হেডলাইট...দেখার কোন সুযোগই ছিল না। তা ছাড়া এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল...'
'হুঁ!'
'গাড়ির রঙটাও ঠিকমত বুঝতে পারিনি,' মুসা বলল। 'সাদাই তো। নাকি ক্রীম?'
'ওরকমই কিছু হবে।' গাড়ির কতটা ক্ষতি হয়েছে দেখলেন এনিড আন্টি। 'বডির রঙটঙ অনেকটাই গেছে, তবে হবে ঠিক। ইঞ্জিনটা এখন স্টার্ট নিলেই বাঁচি। নইলে বিপদে পড়ব।'
পুটপুট, ফুটফাট, কাশি—বহু ধরনের শব্দই করল ইঞ্জিন। স্টার্ট নিল অবশেষে।
বাড়ি ফেরার পথে থানায় থেমে রিপোর্ট করলেন এনিড আন্টি। কিন্তু লোকটাকে ধরতে পারার ভরসা দিতে পারল না পুলিশ। কারণ সূত্র নেই।
'ছুটির মৌসুম, বুঝতেই পারছেন, মিস,' ডিউটি অফিসার বলল। 'কতখান থেকে লোক আসে। নম্বরটাও যদি খেয়াল করতেন...'

ডিনারের পর রহস্যটা নিয়ে আলোচনায় বসল তিন গোয়েন্দা।
কিশোর বলল, 'আলোর কথা দিয়েই শুরু করা যাক। প্রথমে দেখা গেছে দ্বীপ থেকে। সবুজ, সাদা এবং লাল। জবাব গেছে মূল ভূখণ্ড থেকে, সবুজ আর সাদায়। লাল দেখিনি। তাই না?'
'কিন্তু আমি যখন প্রথম দেখলাম, আলোটা বোধহয় সবুজ ছিল না,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ, সেটাও মাথায় আছে আমার। জরুরী সূত্র এগুলো। তারপর?'
'পিক-আপের ওপরে বসানো সার্চলাইটটার কথা ভুলে যেয়ো না,' মুসা বলল।
'এবং যেটা আমাদের ধাক্কা দিয়েছিল সেটাও পিক-আপ,' যোগ করল রবিন। কি মনে হতে ঝট করে কিশোরের দিকে তাকাল, 'ছাতে সার্চলাইট ছিল?'
'তুমি যা বলতে চাইছ বুঝতে পারছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সার্চলাইট চোখে পড়েনি। কুয়াশার মধ্যে কি আর কিছু দেখা যায়। পুলিশের সাহায্য পেলে ভাল হত।'
খানিক চিন্তা করে মুসা বলল, 'পুলিশকে দিয়ে কোন সাহায্য হবে না। পুলিশ আমাদের পাত্তাই দেয়নি। ওদের ধারণা, কুয়াশার মধ্যে না দেখে ভুল করে গুঁতো লাগিয়ে দিয়েছে কেউ, তাই না, কিশোর? ঠিক অপরাধী ভাবতে পারছে না তাকে।'
নিচের ঠোঁটে বার দুই ঘন ঘন চিমটি কাটল কিশোর। 'প্রশ্ন হলো, কে গুঁতোটা লাগাল? এবং তারচেয়েও জরুরী প্রশ্ন, কেন?'
'নিশ্চয় সেই ব্যারাকুডাটা,' তিক্তকণ্ঠে জবাব দিল রবিন।
'কুনারের আশেপাশে আমাদের ঘোরাঘুরি পছন্দ করে না, বলেই দিয়েছে,' মুসা বলল। 'জিনিসপত্র চুরি হবে ভয়েতে যেতে দিতে চায় না, এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না।'
'সার্চলাইট বসানো পিক-আপটা কার? বন্দুক নিয়ে কি সত্যি সত্যি শেয়াল মারতে বেরিয়েছিল শার্ক?' চোখ জ্বলজ্বল করছে কিশোরের। 'এ সব প্রশ্নের জবাব আমাদের জানা দরকার, তাই না!'

চার

জানালার পর্দা ভেদ করে রোদ আসছে। হলুদ রেখার মত পড়েছে গিয়ে দেয়ালে। কফি আর টোস্টের সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।
'ছেলেরা! নাস্তা রেডি!' সিঁড়িতে শোনা গেল এনিড আন্টির উচ্ছল চিৎকার।
গা থেকে কম্বল ফেলে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামল কিশোর। বারান্দায় বেরিয়ে মুসা আর রবিনের দরজার দিকে তাকিয়ে ডাকতে লাগল, 'এই, তোমরা বেরোও না। দারুণ সুন্দর দিন। বহু কাজ পড়ে আছে আমাদের।'
কয়েক মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিচে রান্নাঘরে নেমে এল কিশোর। পেছন পেছন এল মুসা।
'রবিন কই?'
চিঠি পড়ছিলেন এনিড আন্টি। মুসার কথায় মুখ তুললেন। 'তোমাদের আগেই উঠে পড়েছে। হাঁটতে গেছে সী-বীচের দিকে। ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল। অনেক রাত করে নাকি ঘুমিয়েছ, সে-জন্যে আর ঘুম ভাঙায়নি তোমাদের।'
পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল রবিন। তার লম্বা বাদামী চুল ঘামে ভেজা। মুখ গোল করে বাতাস ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'দিনটা সত্যি চমৎকার। দৌড়াতে দৌড়াতে ফ্রেমলিতে চলে গিয়েছিলাম। খিদে যা লেগেছে না।'

'বসে যা।' টেবিলের ওপর দিয়ে কমলার রসের জগ আর সিরিয়ালের প্যাকেটটা ঠেলে দিলেন এনিড আন্টি। টোস্টারে আরও দুই টুকরো রুটি ঢোকালেন।

গ্লাসে কমলার রস ঢেলে চুমুক দিল রবিন। তার ফুপু উঠে চলে গেলে দুই বন্ধুর দিকে তাকাল, 'কি দেখে এসেছি কল্পনা করতে পারবে?'

'না,' মাথা নাড়ল মুসা।

'একটা সাদা পিক-আপ। ড্রাইভারের পাশে বডির নিচের কোনা দুমড়ে যাওয়া।'

'কোথায়!' এতটাই চমকে গেল কিশোর, ডিমভাজার ওপর গ্লাসের দুধ ছলকে ফেলে দিল। 'নাম্বারটা নিয়েছ?'

মাথা নাড়ল রবিন। 'দেখিনি। মানে দেখতে পারিনি। এসপ্ল্যানেডে একসারি গাড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল। আলো জ্বলতেই চলে গেল। রঙ অ্যাঙ্গেলে থাকায় তখনও দেখতে পারলাম না। ড্রাইভারের মুখও ভাল করে দেখতে পারিনি। শুধু তার কালো চুল দেখেছি।'

'খাইছে!' মুসা বলল, 'ব্যারাকুডার চুলও কালো!'

'কালো তার ভাইয়ের চুলও,' শুকনো স্বরে বলল কিশোর। গাড়ির নম্বর জানা যায়নি বলে দমে গেছে। 'কালো চুল ফ্রেমলির অর্ধেক মানুষের।...গাড়ির ছাতে সার্চলাইট ছিল?'

'না,' মাথা নাড়ল রবিন।

ফিরে এলেন এনিড আন্টি। পোশাক পাল্টে এসেছেন। পরনে বিজনেস স্যুট। 'ফেরার পথে গাড়িটা গ্যারেজে দিয়ে আসব। তোদের তো চলাফেরার দরকার, শুধু পা সম্বল করে পারবি না। তিনটে সাইকেল ভাড়া করে নিস। ফ্রেমলিতে দোকান আছে, বন্দরের কাছে। আর...'

'কি?' ভুরু নাচাল রবিন।

'দিনটা ভাল, ভালভাবেই কাটাস, দয়া করে। যদিও বলে লাভ নেই, শুনবিনে জানি, তবু বলছি। অকারণে মানুষের বন্দুকের সামনে যেয়ে গুলি খাওয়ার ঝুঁকি নেয়া কেন? মিনিস্ট্রি অভ ডিফেন্স আর ওশনদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ানোও কোন কাজের কথা নয়।'

'না, জড়াব না। ফ্রেমলিতে যাব, ঘুরে ঘুরে জায়গা দেখব, বন্দরে ঘুরে বেড়াব; সাঁতারও কাটতে যেতে পারি। সাইকেলের বুদ্ধিটা দিয়ে একটা কাজের কাজ করেছ। সাইকেলই ভাড়া নেব।'

'গুড। চলি। বিকেলে দেখা হবে।'

হাঁটতে হাঁটতে ফ্রেমলিতে চলে এল ওরা। প্রচুর বাতাস থাকা সত্ত্বেও ঘাড়ের চামড়া পোড়াচ্ছে কড়া রোদ। বন্দরের দিকে মুখ করে থাকা একটা কাফে দেখে মুসা প্রস্তাব দিল আইস ক্রীম খেয়ে ঠাণ্ডা হওয়ার।

জানালার ধারে বসল ওরা। বাইরেটা বহুদূর পর্যন্ত চোখে পড়ছে। সুন্দর একটা সাদা ইয়ট নোঙর করে আছে জেটিতে। ডেকে রোদ লাগাচ্ছে একটা মেয়ে। কেবিন থেকে একটা ছেলে বেরোল। কথা বলল মেয়েটার সঙ্গে। ভেতরে গিয়ে টি-শার্ট আর শর্টস পরে এল মেয়েটা। তীরে নামল দুজনে।

'ইয়টটার দিকে বুভুক্ষের মত তাকিয়ে আছে মুসা, 'ইস্, কি সুন্দর জাহাজ! নিয়ে যদি বেরিয়ে পড়া যেত পৃথিবী ভ্রমণে. উফ্!'

রবিনের যেমন পাহাড়ের নেশা, মুসার তেমন সাগরের।

ওর কথা কিশোরের কানে ঢুকল বলে মনে হলো না। মানুষ দেখা তার প্রিয় হবি। তাকিয়ে আছে ছেলেমেয়ে দুটোর দিকে। কাফেতে ঢুকল দুজনে। ছেলেটার বয়েস কমপক্ষে আঠারো। লম্বা পা। বলিষ্ঠ, ব্যায়াম করা দেহ। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল, 'কি খাবি, লুসি?'

মেয়েটা ছেলেটার তুলনায় খাটো। বয়েসও কম হবে। চেহারা দেখেই অনুমান করে ফেলল কিশোর, ওরা ভাই-বোন। একই রকম চওড়া মুখ, বাদামী চোখ, সহজ-স্বাভাবিক আচরণ। কাউন্টারে রাখা মেনু দেখে মেয়েটা বলল, 'রকি হরর! এটা আবার কি জিনিস? যা-ই হোক, এটাই চেখে দেখব।'

'খা, যা ইচ্ছে। আমি শুধু কফি।'

কিশোরদের টেবিলের পাশ কাটানোর সময় প্রায় না তাকানোর ভান করে 'হাই' বলল মেয়েটা। পাশের টেবিলটাতে বসল। কয়েক মিনিট পর এক হাতে কফির কাপ অন্য হাতে লম্বা এক গ্লাস চকলেট সস মেশানো আইস ক্রীম নিয়ে একই টেবিলে গিয়ে বসল ছেলেটা। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাল উজ্জ্বল চোখে। বোনের চেয়ে আন্তরিক মনে হলো তাকে। বলল, 'চেয়ার তো খালিই আছে। তোমরা আসবে, না আমরা আসব?'

'আমাদের জায়গাটা ভাল,' জবাব দিল কিশোর। 'এখানেই চলে আসুন।'

পরিচয় দিল ভাই-বোন। পিটার ও লুসি মেগালডন।

রবিনের দিকে তাকাল পিটার, 'সকাল বেলা তোমাকেই দেখলাম নাকি? বীচে দৌড়াচ্ছিলে?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'হুঁ,' পিটার বলল। 'এখানে জগিংটা বোধহয় তেমন পছন্দ না লোকের। বিশেষ করে ছেলে-ছোকরাগুলো তো একেবারে আলসের গোড়া। অন্য কোন টাউন থেকে এসেছ নাকি?'

'বাড়ি আয়ারল্যান্ডে, থাকি আমেরিকায়।'

'ও, এজন্যেই, জগিং-টগিং এত কিছু। আমেরিকার কোনখানে?'

'লস অ্যাঞ্জেলেস।'

আলাপ জমতে দেরি হলো না। ছেলেটা ভারি মিশুক। মুহূর্তে ঘরের খবর বলা শুরু করে দিল। 'এদিকে একটা হোটেল বানানোর কথা ভাবছে আম্মা আর আব্বা। পুরানো সরাইখানার আধুনিক সংস্করণ। জায়গা একটা পছন্দও হয়েছে। কিন্তু এস্টেট এজেন্ট ভয় দেখাচ্ছে দ্বীপ থেকে অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু এসে নাকি ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত জায়গায়। আর কিছুদিন পর নাকি ওখানে মানুষই থাকতে পারবে না,' হাত তুলে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দেখাল সে।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'হ্যারল্ড ফার্মের কথা বলছেন নাকি?'

'তুমি করে বলো, তুমি করে বলো, আপনি শুনতে ভাল্লাগে না।...কোন ফার্ম, নাম মনে করতে পারছি না। শহরে এস্টেট এজেন্টের অফিসে বিস্তারিত লেখা

রয়েছে সব। প্রচুর মেরামতি আছে জায়গাটার। তবে অনেক জায়গা, দামও মোটামুটি সস্তা। আম্মা আর আব্বার তো খুবই পছন্দ হয়েছিল, লোকটা অ্যানথ্রাক্সের কথা বলে দিল সব নষ্ট করে। বলল, বাইটে গিয়ে ঘোরাঘুরি করে এসে বেশ কয়েকটা কুকুর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আর একটা ভেড়া রহস্যময় ভাবে মারা গেছে দিন কয়েক আগে।'

'অ্যানথ্রাক্সের কথা আমি জীবনেও শুনিনি,' লুসি বলল। 'কিন্তু শুনতে ভয়ঙ্কর লাগছে। মিস্টার ফক্স বলল, দ্বীপটাও কোনকালেই আর স্বাভাবিক হবে না। তা ছাড়া দ্বীপ হলো দ্বীপ, থাকবে সমুদ্রের মাঝখানে অনেক দূরে, কিন্তু এই দ্বীপটা মূল ভূখণ্ডের খুব বেশি কাছে।'

'রহস্যময় ভাবেই মরেছে ভেড়াটা,' বাঁকা করে বলল কিশোর। 'ফার্মের গেট খুলে রেখেছিল কেউ, পাহাড়ের চূড়া থেকে পড়ে গেছে।'

'দেখো,' সাবধান করল রবিন, 'শুধু মিসেস হ্যারল্ডের কথার ওপর ভিত্তি করে এ ধরনের মন্তব্য করা ঠিক হচ্ছে না। লোকে যা বলে তাই হয়তো সত্যি, উল্টোপাল্টা দেখেন মিসেস হ্যারল্ড।'

'যতটা শোনা যায়, আসলে দ্বীপটা তত বিপজ্জনক বলে মনে হয় না আমার,' রবিনের কথায় বিশেষ কান দিল না কিশোর। 'কেউ ওখানে নিশ্চয় আছে, নইলে আলো দেখলাম কেন আমরা? মজাটা হলো, ফার্মের বদনাম করে বেড়াচ্ছে এস্টেট এজেন্ট, অথচ জায়গাটা বিক্রির দায়িত্ব তার ওপরই ছিল।'

আইস ক্রীম খাওয়া শেষ। ঘড়ি দেখল কিশোর। লাঞ্চের সময় হয়ে এসেছে। আর দেরি করলে সময়মত বাড়ি ফিরতে পারবে না। ভাই-বোনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে উঠল সে। কাউন্টারে বিল দিতে গিয়ে চোখে পড়ল, স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে টেবিলে বসা একটা লোক। বাদামী চামড়া, বলিষ্ঠ গঠন, গায়ে নেভি ব্লু জার্সি, পরনে খসখসে কাপড়ের কালো ট্রাউজার। স্প্যানিশ বলে মনে হলো। চোখে চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে নিল লোকটা। খাওয়ায় মন দিল।

'কোথায় যাবে?' বাইরে বেরিয়েই জিজ্ঞেস করল মুসা।

'সাইকেল জোগাড় করতে,' জবাব দিল কিশোর। 'সাইকেল না হলে ঘোরাঘুরি করতে পারব না।'

পাঁচ

বাড়ি ফিরে, লাঞ্চ সেরে এঁটো বাসন-পেয়ালাগুলো ধুয়েটুয়ে পরিষ্কার করে রাখল ওরা। যার যার ঘরে এসে বিশ্রাম নিল আধঘণ্টা। তারপর উঠে বেরোনোর জন্যে তৈরি হতে লাগল আবার। সুটকেস খুলে সঙ্গে করে নিয়ে আসা দূরবীনটা বের করল কিশোর।

তিনটের সময় আবার বেরোল। এবার আর ফ্রেমলি টাউনের দিকে গেল না, সাইকেল চালাল বাইটের দিকে। গাড়ি কিংবা হাঁটার চেয়ে এখানে সাইকেল অনেক ভাল, কয়েক মিনিটের মধ্যে বুঝে গেল ওরা। বাতাস নেই। কমোনের ওপর দিয়ে

গেল না আজ। তারচেয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তাটা ধরে এগোল। একপাশে মাঠ, অন্যপাশে বেনাবন আর এক ধরনের ছোট জাতের পাহাড়ী আগাছায় ভরা।

সিকি মাইল পথ এসে বাইট হ্যারল্ড ফার্মের গেট পেরোনোর সময় একজন ছোটখাট মহিলাকে দেখল গরুর পাল নিয়ে যাচ্ছে ঘাস খাওয়াতে। ধূসর চুলগুলো পুরুষালী পিক্‌ড্ ক্যাপের নিচে চাপা দেয়া। পাশ কাটানোর সময় ভালমত লক্ষ করল কিশোর। হালকা-পাতলা দেহ হলেও যথেষ্ট কর্মক্ষম আর শক্ত-সমর্থ মনে হলো মহিলাকে।

একটা গরু সামান্য বেয়াড়াপনা শুরু করেছিল, গটমট করে ওটার পেছনে গিয়ে হাতের বেত দিয়ে শপাং শপাং করে বাড়ি মারতে লাগল মহিলা। গাল দিয়ে উঠল পুরুষ রাখালদের মত খিস্তি করে।

কিছুটা সরে এসে দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। 'এই মহিলাই মিসেস হ্যারল্ড নাকি? ব্যাটাছেলের বাপ!'

'সত্যি কি মিসেস হ্যারল্ড?' বিশ্বাস হচ্ছে না মুসার। 'আমি তো মনে করেছিলাম মিসেস হ্যারল্ড হবেন প্রায় কুঁজো হয়ে যাওয়া একজন বৃদ্ধা। মমতাময়ী। ভারী লেন্সের চশমা পরে আগুনের সামনে বসে বসে সারাক্ষণ উলের দস্তানা বোনেন।'

হাসল রবিন, 'ইনি দস্তানা বুনবেন না। বরং অবসর সময়ে কুড়াল দিয়ে লাকড়ি ফাড়বেন।'

হাসতে হাসতে কিশোর বলল, 'মহিলার সঙ্গে কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। যাকগে, পরে কোন এক সময় আসব। বেলা থাকতে থাকতে চলো বরং ওদিকটায় একবার চক্কর দিয়ে আসি।'

খামারবাড়ি পার হয়ে এসে রাস্তাটা মিশে গেছে, কিংবা বলা যায় হারিয়ে গেছে একটা খাঁড়ির প্রবেশ পথের মধ্যে। দুই ধারে টিলার মত ছোট ছোট বালির পাহাড়। ঘাসে ছাওয়া। ছোট্ট এক চিলতে সৈকতও আছে। পাথরে বোঝাই। দক্ষিণ পাশে একটা জেটির ধ্বংসাবশেষও দেখা গেল। এখন ভাটার সময়। পানি অনেক নেমে গেছে। জেটি থেকে অনেক দূরে। জোয়ারের সময় নিশ্চয় কাছে আসে। বোট বা অন্য কোন জলযান ভিড়তে চাইলে তখন ভিড়তে পারবে।

এখান থেকে দ্বীপটাকে অনেক কাছে লাগছে। পাহাড়ের মত খাড়া উঁচু পাড় উঠে গেছে সাগরের নিচ থেকে। হয়তো বা পাড় নয়, পাহাড়ই ওগুলো।

'ভালমত দেখতে চাইলে আরও ওপরে উঠতে হবে আমাদের,' কিশোর বলল। 'সাইকেলগুলো এখানে রেখে চলো পাহাড়ে উঠি। চূড়ায় বসে দেখব।'

সাইকেলে তালা দিয়ে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। এখানেও বেনাবন আর সেই অচেনা আগাছার জঙ্গল। সেগুলোর মধ্যে দিয়ে ওঠাটা খুব সহজ হলো না।

চূড়ায় পৌঁছল ওরা। দূরবীন চোখে লাগাল কিশোর। দ্বীপের সমতলের চেয়ে উঁচুতে রয়েছে এখন। দ্বীপে পাহাড় আছে, মাঠ আছে, রাস্তাও দেখা গেল। রাস্তার ধারে কটেজের ধ্বংসাবশেষ।

'মানুষজন কিছু চোখে পড়ছে না,' জানাল সে।

কিন্তু রবিনের নজর অন্যদিকে। বলল, 'দেখেছ? কাঁটাতারের বেড়ার সীমানার মধ্যে রয়েছি আমরা, কিন্তু মিনিস্ট্রি অভ ডিফেন্সের নোটিশ বোর্ড নেই।'

চোখ থেকে দূরবীন সরাল কিশোর। অবাক হয়েছে সে-ও। 'তাই তো! এখন মনে পড়ছে। আসার সময়ও কোথাও বোর্ড চোখে পড়েনি আজ।'

এগিয়ে গিয়ে খাড়া পাড় দিয়ে নিচে তাকাল সে। খানিকক্ষণ দেখে বলল, 'একটা খোঁড়ল দেখা যাচ্ছে। গুহার মুখ হবে। ইচ্ছে করলে নেমে গিয়ে দেখে আসা যায়।'

মুসা বলল, 'আমার এখন যেতে ইচ্ছে করছে না। এখানেই ভাল লাগছে। কে যায় এখন সুড়ঙ্গের মধ্যে অন্ধকারে ঢুকতে।'

সুতরাং নিচে নামা আর হলো না। পাহাড়ের চূড়ায় বসে থেকেই পালা করে দূরবীন দিয়ে দ্বীপটা দেখতে লাগল ওরা। মানুষ চোখে পড়ল না একবারও। আলো ঝিলিক দিল না। সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থেকে তারপর উঠল।

রাতের বেলাও ঘরে বসে পালা করে পাহারা দিল ওরা। আলো দেখার জন্যে। লাভ হলো না। আলো দেখা গেল না সে-রাতে।

সকালবেলা দেরি করে ঘুম ভাঙল। নিচে নেমে দেখে এনিড আন্টি অফিসে চলে গেছেন।

নাস্তা সেরে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। ফ্রেমলি বন্দরে চলে এল। কোস্টগার্ডদের অফিস ওখানে। লাইটহাউসের আগের বিল্ডিংটায় ওদের অফিস। ওটার কাছে যেতে হলে মাছের পাইকারি বাজার পেরিয়ে যেতে হয়। সারারাত মাছ ধরে এনে সকাল বেলা বিক্রি করা হয়। লাইটহাউস আর কোস্টগার্ডের অফিসের মাঝখানে ছোট একটা গির্জাও আছে।

বেচাকেনা শেষ হয়ে গেছে বহু আগেই। কিন্তু মাছের গায়ের তীব্র আঁশটে গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে এখনও বাতাসে। ধোয়ামোছা আর পরিষ্কারের কাজ চলছে এখন, তৈরি হচ্ছে আবার পরদিনের জন্যে।

'তোমরা কি দাঁড়াবে এখানে, না কাফেতে গিয়ে বসবে?' দুই সহকারীকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'সবার যাওয়ার দরকার নেই।'

'কাফেতেই যাচ্ছি,' খুশিমনে জবাব দিল মুসা।

'ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আবার ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করছে না এখুনি,' রবিন বলল। 'আমি একটু বরং ঘোরাঘুরি করি।'

'যাও। আমি অফিস থেকে বেরিয়ে কাফেতে যাব। ওখানেই দেখা হবে।'

চত্বরের উল্টোদিকে একটা ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে সাইকেলগুলো শিকল দিয়ে বেঁধে তালা আটকে রেখে তিনজন তিনদিকে রওনা হয়ে গেল। কোস্টগার্ডের অফিসের দিকে এগোল কিশোর। তার উদ্দেশ্য, দ্বীপটা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া।

কয়েক সেকেন্ড উসখুস করে পেছন থেকে ডাক দিল মুসা, 'কিশোর!'

ফিরে তাকাল কিশোর, 'আমি কাফেতে যাচ্ছি না। এখানেই বসি।'

'কেন, কি হলো আবার?'

'এখন আর যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'ঠিক আছে, বসো।'

মাছের বাজারের মুখোমুখি একটা লোহার বেঞ্চ পাতা। তাতে বসে অপেক্ষা করতে লাগল মুসা। লোকের কাজকর্ম, আনাগোনা দেখছে। মাছের গন্ধটা বাদ দিলে খারাপ লাগছে না পরিবেশ। এখানে সেখানে দু'তিনজন করে বসে জটলা করছে জেলেরা। বাজারের এককোণে আরেকটা বেঞ্চের দিকে নজর পড়তেই দৃষ্টি আটকে গেল মুসার। চট করে একটা লোক খবরের কাগজের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ফেলল। মুসার দৃঢ় বিশ্বাস, তার ওপরই চোখ রাখছিল লোকটা।

জেলেদের দেখার ভান করে এরপর একটু পর পরই আড়চোখে লোকটার দিকে তাকাতে লাগল মুসা। চেষ্টা সফল হলো। পত্রিকার ওপর দিয়ে আস্তে করে মুখ বের করল লোকটা। চিনে ফেলল মুসা। সেই স্প্যানিশ লোকটা। কাফেতে ওদের টেবিলের পাশে বসে খাচ্ছিল যে।

অস্বস্তি বোধ করতে লাগল মুসা। ওর ওপরই যে নজর রাখছে, কোন সন্দেহ নেই তাতে। নিশ্চয় শুধু তার একার ওপর নয়, ওদের তিনজন অর্থাৎ তিন গোয়েন্দার ওপরই চরগিরি করছে সে।

কিশোরের আসার অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে রইল মুসা।

অফিসের সিঁড়ি বেয়ে নেমে রাস্তা পার হয়ে কিশোরকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল মুসা। কিশোর কাছে এলে নিচুস্বরে বলল, 'আমাদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে।'

'কে?'

'বাজারের পেছনে বাঁ দিকের বেঞ্চটাতে বসে আছে। খবরের কাগজ পড়ার ভান করছে।'

আস্তে মুখ ফিরিয়ে তাকাল কিশোর। 'কই?'

মুসাও তাকাল। 'আরি! এক মুহূর্ত আগেও তো ছিল। হয়তো বুঝে ফেলেছে তার অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে গেছে। কেটে পড়েছে।'

'চিনতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

সাইকেলগুলো যেখানে আছে সেখানে রেখেই কাফের দিকে রওনা হলো দুজনে। ভেতরে ঢুকে দেখল, রবিন এখনও ফেরেনি। জানালার পাশের টেবিলটা খালি। তাতে গিয়ে বসল ওরা।

'কি জেনে এসেছি, জানো?' উত্তেজনা চাপা দিতে পারছে না কিশোর। 'মোটেও বিপজ্জনক নয় আর দ্বীপটা। একেবারে নিরাপদ। পুরোপুরি জীবাণুমুক্ত করে ফেলা হয়েছে। অফিশিয়ালি জানিয়ে দেয়া হয়েছে এ কথা।'

ওয়েটারকে ডেকে কোক দিতে বলল মুসা। কিশোরের দিকে তাকাল। 'সবাই তাহলে জানে না কেন?'

'জানবে। মিনিস্ট্রি অভ ডিফেন্স দখল করার আগে দ্বীপের একজন মালিক ছিল। তার ছেলে এখন মালিকানা ফিরে পেয়েছে আবার। সে এখন বুড়ো মানুষ, পেয়েই বা আর কি করবে। বিক্রি করে দেয়ার কথাবার্তা হচ্ছে। কোস্টগার্ড জানাল, কে

একজন নাকি কেনার জন্যে যোগাযোগও করেছে মালিকের সঙ্গে। যাক সে-কথা। এ মাসের শেষ দিকে খোলাখুলি ঘোষণা করে জানিয়ে দেয়া হবে দ্বীপটা নিরাপদ।'

'পাহাড়ের চূড়ার নোটিশবোর্ডের কথা কিছু জিজ্ঞেস করেছ?'

'না, তা করিনি, কারণ তার আগেই জানা হয়ে গেছে আরেকটা তথ্য। মূল ভূখণ্ডে কোথায় কোথায় মিনিস্ট্রি অভ ডিফেন্সের সম্পত্তি আছে জিজ্ঞেস করেছি। ওরা বলল, আশেপাশে কোথাও নেই। তারমানে ওই নোটিশবোর্ড ভুয়া।'

'বলো কি!' ওয়েটারকে আসতে দেখে থেমে গেল মুসা। কোকের বোতল নামিয়ে রেখে ওয়েটার চলে গেলে বলল, 'তাহলে তো এখন পুলিশকে জানানো দরকার।'

'জানাব। আরও কিছু তথ্য-প্রমাণ জোগাড় করে নিই।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল কিশোর। 'আরেকটা ইয়ট। দেখেছ?'

'ইয়টের ছড়াছড়ি মনে হচ্ছে এদিকে,' দেখতে দেখতে মুসা বলল।

'হবেই। টুরিস্টরা আসছে।' নামটা পড়ল কিশোর: ভ্যান জিক। কোক খেতে খেতে জাহাজটাকে দেখছে সে, এই সময় মুসা বলল, 'ওই যে, রবিন এসে গেছে।'

মুখ ফিরিয়ে তাকাল কিশোর। রবিন একা নয়। সঙ্গে রয়েছে পিটার আর লুসি। কাছে এসে হাসিমুখে জানাল রাস্তায় দেখা হয়ে গেছে।

আগের দিনের মত একই টেবিল ঘিরে বসল ওরা। বোনের জন্যে চকলেট আর নিজের জন্যে কফির অর্ডার দিল পিটার। রবিনের জন্যে আরেকটা কোক আনতে বলল কিশোর।

'শুনে এলাম,' কিশোর আর মুসার দিকে তাকাল রবিন, 'শহরের শেষ মাথায় একটা ফানফেয়ার হচ্ছে। চড়ার জন্যে সাংঘাতিক সব জিনিস নাকি এসেছে: পাইরেট শিপ, মুনরাইড···। খুদে একটা ডিজনি ওয়ার্ল্ডও নাকি বানিয়েছে। সবাই বলাবলি করছে, দারুণ।'

'সবাই মানে?' ভুরু নাচাল পিটার। 'ওই যে আমাদের পাশের বোট থেকে নেমে যে দুজন লোক কথা বলল তোমার সঙ্গে, ওরা নাকি? তা আমার যেতে আপত্তি নেই।' বোনের দিকে তাকাল, 'লুসি, যাবি?'

মাথা কাত করল লুসি।

মুসা বলল, 'ইংল্যান্ডের ফানফেয়ার দেখিনি কখনও। যাব।'

জানালার বাইরে রাস্তায় দুজন লোককে দেখা গেল। গায়ে সোয়েটার, পরনে জিনস। একজনের গালে একটা গভীর কাটা দাগ। রবিন বলল, 'ওই যে, ওরাই। ভ্যান জিক থেকে নেমেছে।'

রাস্তায় আরেকজন লোকের দিকে এগিয়ে গেল দুজনে। ওদের চেয়ে বয়েস বেশি তৃতীয় লোকটার।

'আরি, ওই তো!' বলে উঠল পিটার। 'এই লোকটাই তো আমাদের এস্টেট এজেন্ট, অ্যানথ্রাক্সের ব্যাপারে আমাদের সাবধান করেছিল যে।'

চেনা চেনা লাগছিল, চিনে ফেলল এখন কিশোর। কুঁচকে গেল ভুরু। 'ক্রেগলি ফক্স!'

'আরে, তাই তো!' রবিন বলল।

'নামও জানো দেখছি,' অবাকই হলো পিটার।

কি যেন বলতে যাচ্ছিল মুসা। তাড়াতাড়ি চোখ টিপে তাকে নিষেধ করল কিশোর। যতক্ষণ চোখের আড়ালে না চলে গেল ততক্ষণ লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল সে।

'খুব আগ্রহ মনে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল পিটার।

'অ্যা!' ফিরে তাকাল কিশোর। 'ভ্যান জিক। হল্যান্ডের জাহাজ।'

'ঠিকই অনুমান করেছ,' হাসল লুসি, 'জাহাজের নাম নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেছ মনে হচ্ছে।'

কিশোরও হাসল, 'ওটা কোন দেশী জানার জন্যে পড়াশোনার প্রয়োজন নেই। ফ্ল্যাগই তো বলে দিচ্ছে কোন দেশী।'

'ও, তাই তো!' লজ্জাই পেল লুসি। 'যার যেখানে বাস, সেটার দিকেই নজর কম। জাহাজে যে ফ্ল্যাগ থাকে, ভুলেই গিয়েছিলাম।'

ছয়

মাইলখানেক দূর থেকে বাজনার শব্দ কানে এল ওদের। ব্যান্ড, পপ সঙ আর নাগরদোলার শব্দ মিলে এক বিচিত্র কোলাহল. তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের কণ্ঠস্বর।

পাইরেট শিপ, ওয়াটার শূট, রাইফেল রেঞ্জ, হুপলা স্টল—কোনটাই বাদ দিল না ওরা। ভাল মজা পাচ্ছে।

ঘণ্টাখানেক বাদে লুসি, পিটার আর রবিনের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল কিশোর আর মুসা; কি ভাবে সরে এল নিজেরাও বলতে পারবে না, সেটা নিয়ে মাথাও ঘামাল না। একটা স্টলে ঢুকে আর্কেড ভিডিও দেখতে দেখতে মুসা বলল, 'নাহ্, এটা ভাল না। চলো বেরোই। এখানে দম নিতে পারছি না।'

'আমার কিন্তু খারাপ লাগছে না,' কিশোর বলল।

মাথা নাড়ল মুসা, 'উঁহু, আমি বেরোব। আমার ভাল লাগছে না।'

অবাক হলো কিশোর। হই-চইকে বিশেষ পরোয়া করে না মুসা। শরীর খারাপ নাকি? ওর মুখের দিকে তাকাল। প্রচুর ঘাম দেখা যাচ্ছে। বোধহয় গরমেই এমন হয়েছে।

আর তর্ক না করে মুসাকে নিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। হল অভ মিররের পাশ ধরে এগোল। অনেক ঠাণ্ডা এখানে।

'এখন কেমন লাগছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

জবাব দিল না মুসা। একটা কাফের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ বলল, 'চলো, আইসক্রীম খাব।'

নাক কুঁচকাল কিশোর। 'আবার? এই কয়েক মিনিট আগে না খেলে?'

'খেতে ইচ্ছে করছে, খাব, অত কথার দরকার কি। এসো না!'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাফেতে ঢুকল কিশোর। অবাক লাগছে ওর। অস্বাভাবিক

আচরণ করছে মুসা। কাফেতে ঢুকতে গিয়েও ঢুকল না সে। দরজার কাছ থেকে ফিরে তাকাল কিশোর। 'কি ব্যাপার? হয়েছে কি তোমার?'

পায়ে পায়ে কাছে এসে দাঁড়াল মুসা। ফিসফিস করে বলল, 'সেই তখন থেকেই পিছু নিয়েছিল একটা লোক। গায়ে নেভি সোয়েটার।'

মুসার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল কিশোর। অনেক লোক। 'কই, নেভি সোয়েটার তো দেখছি না।'

ফিরে তাকাল মুসা। 'আবার ফাঁকি দিল।'

'কোনখান থেকে পিছু নিল?'

'হুপলা স্টল। ওকে ফাঁদে ফেলার জন্যেই তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। এখানে, কাফেতে ঢুকলেই ক্যাঁক করে চেপে ধরতাম। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছে।'

'চেহারা দেখেছ?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'সেই স্প্যানিশটা।'

'পিছু লেগেছে কেন এ ভাবে?' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর।

'নিশ্চয় আমরা কোথায় যাই, কি করি দেখতে চাইছে।'

'তারমানে সন্দেহ করেছে।' দ্রুত কি যেন চিন্তা করে নিল কিশোর। তারপর বলল, 'এসো।'

'কোথায়?'

'হল অভ মিররে ঢুকব।'

ভিড়ের মধ্যে নজর রাখতে লাগল মুসা, কিশোর গেল টিকেট আনতে। টিকেট নিয়ে হাতের ইশারায় মুসাকে ডাকল। ভেতরে ঢুকে পড়ল দুজনে। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল কিশোর, 'কড়া নজর রাখবে।'

কিন্তু দেখা গেল না আর লোকটাকে। বেরোনোর সময় একটা আয়নার মধ্যে লুসির চেহারাটা দেখতে পেল কিশোর। ভুরু কুঁচকে গেল। দুজন লোকের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। ডাচ জাহাজটার নাবিক।

কিশোরকে দেখে হাত তুলে 'হাই' বলে ডাকল লুসি।

কাছে গেল কিশোর।

'কি করছ?' জিজ্ঞেস করল লুসি।

'মজা,' হেসেই জবাব দিল কিশোর।

'তুমি লুসির বন্ধু?' দুজনের মধ্যে লম্বা লোকটা কিশোরকে জিজ্ঞেস করল। ভাল ইংরেজি বলে, কথায় আমেরিকান টান। বয়েস তেইশ-চব্বিশ, মাথা ভর্তি চুল, রোদে পোড়া চামড়া। দেখতে খারাপ না। কিন্তু চোখের দিকে তাকিয়ে গা শিরশির করে উঠল কিশোরের। কথা বলতে ইচ্ছে করল না। আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল কেবল।

সিগারেটে লম্বা টান দিল লোকটা। ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়ল নাকমুখ দিয়ে। সিগারেটটা হাতে বানানো। ধোঁয়ার মধ্যে অদ্ভুত একটা গন্ধ পাচ্ছে কিশোর। হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল তার মগজে, অ্যালার্ম বেল বাজতে শুরু করল।

'রবিন কোথায়? আর তোমার ভাই?' লুসিকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'দেখলাম তো রাইফেল শুটিঙে ব্যস্ত,' লুসি জানাল। 'গুলি করতে খুব পছন্দ করে পিটার। আছে হয়তো এখনও ওখানেই।'

'আমরা যাচ্ছি। যাবে নাকি?'

নাবিক দুজনের দিকে তাকিয়ে দ্বিধা করল লুসি। জিজ্ঞেস করল, 'কাল আসবেন এখানে?'

'না, কাল আর আসতে পারব না,' জবাব দিল লম্বা লোকটার সঙ্গী। 'হল্যান্ডে যেতে হবে।' রহস্যময় ভঙ্গিতে চোখ টিপল সে। 'অনেক টাকার ব্যাপার। দুদিনের মধ্যে ফিরে আসব।'

সতর্ক হয়ে গেল লম্বা লোকটা। সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে নিচুস্বরে ওলন্দাজ ভাষায় কি যেন বলল, বুঝল না কিশোর–মনে হলো সাবধান করল।

নাবিকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, 'আবার দেখা হবে' বলে কিশোর আর মুসার সঙ্গে রওনা হলো লুসি।

শূটিং গ্যালারিতেই পাওয়া গেল রবিন আর পিটারকে।

সাত

পরদিন সকালে আন্টির সঙ্গে বসে নাস্তা সারল তিন গোয়েন্দা। কফি খেয়ে, কাপড় বদলে অফিসে চলে গেলেন আন্টি। আলোচনায় বসল তিনজনে। দিনটা কিভাবে কাটাবে সেই আলোচনা।

কিশোর বলল, 'যে জায়গাটা নিয়ে এত কথা, সেই দ্বীপটাতেই যাওয়া হলো না এখনও। জীবাণু-মুক্ত যেহেতু জানিয়ে দেয়া হয়েছে, যেতে তো আর ভয় নেই। চলো, আজই যাই।'

মুসার কোন আপত্তি নেই। সে একপায়ে খাড়া।

রবিন বলল, 'আজই?'

'এখুনি,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'চলো, কাপড় পাল্টে নেব।'

সাইকেল নিয়ে সোজা বন্দরে চলে এল ওরা। বোট ভাড়ার প্রচুর সাইনবোর্ড আছে। ভিড়ের মধ্যে গেল না। চলে এল একধারে, বেশ খোলামেলা আর নির্জন জায়গায়। বোট নিয়ে কোথায় যাচ্ছে ওরা, লোকের চোখে পড়তে দিতে চায় না। একটা নোটিশ দেখা গেল, বড় বড় লাল অক্ষরে লেখা:

বোট ভাড়া দেয়া হয়

মাছধরা জালের স্তূপে বসে আছে মালিক। ওদের দিকেই নজর।

সাইকেল থেকে নেমে হ্যান্ডেল ধরে ঠেলে নিয়ে এগোল তিন গোয়েন্দা।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'বোট লাগবে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'লাগবে। ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে। বেশি ছোট হলে চলবে না, অন্তত বারো ফুট। সুজুকি আউটবোর্ড ইঞ্জিন হলে ভাল হয়।'

গভীর আগ্রহ নিয়ে তার দিকে তাকাল লোকটা। 'বাহ্, বোট সম্পর্কে ভাল জ্ঞান মনে হচ্ছে। ইঞ্জিনটা কি সাইজের চাও?'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'পাঁচ হর্সপাওয়ারের নিই, কি বলো?'
মাথা কাত করে সম্মতি জানাল মুসা।
'একেবারে সঠিক জিনিসটা বেছেছ,' মৃদু হাসল লোকটা। 'কি করে স্টার্ট করতে হয় জানো নিশ্চয়?'
'জানি,' জবাব দিল মুসা। 'তেলের লাইন অন করে দিয়ে ইঞ্জিনের দড়ি ধরে টান দেব। আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন?'
'করব,' চোখের পাতা সরু হয়ে এল লোকটার, 'এত দামী একটা জিনিস কিছু না জেনে আন্দাজেই ছেড়ে দেব নাকি। বলো দেখি, অল্প পানিতে পড়লে ইঞ্জিনটা কি করবে?'
'কি আশ্চর্য, এটা কোন প্রশ্ন হলো নাকি?' অধৈর্য হয়ে উঠেছে মুসা। 'ইঞ্জিনের পেছনটা উঁচু করে নেব। প্রপেলার পানিতে কামড় বসাতে না পারলে দাঁড় বেয়ে যাব। হয়েছে? আর কোন প্রশ্ন?'
'না,' মাথা নাড়ল লোকটা, 'তোমরা পাস। টাকা দাও, নিয়ে যাও।'
'আপনার বোটে লাইফ-জ্যাকেট আছে? তিনটে জ্যাকেট দেবেন। দাঁড় তো অবশ্যই দেবেন। ট্যাংক ভরে তেল দিন। আর একটা বাড়তি তেলের ক্যান।'
'তোমরা পাকা নাবিক,' কণ্ঠস্বর বদলে গেছে লোকটার, হালকা ভাবটা আর নেই। 'সাইকেলগুলো ওই ওখানে রাখো। তালা ইচ্ছে করলে দিতেও পারো, না দিলে নেই। চুরি হবে না। দাঁড়াও, তোমাদের জিনিসপত্র নিয়ে আসছি।'
উঠে একটা ছোট কাঠের বেড়া দেয়া ঘরের দিকে চলে গেল লোকটা। কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এল প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে। বোটে নিয়ে গিয়ে রাখল সে-সব।
বোটটা খুব পছন্দ হলো তিন গোয়েন্দার, বিশেষ করে মুসার। অভিজ্ঞ হাতে দড়ি টেনে স্টার্ট দিয়ে ফেলল।
জলযানের ভিড় নেই এদিকে। খুব সহজেই বন্দর থেকে বোট বের করে নিয়ে এল মুসা। চমৎকার বাতাস। রবিনের লম্বা চুলগুলো উড়ে উড়ে এসে মুখের একপাশে বাড়ি মারছে। সাগর মোটামুটি শান্ত। গলুইয়ের নিচে বোটের তলায় ঠাস ঠাস করে বাড়ি মারছে ঢেউগুলো। এত জোরে শব্দ হচ্ছে, মনে হচ্ছে ভেঙে যাবে। আসলে কিছুই হলো না। এরচেয়ে অনেক শক্তিশালী ঢেউয়ের আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা আছে এ সব বোটের।
উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে রবিন বলল, 'ফ্রেমলির শহরটা যেমনই হোক, সাগরটা কিন্তু খুব সুন্দর। আরও আগেই সাগরে নামা উচিত ছিল আমাদের। এখান থেকে ডাঙার সব কিছু অন্য রকম লাগছে, দেখো।'
কি যেন চিন্তা করছে কিশোর। চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল, 'হুঁ। পিটারদের জাহাজটাকে কিন্তু দেখলাম না আজ। চলে গেল নাকি?'
'তাই তো!' রবিন বলল, 'এটা তো খেয়াল করিনি। বোট খোঁজা নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিলাম···যাবে আর কোথায়? এসেছে বেড়াতে। কোনদিকে ঘুরতে গেছে হয়তো।'
মুসা মোটামুটি চুপচাপ। হাল ধরে তাকিয়ে আছে দ্বীপটার দিকে। কাছাকাছি

পৌঁছে ভিড়ানোর জায়গা খুঁজতে লাগল। ফ্রেম বাইটের দিকে মুখ করে থাকা দিকটায় অসম্ভব খাড়া উঠে গেছে পাথরের দেয়াল। চূড়ার ওপরে অসংখ্য পাখির বাসা। গোড়ায় সগর্জনে আছড়ে পড়ে অনবরত সাদা ফেনা সৃষ্টি করে চলেছে প্রবল ঢেউ।

দ্বীপটা এখন জীবাণু-মুক্ত জানা সত্ত্বেও যুদ্ধের সময়কার পুরানো সাইনবোর্ডটা দেখে বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল কিশোরের। লেখা রয়েছে:

সরকারী সম্পত্তি
গবেষণা চলছে
ভয়ানক বিপজ্জনক অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু
ছড়িয়ে আছে ভূমিতে, বাতাসে
জনসাধারণের জন্যে দ্বীপে নামা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

কেঁপে উঠল রবিন, 'এতক্ষণে বুঝলাম কেউ আসতে চায় না কেন এদিকে।'

হঠাৎ করেই বাতাসটা অতিরিক্ত শীতল মনে হলো। আকাশের নীল রঙ আগের চেয়ে মলিন।

'আর বেশি কাছে যেতে পারছি না,' মুসা জানাল। 'কি করব, কিশোর?'

'ভেড়ানোর জায়গা কোথাও না কোথাও নিশ্চয় রয়েছে,' কিশোর জবাব দিল। 'দ্বীপের কিনার ধরে ঘুরতে থাকো। দরকার হয় পুরো দ্বীপটা চক্কর দিয়ে এসো।'

এক জায়গায় পাহাড়ের গা থেকে মাটি খাবলে তুলে নিয়েছে যেন কোন দানব। দু'দিকে ধারাল দুটো খাড়া স্তম্ভের মত দেয়াল। মাঝের ফাঁকটায় বোট ঢোকানো সম্ভব। স্তম্ভ দুটোর চূড়া থেকে পানি ছুঁই ছুঁই করে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে মস্ত একটা ক্যামোফ্লেজ নেট।

নীরব বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দা। অবশেষে কিশোর বলল, 'ভালমত খেয়াল না করলে দেখতেই পেতাম না।'

'কি ওটা? এ ভাবে জাল ঝুলানোর মানে?' রবিনের প্রশ্ন।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বোট বা জাহাজ লুকানোর জন্যে পাহাড়ের এ ধরনের খাঁজকে বেছে নেয়া হতো। সামনে ক্যামোফ্লেজ নেট ঝুলিয়ে দিয়ে ভেতরে লুকিয়ে রাখা হতো জাহাজ।'

'কিন্তু এই জালটা তো যুদ্ধের সময়কার বলে মনে হচ্ছে না। নতুন।'

'সেটাই তো ভাবছি। এখন জাহাজ লুকানোর প্রয়োজন পড়ল কার?'

দ্বীপের কিনার ধরে ছুটে চলেছে বোট। ধীরে ধীরে কমে এল পাহাড়ের উচ্চতা। একটা জায়গায় দেখা গেল একেবারেই সমান, পানির সমতলের সামান্য ওপরে। বালিতে ঢাকা সৈকত। পুরানো কাঠের একটা জেটি আছে। মেরামত করা হয়েছে ইদানীং, বোঝা যায়।

'ভেড়ানো যাবে,' মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'কি বলো?'

জেটিতে বোট বেঁধে ডাঙায় নামল ওরা।

আট

কেমন ভুতুড়ে লাগছে দ্বীপটাকে। থমথমে নীরবতা। যেন নিদারুণ বিষাদে ভরা।

সৈকত ধরে হেঁটে চলল ওরা। বালি পেরিয়ে, নুড়ি মাড়িয়ে ক্রমশ উঠে যেতে লাগল ওপর দিকে। ঘাসের সীমানা যেখান থেকে শুরু, রাস্তাটার মুখও ওখানেই। কারও মুখে কথা নেই। চোয়াল দৃঢ়বদ্ধ। পেশিগুলো সব টানটান।

দ্বীপের ভেতর দিকে ঢুকে গেছে রাস্তাটা। দুই ধারে বেনাবন। পথের সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেছে ঢাল বেয়ে। হারিয়ে গেছে দূরে। দৃশ্যটা কল্পনা করতে হয়তো ভালই লাগে, কিন্তু চোখের সামনে দেখে কেন যেন মোটেও ভাল লাগছে না ওদের। কোথাও একটা পাখি বা জন্তু-জানোয়ারের চিহ্নও নেই এখানে। দেয়ালের চূড়ায় এত যে পাখি দেখে এসেছে, তার কোনটাই আসছে না এদিকে।

গায়ে কাঁটা দিল মুসার। 'আমার ভাল্লাগছে না।'

'আমারও না,' শান্তকণ্ঠে স্বীকার করল কিশোর। 'এক কাজ করতে পারো। তোমরা দুজন গিয়ে নৌকায় বসো। চট করে ঘুরে দেখে আসি আমি।'

মাথা নাড়ল মুসা, 'না, এসেছি যখন, যাব। দিনের বেলা ভূতে কি করবে!'

'এখানে আবার ভূত দেখলে কোথায়?' ফিরে তাকাল রবিন। 'মানুষই নেই, তার আবার ভূত।'

'মানুষ নেই তো কি হয়েছে, জীবাণু ছিল। জীবন্ত অবস্থায়ই ওগুলো ছিল ভূতের বাপ, মরে গিয়ে নিশ্চয় নানা-দাদা বা আরও ওপরের স্তরের কোন পূর্বপুরুষ হয়েছে।'

মুসার কথায় না হেসে পারল না কিশোর আর রবিন। থমথমে পরিস্থিতিটা সামান্য হলেও হালকা হলো।

কিছুদূরে দুটো জেলের কুটির দেখা গেল। চালা নেই এখন। আগুনে পুড়ে কালো হয়ে আছে দেয়াল। জানালা-দরজার ফোকরগুলো মড়ার খুলির শূন্য কোটরের মত তাকিয়ে রয়েছে সাগর আর আকাশের দিকে। চিড় ধরা মেঝের ফাঁকে গজিয়ে উঠেছে ঘাস। ঠিকমত আলো-বাতাস না পাওয়ায় বিবর্ণ, বিকৃত।

ঢাল বেয়ে পাহাড়ের ওপর দিকে উঠে চলল তিন গোয়েন্দা। চূড়ায় পৌঁছে দেখল, অন্যপাশে একটা পাহাড়ে ঘেরা উপত্যকা মোটামুটি স্বাভাবিক লাগছে এ জায়গাটা, যদিও পঞ্চাশ বছর ধরে পরিত্যক্ত। দশ-বারোটা কটেজমত বাড়ি রয়েছে, ভাঙাচোরা, ধ্বংসপ্রাপ্ত। কোনমতে খাড়া হয়ে রয়েছে এখনও কিছু দেয়ালের ধ্বংসাবশেষ। কিছু আছে আবার বেশ ভাল অবস্থায়।

রাস্তার তেমাথা দেখা গেল একটা, বোধহয় গাঁয়ের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এক সময়। ধ্বংসাবশেষের একধারে একটা খুদে গির্জা। চূড়া থেকে নেমে যাওয়া রাস্তা ধরে গাঁয়ের দিকে হেঁটে চলল তিন গোয়েন্দা।

আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে রবিন বলল, 'এগারোটা কটেজ, তারমানে কম করে হলেও তিরিশজন মানুষের বাস ছিল এখানে। ভাবছি, তাদের কি হয়েছিল?'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'বাড়িঘর তো সহজে ছেড়ে যেতে চায় না

মানুষ। এখানে নিশ্চয় জন্মও হয়েছিল ওদের কারও কারও। নিশ্চয় চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল ওদের।...সে যাকগে, ওসব দার্শনিক তত্ত্ব বাদ দিয়ে যেটা করতে এসেছি সেটা করি। খুঁজে দেখা যাক ভেতরে কিছু আছে নাকি। একসাথে থেকে খুঁজব? না আলাদা আলাদা?'

'একসাথে, একসাথে!' মুসা বলল। 'আমি বাপু এখানে আলাদা হতে পারব না! জীবাণুর ভূতের সঙ্গে মানুষের ভূত...না বাবা, আমি একা হওয়ার মধ্যে নেই!'

হাসল কিশোর, 'ঠিক আছে, একসঙ্গেই থাকা যাক।'

সামনে প্রথম যে কটেজটা পড়ল, সেটার দরজায় ঠেলা দিল কিশোর। গরম লাগল। আশ্চর্য! থাকে নাকি কেউ? ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালানোর চিহ্ন দেখা গেল। জানালার ধারে রাখা একটা চেয়ার আর একটা টেবিল। একধারে একটা ক্যাম্প-বেড। তার ওপরে রাখা একটা স্লীপিং-ব্যাগ। খালি একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর স্তূপ করে ফেলে রাখা কিছু জামা-কাপড় আর মেঝেতে একটা ব্যাকপ্যাক। উত্তেজনা যেন সশব্দ গুঞ্জন তুলে নেমে গেল ওর শিরদাঁড়া বেয়ে।

কটেজের দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে পাশের কটেজটা দেখিয়ে রবিনকে বলল কিশোর, 'ওটার ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখে এসো তো।'

দরজায় ঠেলা দিতে প্রথমটার মত খুলে গেল এটাও। ভেতরে তাকিয়ে চিৎকার করে জানাল রবিন, 'আরে এ তো গুদাম! সব রকমের জিনিস আছে। এর পরেরটা দেখব নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

দেখল রবিন। ওখান থেকেই জানাল, 'এখানে আছে একটা পোর্টেবল জেনারেটর। আলো আছে, শক্তিশালী আলো। লাল আর সবুজ ফিল্টার আছে। আঙিনায় দেয়াল ঘেঁষে রাখা একটা পিকআপ ট্রাক। ওশনদের বাড়ির গাড়িটার মত।'

জ্যান্ত মানুষ বসবাসের নমুনা দেখে উধাও হয়ে গেল ভূতের ভয়। কিশোরের আগেই কটেজটার দিকে দৌড় দিল মুসা।

ঘরের মধ্যে আরও একটা জিনিস আবিষ্কার করল ওরা। তেপায়ায় বসানো একটা টেলিস্কোপ।

খুব খুশি কিশোর। কষ্ট করে ওদের এখানে আসা সার্থক। রবিনকে বলল, 'এসেই সেদিন যে আলোর ঝিলিক দেখেছিলে, এই টেলিস্কোপের। রোদে কাঁচ লেগেছিল।'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'তারমানে মূল ভূখণ্ডের দিকে নজর রেখেছিল কেউ।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ।...আলোর রঙের ব্যাপারটাও বুঝে গেছি এখন। ট্র্যাফিক সিগন্যালের মানেটা ব্যবহার করছে ওরা এখানে। সবুজ দেখিয়ে বোঝাতে চায়, রাস্তা পরিষ্কার। আসতে পারো, কিংবা যেতে পারো, কিংবা চলাচল করতে পারো। লাল দিয়ে বোঝায়, থামো।'

'আর সাদা?' মুসার প্রশ্ন।

'দুটোর মাঝের বিরতি। কিংবা ফুলস্টপ বোঝানো হয় সাদা দিয়ে। সেদিন যে দেখলাম সবুজ আর লাল আলো, তার মানে—দ্বীপ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

বেরোনোটা কি নিরাপদ? জবাব গিয়েছিল মূল ভূখণ্ড থেকে তিনবার সবুজে: নিরাপদ! নিরাপদ! নিরাপদ! তারপর দীর্ঘ সাদা আলো। তারমানে ওভার অ্যান্ড আউট।'

'কিন্তু কি মানে এ সবের? কেন করছে?'

'অপরাধ যে করছে তাতে কোন সন্দেহই নেই। কি অপরাধ, সেটাও মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছি। শিওর হয়ে নিই, তারপর বলব। দেখি খুঁজে, আরও কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

মাঝের কটেজটায় ফিরে এল ওরা, যেটাকে গুদাম বলেছে রবিন। বেশির ভাগই সাধারণ জিনিস—চিনি, মাখন, রুটি, আলু এ সব। এক কোণে কয়েকটা গাঁইট দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওদের। বেশি বড় না। খড়ের গাঁইটের সমান। দড়ি দিয়ে বাঁধা। সবুজের ওপর গোল রঙের লাল চিহ্ন দেয়া গাঁইটগুলোতে।

'কি আছে এর মধ্যে?' মুসার প্রশ্ন।

'একটা ছুরি হলে খুলে দেখা যেত,' মুসা বলল। 'খুঁজলে ছুরি পাওয়া যাবে।'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'উঁহু, খোলা উচিত হবে না। একবার খুললে আর এ রকম করে বাঁধা যাবে না। বুঝে ফেলবে ওরা, কেউ খুলেছিল। সাবধান হয়ে যাবে। আমরা যে দেখে ফেলেছি, এখন জানতে দিতে চাই না ওদের।'

সবগুলো কটেজে তল্লাশি চালাল ওরা। কিন্তু জরুরী সূত্র হতে পারে, এমন আর কিছু পাওয়া গেল না। শোবার ঘরগুলো সেঁতসেঁতে, আসবাবপত্র নেই। প্রথম যে ঘরটা দেখেছে, চেয়ার-টেবিলওয়ালা, সেটা বাদে আর কোনটাতেই মনে হলো না লোক থাকে আজকাল।

ফিরে এসে আবার গুদামটায় ঢুকল ওরা। গাঁইটের মত বান্ডিলগুলোর দিকে নজর দিল। ঝাঁকি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কিশোর, ভেতরে কি আছে। কিন্তু ফাঁপা মনে হলো না, ভেতরটা নিরেট, যা-ই আছে ঠাসাঠাসি করে বাঁধা।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কি হতে পারে, সন্দেহ তোমার?'

'অস্ত্র হলে এত ঠাসাঠাসি করে রাখতে পারত না, ঝাঁকি দিলে শব্দ হতই। বান্ডিলগুলো যে সাইজের তাতে ছোট অস্ত্র ভরে রাখা সম্ভব, রাইফেল-বন্দুকের মত বড় জিনিস নয়। তাহলে আরও লম্বা হত এগুলো।'

মাথা নেড়ে মুসা বলল, 'অস্ত্র হলেই যে শব্দ হবে, এটা ঠিক নয়। যদি খড় পেঁচিয়ে ভরে রাখে? সিনেমায় দেখেছি জাহাজে করে অস্ত্র পাচার করার সময় এ ভাবেই কাস্টমসকে ফাঁকি দেয় চোরাচালানীরা।'

'তা দেয়,' মুসার কথা মেনে নিতে পারছে না কিশোর, 'কিন্তু এই এলাকায় অস্ত্র পাচার করতে আসবে কেন ওরা? এখানে কোন বিদ্রোহ নেই, দলাদলির ব্যাপার নেই, জোর করে সিংহাসন দখল করতে চায় না কেউ…'

'ড্রাগস!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'ড্রাগস। আমারও ঠিক এই সন্দেহটাই হচ্ছে।'

অস্বস্তি বোধ করতে লাগল রবিন। চোরাচালানীদের আড্ডা সব সময়ই ভয়ঙ্কর হয়। বাধা পেলে মরিয়া হয়ে ওঠে। যে কোন অপরাধ, এমনকি মানুষ খুন করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না।

'কিশোর,' বলল সে, 'পাহারাদার লোকটা দ্বীপে আছে না বাইরে, জানি না।

জিনিসপত্র আছে যখন, যেখানে যাক ফিরে আসবেই। আর কি দেখব? চলো, সময় থাকতে কেটে পড়ি।'

'এক মিনিট,' হাত তুলল কিশোর, 'দাঁড়াও। আরেকটা জিনিস দেখে নিই।'

জানালার কাছে রাখা টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল সে। কাছে যেতে তামাকের গন্ধ পেল। তার সঙ্গে অন্য একটা গন্ধের মিশ্রণ। টেবিলের ওপরে কিছু নেই। একটামাত্র ড্রয়ার। টান দিয়ে খুলল। একটা অ্যাশট্রে, একটা লাইটার আর এক প্যাকেট সিগারেট পেপার দেখা গেল। কাগজ দিয়ে বানিয়ে রাখা হয়েছে দু'তিনটে সিগারেট। তুলে নিয়ে শুঁকতে লাগল কিশোর। উজ্জ্বল হলো চেহারা। মাথা দুলিয়ে বলল, 'হুঁ, যা অনুমান করেছিলাম, তাই। ভাং!'

আরও একটা জিনিস পাওয়া গেল ড্রয়ারে। ভাঁজ করা একটা ম্যাপ। ভাঁজ খুলতে আরও একটা কাগজ বেরোল সেটা থেকে। মাসিক টাইড-টেবল্। মাসের কোনদিন কোনদিন জোয়ারের পানি অতিরিক্ত উঁচু হবে সেটা দেখানো রয়েছে হলুদ দাগ দিয়ে। এ মাসের শেষ দিনটা হলো আগামী পরশু।

আর ম্যাপটা এই দ্বীপের। চারপাশে সাগর। সাগরের এক জায়গায় লাল ক্রস দেয়া। দ্বীপ থেকে সিকি মাইল দূরে।

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে কিশোরের মুখ। জিনিসগুলো সব আবার আগের জায়গায় রেখে দিতে দিতে বলল, 'এতটা সফল হব, ভাবতেও পারিনি। আর কিছু দেখার নেই। চলো, এবার কেটে পড়া যাক।'

নয়

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল ওদের। দেখে, তৈরি হয়ে বসে আছেন এনিড আন্টি। বললেন, 'আজ তোদের বাইরে কোথাও খাওয়াব। কি খেতে চাস?'

'খাঁটি ইংলিশ,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল মুসা।

হাসলেন আন্টি। 'তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাওগে।'

খেয়েদেয়ে ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হলো। সোজা বেডরুমে চলে গেলেন আন্টি। তিন গোয়েন্দা এসে ঢুকল মুসার শোবার ঘরে। অনেক রাত পর্যন্ত নজর রাখল। কিন্তু আলো দেখা গেল না। দ্বীপ থেকেও না, মূল ভূখণ্ড থেকেও না।

পরদিন আকাশ এতটা খারাপ হয়ে রইল, কুয়াশা আর বৃষ্টি, ঘর থেকেই বেরোতে পারল না ওরা।

তার পরদিন আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। সকালে আন্টি জানালেন, বার্মিংহামে যেতে হবে তাঁকে জরুরী কাজে। ফিরতে ফিরতে মাঝরাত হয়ে যাবে। ওরা যেন ওদের ইচ্ছেমত খেয়ে নেয়।

নাস্তার পর আলোচনায় বসল ওরা, কি করা যায়?

কিশোর বলল, 'দ্বীপটা দেখা হয়েছে। এখন মূল ভূখণ্ডে আলোর সঙ্কেত যেদিকে দেখা গেছে সেদিকে একবার খুঁজে দেখা দরকার।'

'তারমানে বাইটের দিকে?' রবিনের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ,' এক মুহূর্ত থামল কিশোর। 'তা ছাড়া মিসেস হ্যারল্ডের সঙ্গেও একবার কথা বলা দরকার।'

আঁতকে উঠল মুসা, 'বাপরে বাপ, যে মহিলার মহিলা! আমি ওর সামনে যেতে পারব না।'

'কেন, গরুকে পিটায় বলে তোমাকেও পিটাবে নাকি?'

'বিশ্বাস কি? মহিলার মেজাজ-মর্জি মোটেও ভাল ঠেকেনি আমার। আন্টির কাছে শুনে আমি ভেবেছিলাম, বুড়ো, অথর্ব মানুষ। চোখেও দেখে না ভালমত। কানেও শোনে না। কি বলতে কি বলে...কিন্তু এ যে জোয়ান ব্যাটাছেলের বাপ!'

'চলোই না দেখি। খারাপের সঙ্গে খারাপ। আমরা তো আর তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে যাচ্ছি না। এনিড আন্টির নাম বললে নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করবেন।' খানিকক্ষণ কি চিন্তা করল কিশোর। 'এক কাজ করা যেতে পারে, সবার একসঙ্গে যাবার দরকার নেই। আমার অনুমান ঠিক হলে, আজ রাতে মাল খালাসের ব্যবস্থা করবে ওরা। কারণ জোয়ারের পানি উঁচু হওয়ার আজই শেষ দিন। পানি নেমে গেলে বোট ভেড়াতে পারবে না জায়গামত, মালও খালাস করতে পারবে না। সুতরাং, হাতে আমাদের সময় কম। রবিন, তুমি ক্যামেরা নিয়ে গুহাটার দিকে চলে যাও। ঘাপটি মেরে বসে থাকবে কোথাও। দেখবে, অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে কিনা। পড়লে ছবি তুলে নেবে। আমি আর মুসা যাচ্ছি হ্যারল্ড ফার্মে। মিসেস হ্যারল্ডের সঙ্গে কথা সেরে গুহার কাছে যাব। ওখানেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

সাইকেল নিয়ে বেরোল ওরা। ফার্মের কাছে এসে কিশোর বলল, 'রবিন, তুমি এবার যাও। যে ভাবে যা বললাম, ঠিক ঠিক মত কোরো। আর, সাবধান থেকো। একা কোন বড় ঝুঁকি নিতে যেয়ো না।'

'নেব না। দেখা হবে,' বলে সামনের দিকে এগিয়ে চলল রবিন।

কিশোর আর মুসা মুখ ঘোরাল ফার্মের দিকে। কাছাকাছি আসতে বাতাসে গোবর আর খামারের পরিচিত অন্যান্য গন্ধ যুক্ত হয়ে নাকে এসে ধাক্কা মারতে লাগল।

সামনে আর আশেপাশে কড়া নজর রাখতে রাখতে চলেছে কিশোর।

অস্বস্তি বোধ করছে মুসা। 'কিশোর, আমি ভাই ওই মহিলার মুখোমুখি হতে পারব না। তুমি কথা বোলো। আমি আশেপাশে সূত্র খুঁজে বেড়াব।'

'দূর, কি যে বলো না তুমি। সূত্র খুঁজবে, ভাল কথা, কিন্তু মহিলাকে এত ভয় কেন?'

'কি জানি! আমার ভাল লাগছে না।'

'আচ্ছা, চলোই না দেখি, কি হয়। তোমার কথা বলা লাগবে না। আমিই বলব।'

গেটের ভেতরে ঢুকে সাইকেল দুটো কটেজের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে সামনের দরজার দিকে এগোল দুজনে।

ঘণ্টা বাজাতে দরজা খুলে দিল সেই মহিলা, যাকে সেদিন গরু নিয়ে যেতে দেখেছিল। ভুরু কুঁচকে তাকাল। বয়েসের কারণে এমনিতে অনেক কুঁচকে গেছে চামড়া, ফলে ভুরু কুঁচকানোটা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর লাগল মুসার কাছে, রীতিমত

ডাইনী মনে হলো। কিশোরের পেছনে সরে গেল সে।

'হালো,' কিশোর বলল, 'মিসেস হ্যারন্ডের সঙ্গে দেখা করা যাবে?'

'আমিই মিসেস হ্যারল্ড,' কাটা কাটা জবাব। 'কি চাও?'

'আমরা একটু ঘুরে দেখতে চাই,' মহিলার ভাব-ভঙ্গিতে কিশোরও থতমত খেয়ে গেল। তবে সামলে নিতে দেরি হলো না। 'এস্টেট এজেন্টের কাছ থেকে এসেছি আমরা। তাঁর সহকারী। তিনি আমাদের পাঠিয়েছেন ঘুরে দেখে যেতে।'

'কোন্ এজেন্ট?'

'আপনার এজেন্ট। আপনার এজেন্ট তো এখন একজনই আছেন, তাই না? মিস এনিড মিলফোর্ড।'

ভুরু আরও অনেকখানি কুঁচকে গেল মিসেস হ্যারল্ডের। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। তারপর সরে জায়গা করে দিল, 'এসো, ভেতরে এসো।'

করুণ দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে যেন তার ভয়, ডাইনী ওদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে তুকতাক করবে।

ওরা ঢুকলে দরজাটা আবার লাগিয়ে দিল মহিলা। পুরানো ধাঁচের একটা লিভিং-রুম। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। একটা ম্যানট্‌লপীসে রাখা ছবি আর শো-পীস। তার ওপরে বড় একটা আয়না, তবে দাগ পড়ে গেছে এখন। খোদাই করা ধাতব ফ্রেম, খুব সুন্দর অলঙ্করণ। চেয়ার, টেবিল, সোফা সব পুরানো; তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আর চমৎকার পালিশ করা। ঘরের আবহটা বেশ আরামপ্রদ।

'তোমরা বসো,' মিসেস হ্যারল্ড বললেন, 'আমি হ্যারিকে ডেকে দিচ্ছি।'

আমরা আপনার সঙ্গেই কথা বলতে এসেছি—কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারল না কিশোর, তার আগেই চলে গেল মহিলা।

'এই হ্যারিটা আবার কে?' কিশোরের দিকে কাত হয়ে ফিসফিস করে বলল মুসা।

'আসুক। দেখব। জানতেই তো এসেছি। সব না জেনে আজ যাব না।'

আচমকা ঝটকা দিয়ে খুলে গেল রান্নাঘরের দরজা। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে একজন লোক। সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল কিশোর। সেই গালকাটা লোকটা, যাকে সেদিন বন্দরে দেখেছিল।

এ লোক এখানে কি করছে!

দশ

গুহাটার কাছে পৌঁছে গেল রবিন। প্রথম সমস্যা, সাইকেলটা লুকাবে কোথায়? এটা চোখে পড়ে গেলেই সতর্ক হয়ে যাবে শত্রু। সে নিজে লুকিয়ে থাকলেও আর কোন লাভ হবে না। সাইকেল দেখলেই ওরা বুঝে যাবে, কাছাকাছি কেউ রয়েছে। সুতরাং কোনমতেই অন্য কারও চোখে পড়া চলবে না। তা ছাড়া লুকাতে হবে এমন জায়গায়, যাতে প্রয়োজন পড়লেই লাফ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি ওটা নিয়ে ছুট

দিতে পারে।

এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে দুটো সিলভার বার্চ গাছের নিচে ঘন ঝোপ চোখে পড়ল। একই জায়গায় এমন করে গজিয়েছে গাছ দুটো, ইংরেজি 'ভি' অক্ষরের মত হয়ে আছে। মাঝখানের ফাঁকে, ঝোপের মধ্যে এনে সাইকেলটা খাড়া করে ঢোকাল সে। পিছিয়ে গিয়ে দেখতে লাগল চোখে পড়ে কিনা। না, পড়ে না। ওটা যে আছে ওখানে, জানা না থাকলে সহজে দেখতে পাবে না কেউ।

খানিকক্ষণ পাহাড়ের ওপর বসে থেকে বিরক্ত হয়ে গেল রবিন। কিছুই ঘটছে না। অস্বাভাবিক কিছুও চোখে পড়ছে না। হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় ঢুকতেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হনহন করে হেঁটে চলে এল বাইট কুনারের কাছে।

বেড়া দেয়া সীমানার বাইরে এসে দাঁড়াল সে। গলা লম্বা করে উঁকি দিল। কুকুরটা বা দুই ভাইয়ের কাউকে চোখে পড়ল না।

বাড়িটার অন্যপাশে রয়েছে যান-বাহনগুলো। গ্যারেজের বাঁ দিকে দেখতে পেল পিক-আপ ট্রাকটা, যেটার কেবিনের ছাতে সার্চলাইট বসানো ছিল। লাইটটা এখন নেই! পেছনে দেখা গেল ছোট ট্রেলারটা, তেরপল দিয়ে ঢাকা।

গ্যারেজের দিকে নজর ফেরাল সে। জরাজীর্ণ ঘরটা থেকে আগের মতই নাক বের করে রেখেছে একটা গাড়ি, জানালার কাঁচ রঙিন। আরও দুটো গাড়ি আছে—একটা কার, একটা ভ্যান—কোনটাই জরুরী নয়, তাই ওগুলোর দিকে বিশেষ নজর দিল না সে। তার নজর পিক-আপটার দিকে। ভালমত পরীক্ষা করে দেখতে হবে। দাগটাগ থাকলে ছবি তুলে নিতে হবে।

বেড়া ডিঙাবে? ডিঙানোটা হয়তো কঠিন হবে না, কিন্তু ভেতরে অতিরিক্ত খোলা জায়গা। কুকুরটা যদি টের পেয়ে যায়? সে-সম্ভাবনাই বেশি। ভয়ানক জানোয়ার। দুইটা মিনিটও টিকবে না ওটার সঙ্গে লাগতে গেলে। নাহ্, এদিক দিয়ে ঢোকা ঠিক হবে না। তারচেয়ে বেড়ার ধার ধরে ঘুরে ঘুরে গ্যারেজের পেছনে চলে যাওয়াটা নিরাপদ মনে হলো তার কাছে।

বেড়ার ধার ধরে এসে বনে ঢুকল সে। পাহাড়ের চূড়ার সমান্তরাল হয়ে গেছে এখানে বেড়া। সাবধান-বাণী লেখা নোটিশ বোর্ডটা আজ আবার দেখতে পেল। কিন্তু সাদা রঙ করে ঢেকে দেয়া হয়েছে মিনিস্ট্রি অভ ডিফেন্সের নামটা। অবাক কাণ্ড। একদিন থাকে তো একদিন থাকে না। রঙ করে নাম ঢাকার জন্যেই তুলে নিয়ে গিয়েছিল নাকি?

বোর্ডটার ছবি তুলল সে। কাজে লাগতে পারে।

যেখান থেকে গুহাটা দেখেছিল সেদিন, সেখানে পৌঁছে গেল। ঢাল বেয়ে গুহায় নামা সম্ভব এদিক থেকে। জায়গাটার ছবি তুলল। উত্তেজনার বুদবুদগুলো ধীরে ধীরে ফুটতে আরম্ভ করল যেন রক্তের মধ্যে। কিশোর যখন বলেছিল তাকে ওদের সঙ্গে খামারে যাওয়ার দরকার নেই, একঘেয়ে লাগবে ভেবে একটু নিরাশই হয়েছিল; কিন্তু কেটে গেছে সেটা এখন। দারুণ উত্তেজনা। বুঝতে পারছে, এসেই বরং ভাল করেছে।

এগিয়ে চলল সে। চূড়ার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করে সরে গেল বেড়াটা। কোথায় আছে দেখার জন্যে কাছে গিয়ে উঁকি দিল ভেতরে। ভাল জায়গা। কিন্তু বাড়িটার

অতিরিক্ত কাছে। জানালা দিয়ে কেউ নজর রেখে থাকলে ও ঢুকতে গেলেই দেখে ফেলবে। বড় একটা ওক গাছ দেখতে পেল। ডালাপাতাগুলো ছড়িয়ে আছে নিচের দিকে, মাটি ছুঁই ছুঁই অবস্থা। ওগুলোর ভেতর দিয়ে নজর এড়িয়ে এটাতে চড়া যেতে পারে।

ক্যামেরাটা অ্যানোরাকের পকেটে ঢুকিয়ে রেখে গাছটার কাছে এসে দাঁড়াল সে। কেউ তাকিয়ে আছে কিনা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে নিয়ে উঠতে শুরু করল গাছ বেয়ে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা মোটা ডালে উঠে বসল, যেটা ওর ভার সইতে পারবে। বাড়িটার দিকে তাকাল। শব্দ বা নড়াচড়া কোন কিছুই চোখে পড়ল না। ওকে কেউ দেখতে পেল কিনা সেটাও বুঝতে পারল না। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল চুপচাপ। এখনও আগের মতই অবস্থা, মানুষের নড়াচড়াও নেই, কুকুরটাও নেই। ধীরে ধীরে নেমে আসতে শুরু করল আবার। মাটি ছুঁয়ে থাকা ডালগুলোর ভেতর দিয়ে নেমে এল মাটিতে। পা টিপে টিপে এগোল গ্যারেজটার দিকে।

পিক-আপটাই তার লক্ষ্য। ড্রাইভারের পাশের উইং পরীক্ষা করে দেখল। সমস্ত বডির রঙের তুলনায় এখানকার রঙ সামান্য অন্য রকম। ভাল করে না দেখলে বোঝা যায় না। আঙুল বুলিয়ে দেখল ওখানটাতে। অনুভূতিটা স্পষ্ট। মসৃণ নয় মোটেও, বরং অতিরিক্ত খসখসে। দোমড়ানো জায়গাটা সমান করে নতুন রঙ করা হয়েছে—বুঝতে বিশেষজ্ঞের দরকার পড়ে না। তিনটা ছবি নিল সে: একটা নম্বর প্লেটের, আর দুটো মেরামত করা জায়গাটার ক্লোজ-আপ। প্রমাণের জন্যে।

সার্চলাইটটা ট্রেলারের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে কিনা দেখবে ভাবছে, এই সময় কানে এল কণ্ঠস্বর। এতটাই চমকে গেল, কি ভাবে যে বোতামে আঙুলের চাপ লেগে গেল বলতেও পারবে না। ক্লিক করে উঠল শাটার। পাক খেয়ে লোকটার দিকে ঘুরে গেল সে। শার্ক ওশন দাঁড়িয়ে আছে। চোখে অবিশ্বাস আর রাগ।

এগারো

'কেন ঢুকেছ?' গর্জে উঠল শার্ক।

ভোঁতা হয়ে গেছে যেন রবিনের মগজ। ঢোক গিলল কেবল। বুকের মধ্যে এতটাই দুপদাপ করতে লাগল হৃৎপিণ্ড, শব্দটা স্পষ্ট কানে আসছে মনে হলো।

'দশ মিনিট ধরে চোখ রাখছি তোমার ওপর,' শার্ক বলল, 'বুঝতে পারছিলাম কোন একটা শয়তানির মতলবে এসেছ। এখন তো দেখি ঠিকই। কিন্তু শয়তানিটা কি, সেটা বুঝতে পারছি না। কি করছ? সত্যি জবাব দেবে বলে দিলাম!'

দুই হাত আড়াআড়ি বুকের ওপর রেখে দাঁড়াল সে—যেন যে ভাবেই হোক সত্যি কথাটা আদায় করে ছাড়বে, চাপ লেগে কুস্তিগীরদের মত ফুলে উঠল পেশি। কিন্তু ভঙ্গিটাকে কেন যেন হুমকি ভাবতে পারল না রবিন। বরং আচরণে কিছুটা নরম ভাবই প্রকাশ পাচ্ছে। এক ধরনের ভদ্রতা, যেটা তার ভাই ব্যারাকুডার মধ্যে একদম নেই।

'ছবি তুলছিলাম,' দুর্বল কণ্ঠে জবাব দিল রবিন।

'সে তো দেখলামই। কেন?'

সত্যি কথাটা বলার সিদ্ধান্ত নিল রবিন। মিথ্যে বলে বোঝাতে পারবে না, অকারণ বিপদ বাড়াবে আরও। 'আমি...আমরা–কিশোর, আমি আর মুসা সন্দেহ করছি, ওই সাদা পিক-আপটা দিয়ে খুনের চেষ্টা করা হয়েছিল আমাদের।'

ওকে অবাক করে দিয়ে একপাশে মাথা হেলিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল শার্ক। 'খুন? কে তোমাদের খুন করতে যাবে?'

মাথা সোজা করে দাঁড়াল রবিন। শার্কের আচরণে ভয় অনেকটা কেটে গেছে। 'আপনি বিশ্বাস করছেন না। সেদিন যখন আপনাদের বাড়ি থেকে যাচ্ছিলাম, কুয়াশার মধ্যে এ রকম একটা গাড়ি আমাদের খাদে ঠেলে ফেলে মারতে চেয়েছিল।'

'কুয়াশার মধ্যে এ রকম ভুল হতেই পারে,' গুরুত্বই দিল না শার্ক। 'না দেখে কত অ্যাক্সিডেন্ট হয় এ রকম। পুলিশে রিপোর্ট করেছিলে?'

'করেছি।'

'তারা কি বলল?'

'আপনার মতই গুরুত্ব দেয়নি।'

'দেবে না, জানি। এক রকম দেখতে বলেই কি আমার গাড়িটাকে সন্দেহ করছ?'

'আপনার গাড়ি এটা?'

'রেজিস্ট্রেশন আমার নামেই করা হয়েছে, তবে আমি চালাই না। ব্যারাকুডাই চালায়।'

'মিস্টার ওশন, বিশ্বাস করুন, এনিড আন্টির সঙ্গে সেদিন যখন বাড়ি ফিরছিলাম আমরা, এই গাড়িটা দিয়েই ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল আমাদের। আমি শিওর!'

রবিনের দৃঢ়তা অবাক করল শার্ককে। অস্বস্তি ফুটল চোখে। 'এত শিওর হচ্ছ কি করে?'

শার্কের আচরণ সাহস বাড়িয়ে দিল রবিনের। গাড়িটার কাছে গিয়ে ড্রাইভারের পাশের উইঙে আঙুল রেখে বলল, 'এখানে হাত বুলিয়ে দেখুন। মেরামত করা হয়েছিল বোঝা যায়। রঙটাও দেখুন এসে ভালমত। আরেক রকম।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রবিনের দিকে তাকিয়ে থেকে শার্ক বলল, 'দেখার দরকার নেই আমার, তুমি ঠিকই বলেছ, জানি আমি। সেদিনই গ্যারেজ থেকে গাড়িটা মেরামত করিয়ে আনা হয়েছে। তবে তোমাদের ধাক্কা দেয়ার কারণে ক্ষতিটা হয়েছিল, এটা জানতাম না। অন্য গল্প শোনানো হয়েছে আমাকে। যাই হোক, আমার ভাইকে জিজ্ঞেস করব আমি ভালমত। আর কিছু বলবে?'

ভারি শ্বাস নিল রবিন। সন্দেহ নিরসনের এ রকম সুযোগ আর আসবে না। কারণ তার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে আছে শার্ক।

'আপনি কি জানেন, মিস্টার ওশন,' ফস করে মুখ দিয়ে প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল যেন রবিনের, 'আপনার ভাই ড্রাগ চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত?'

কালো হয়ে গেল শার্কের মুখ মুহূর্তে। রবিনের মনে হলো, তাকে মেরে বসবে

শার্ক। পিছিয়ে গেল এক পা।

'কি করে জানলে তুমি বুঝতে পারছি না,' চাপা গর্জন বেরোল যেন শার্কের কণ্ঠ থেকে। 'বহু বছর আগে সে আর ক্রেগলি ফক্স যখন কলেজে পড়ত, ড্রাগের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল দুজনে। কিন্তু সে-সব তো গেছে। এখন আর ওসব নেশা নেই ওদের। বিশ্বাস করো।'

এটা একটা খবর বটে রবিনের কাছে—কলেজে তাহলে একসঙ্গে পড়ত ব্যারাকুডা আর ফক্স! অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেল। কিশোর আর মুসাকে শোনানোর জন্যে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল।

শার্কের জন্যে মায়াই লাগছে। ছোট ভাইকে ভালবাসে লোকটা, বোঝা যায়। তাকে বিশ্বাস করে। বাকি কথা বলে তার মনে দুঃখ দিতে ইচ্ছে হলো না আর রবিনের।

'সরি,' বলল সে, 'দুঃখ পাবেন জানলে কথাটা তুলতাম না। চলি। আমার দুই বন্ধু আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

গেট পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিল শার্ক। সাইকেলটা কোথায় রেখে এসেছে বলল না রবিন।

রাস্তায় বেরিয়ে সোজা হাঁটা দিল হ্যারল্ডদের খামারের দিকে। ভীষণ উত্তেজিত। শুনে আসা তথ্যগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে মগজে।

ফার্মের গেটের কাছে এসে ভেতরে উঁকি দিল। সাইকেলগুলো আছে দেখলে বুঝতে হবে কিশোররা দুজনও আছে। যদি না থাকে, তাহলে গুহার ওপরের পাহাড় চূড়ায় চলে গেছে।

সাইকেল নেই। সুতরাং পাহাড়ের চূড়ায় চলে এল রবিন। ওখানেও দেখল না মুসা বা কিশোরকে। ওদের নাম ধরে জোরে জোরে ডাকল। এলোমেলো বয়ে গেল দামাল হাওয়া, কেউ সাড়া দিল না। ঠাণ্ডা লাগতে আরম্ভ করেছে তার। গুহার মধ্যে ঢুকল না তো ওরা? নেমে দেখে আসবে নাকি? কিন্তু একা একা এখন অচেনা গুহায় ঢুকতে ইচ্ছে করল না ওর।

সাইকেলগুলো কি অন্য কোথাও রাখল?

আবার ফার্মে ফিরে এল সে। ভেতরে ঢুকে দরজার ঘণ্টা বাজাল। দরজা খুলে দিল সেই মহিলা।

'হাই,' হাসি দিয়ে বলল রবিন, 'চিনতে পারছেন?'

মাথা নাড়ল মহিলা।

'সেদিন গরু নিয়ে চরাতে যাচ্ছিলেন যখন, আমরা সাইকেলে করে যাচ্ছিলাম।...যাকগে। আমি এসেছি আমার বন্ধুদের খুঁজতে। ওরা ফার্ম দেখতে এসেছিল। দেখা শেষ করেছে? বলল শেষ হলে বাইটে যাবে আমার কাছে। কিন্তু যায়নি।'

আবার মাথা নাড়ল মহিলা। 'কই না, দেখিনি ওদের। দেখলে কি আর ঘুরে দেখতে দিতাম। কি ভেবেছ জায়গাটাকে, ন্যাশনাল পার্ক?'

দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল মহিলা।

রবিনের মনে হলো কষে এক থাপ্পড় মারল। যাওয়ার জন্যে ঘুরতে গিয়েও

থমকে দাঁড়াল। একটা লাল জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার। এগিয়ে গেল পায়ে পায়ে। একটা ফ্লাওয়ার বেডের মধ্যে পড়ে আছে জিনিসটা। কিশোরের লাল কভার লাগানো নোটবুক।

ও, তারমানে এসেছিল ওরা ঠিকই। মহিলা মিথ্যে কথা বলেছে।

নোটবুকটা তুলে নিয়ে পকেটে ভরল রবিন। বেরিয়ে এল রাস্তায়। সৈকতের দিকে হাঁটতে শুরু করল। ভাবনাগুলো যেন ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করেছে মনের মধ্যে।

খামারবাড়িটা পেরোনোর সময় চোখের কোণে একটা নড়াচড়া লক্ষ করল সে। একটা ছাউনি থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। থামল। তারপর সরে গেল বেড়ার আড়ালে। এক পলকের দেখা। কিন্তু এর মধ্যেই গালের কাটা দাগটা দেখে ফেলেছে রবিন।

দেখেও না দেখার ভান করে একনাগাড়ে হেঁটে গেল সে। ভাবনাগুলো এখন আরও জোরাল হয়ে পাক খেয়ে ফিরতে লাগল মনের মধ্যে। কাটা দাগওয়ালা এই খামারে কি করছে? ও কি তাকে চিনতে পেরেছে? মুসা আর কিশোরের কি হলো? গালকাটাকে দেখে ঘাপটি মেরে রয়েছে কোথাও? সে কি করে দেখতে চাইছে? নাকি কোন বিপদ হলো ওদের?

মনে পড়ল নোটবুকটার কথা। ফুলের বেডের মধ্যে ফেলে যাবে কেন কিশোর? পকেট থেকে পড়ে গেছে এ কথাও বিশ্বাস করতে পারছে না।

পথের শেষ মাথায় পৌঁছল রবিন। শক্ত ঘাস আর ছোট ছোট বালির ঢিবি এখানে। জেটিটার কাছে গিয়ে খানিক সরে এসে ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল সে। ফিরে তাকাল কেউ অনুসরণ করে এসেছে কিনা দেখার জন্যে। আসেনি। ঝোপঝাড় আর গাছের আড়ালে আড়ালে ফিরে চলল আবার খামারের দিকে।

এটাতে বাইট কুনারের মত অত গাছপালা নেই, লুকানোর জায়গা কম। সীমানা ঘিরে টিন বা কাঠের শক্ত বেড়া নেই, দেয়ালও নেই; আছে শুধু কাঁটাতারের বেড়া, মাঝখানে বিরাট বিরাট ফাঁক। সহজেই ভেতরে ঢুকে পড়া যাবে।

মূল বাড়িটা বাদে আর ক'টা বাড়ি আছে দেখল। বড় বড় দুটো গোলা, লম্বা একটা একতলা বিল্ডিং—নিশ্চয় ওটা গোয়াল, আর দুটো ছোট ছোট ছাউনি। যা খুশি হতে পারে ওগুলো। কোন্ বাড়িটাতে রাখা হয়েছে মুসা আর কিশোরকে?

বারো

লিভিং-রুমে মুসা আর কিশোরকে দেখে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল গালকাটার। পরক্ষণে কঠিন হাসি ফুটল মুখে। 'আমি জানতাম, আসবে তোমরা। কপালে মরণ লেখা থাকলে আর খণ্ডায় কে!'

'মিসেস হ্যারল্ডের সঙ্গে দেখা করতে এসেছ, তাই না?' দরজায় দাঁড়ানো মহিলাকে দেখাল গালকাটা, 'কিন্তু দুঃখের বিষয়, ও মিসেস হ্যারল্ড নয়।'

'সে তো বুঝতেই পেরেছি,' কিশোর বলল। 'এই সন্দেহটা হয়েছিল বলেই দেখা করতে এসেছিলাম।' মহিলার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল, 'কিন্তু কদ্দিন

মানুষকে ধোঁকা দিয়ে অভিনয় চালিয়ে যেতে পারবেন?'

'যতদিন আমাদের কাজ না শেষ হয়,' জবাব দিল গালকাটা। 'এই দুই নম্বর মিসেস হ্যারল্ড ফার্মটা বেচে দেবে খুব অল্প দামে। অবাক হচ্ছ? হওয়ারই কথা। চুক্তিপত্র আর দলিল রেডি করছে ক্রেগলি ফক্স। দলিলে সই করবে আমাদের এই দ্বিতীয় মিসেস হ্যারল্ড।'

'আসল মিসেস হ্যারল্ড যখন ব্যাপারটা জানতে পারবেন, তিনি কি চুপ করে থাকবেন ভেবেছেন?' কিশোর বলল।

'তাঁর অবস্থা এখন বড়ই করুণ,' হাসিমুখে বলল গালকাটা। 'তিনি মনেই করতে পারবেন না কোনটাতে সই দিয়েছেন আর কোনটাতে দেননি।'

'জাল সই যদি ধরা পড়ে?'

'সইটা এতটাই নিখুঁত হবে কেউ সন্দেহই করবে না।'

'অ,' কেটে পড়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে কিশোর। লোকটার মতে মতে কথা বলে বেরিয়ে যেতে চাইল। 'তাহলে তো সব পাকাই করে ফেলেছেন। আপনারাই জিতলেন। এসো, মুসা, যাই।'

'আরে না না, যাবে কোথায়?' চোখের পলকে ঘর পার হয়ে সামনে চলে এল গালকাটা। পিস্তল বেরিয়ে এল হাতে। 'চুপ করে বসে থাকো।'

আদেশ মানতে বাধ্য হলো দুই গোয়েন্দা।

মহিলাকে বলল গালকাটা, 'যাও তো, দড়ি নিয়ে এসো। বাঁধো এদের।'

বেরিয়ে গেল মহিলা। দরজা আটকে একটা চেয়ারে বসে পড়ল গালকাটা। পিস্তলটা আলতোভাবে ফেলে রাখল কোলের ওপর। তবে হাতে ধরা রয়েছে। তুলে নিয়ে গুলি করতে একটা সেকেন্ডও লাগবে না।

দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মগজে। মুক্তির উপায় খুঁজছে। বুঝতে পারছে কোন কথা বলেই আর ধোঁকা দিতে পারবে না লোকটাকে। একমাত্র ভরসা রবিন। ও কি করছে এখন?

দড়ি নিয়ে ফিরে এল মহিলা। দক্ষ হাতে কষে বেঁধে ফেলল মুসা আর কিশোরের হাত-পা। সামান্যতম নড়ার ক্ষমতা রইল না আর দুজনের। মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে চিৎকারের পথও রুদ্ধ করে দিল।

'সাইকেল দুটো নিয়ে গিয়ে গোয়ালে রেখে দাও আপাতত,' হুকুম দিল গালকাটা।

'এদের কি করবে?' মাথা নেড়ে ছেলেদের দেখাল মহিলা।

'আজকের জন্যে চিলেকোঠাতেই থাক। কাল ছোট্ট একটা ভ্রমণ, বোটে করে,' নিজের রসিকতায় নিজেই মজা পেয়ে হেসে উঠল। 'এ উপকূলে সাঁতার কাটতে গিয়ে বহু ডুবে মরার ঘটনা ঘটেছে। ও রকম কোন দুর্ঘটনায় পড়বে এরাও।'

গলা শুকিয়ে যাচ্ছে কিশোরের। এমন করে মুখের মধ্যে কাপড় ঠেসে দেয়া হয়েছে, দম নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। তারমানে সত্যি সত্যি ওদের খুন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে লোকটা!

জানালা দিয়ে দেখতে পেল, বাগানের ওপর দিয়ে সাইকেল দুটো ঠেলে নিয়ে গরুর ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে মহিলা। একসঙ্গে দুটো সাইকেল ঠেলা কঠিন কাজ।

হ্যান্ডেল ছুটে গেল একটার। কাত হয়ে পড়ে গেল ঘাসের ওপর। চিৎকার করে পুরুষের পক্ষে মানানসই গাল দিতে দিতে তুলে নিল আবার।

ভেতরে ভেতরে দমে যাচ্ছে কিশোর। সাইকেল দুটোও সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। রবিন এসে সাইকেল না দেখলে কিছুই বুঝতে পারবে না আর। ধরে নেবে, ওরা বেরিয়ে চলে গেছে।

সাইকেল রেখে ফিরে এল মহিলা। প্রথমে কিশোরের পায়ের বাঁধন ঢিল করে দিল, কিন্তু দড়িটা রেখে দিল এমন ভাবে যাতে হাঁটতে পারলেও পা বেশি ফাঁক করতে না পারে কিশোর। তারপর ঢিল করল মুসারটা। চেয়ার থেকে উঠে এসে ওদের উঠতে বলল গালকাটা।

পিঠে পিস্তলের গুঁতো মারতে মারতে ওদের সিঁড়ির কাছে নিয়ে এল সে। সরু একটা করিডর ধরে এগোল। দু'ধারে দরজা। বেডরুম হবে ওগুলো, ভাবল কিশোর। কোনদিকে যাচ্ছে, কোন্‌টা সামনের দিক, আর কোন্‌টা পেছন মনে রাখার চেষ্টা করল।

একটা দরজা পেরোনোর সময় ভেতর থেকে দুর্বল কণ্ঠ ভেসে এল, 'হ্যারি, তোমরা যাচ্ছ? হ্যারি?'

থমকে দাঁড়াল কিশোর। পেছন থেকে পিঠে প্রচণ্ড খোঁচা মারল গালকাটা। ব্যথায় চোখমুখ কুঁচকে ফেলল কিশোর। দরজার দিকে ফিরে জবাব দিল গালকাটা, 'আসছি, মিসেস হ্যারল্ড। এক মিনিট।'

ও, তাহলে এই ঘরেই রয়েছেন আসল মিসেস হ্যারল্ড, বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোরের। কোন্ ঘরটা, চিহ্ন রাখল সে—দরজার উল্টো দিকে করিডরে একটা বাতি আছে।

খাটো একটা কাঠের সিঁড়ির কাছে নিয়ে আসা হলো ওদের। সেটা বেয়ে উঠে সামনে একটা দরজা। ভেতরে ঠেলে দিল ওদের গালকাটা। ঘরটার ঢালু ছাত। ভাপসা গন্ধ।

'এদের দিকে খেয়াল রেখো,' মহিলাকে বলল গালকাটা। 'আমি দেখে আসিগে বুড়িটা ঘ্যানঘ্যান করছে কেন।' সজোরে দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল সে।

ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল কিশোর। বহু পুরানো নানা রকম জিনিসপত্রে ঠাসা। তার মধ্যে রয়েছে পিঠে বসে দোল খাওয়ার জন্যে কাঠের একটা খেলনা ঘোড়া, গোটা দুই কাঠের আলমারি, আর মরচে পড়া র‍্যাকে গাদা গাদা বই ও পুরানো ম্যাগাজিন।

একধারে ফেলে রাখা হয়েছে একটা উইং চেয়ার—হাতল ছিঁড়ে গদির তুলো বেরিয়ে আছে, আর একটা বিছানা—ছেঁড়া ম্যাট্রেসের অর্ধেকটাই মেঝেতে লুটাচ্ছে। এককালে চাকরদের ঘর হিসেবে ব্যবহার হত ঘরটা, বোঝা গেল। হাত-মুখ ধোয়ার একটা স্ট্যান্ড এবং তাতে একটা জগও রয়েছে।

একটা বুদ্ধি খেলে গেল কিশোরের মাথায়। মেঝেতে পা ঠুকতে শুরু করল জোরে জোরে।

'অ্যাই, থামো!' ধমক শোনা গেল বাইরে থেকে।

কিন্তু থামল না কিশোর।

ঘরে ঢুকল মহিলা।

ইঙ্গিতে মুখের কাপড়টা খুলে দিতে বলল কিশোর। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। বেরিয়ে আসবে যেন। ভঙ্গি দেখে মনে হলো খুব যেন অস্বস্তি বোধ করছে সে।

কিছু একটা বলতে চাইছে ও, বুঝতে পেরে মুখের কাপড়টা খুলে দিল মহিলা।

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'পায়খানায় যাব!'

'আরে, মড়া!' খেঁকিয়ে উঠল মহিলা। 'এখন আবার ওসবের দরকার পড়ল!'

'জলদি করুন!'

দ্বিধায় পড়ে গেল মহিলা। 'আমি তোমাকে ছাড়তে পারব না। হ্যারি আসুক।'

'ও আসবে কখন! আমি তো আর পারছি না…'

'পারতে হবে!' মুখে আবার কাপড়টা গুঁজে দিল মহিলা। আগের চেয়ে শক্ত করে।

দূরে টেলিফোনের শব্দ শোনা গেল। কান পাতল মহিলা। যেন এ ধরনের কোন কিছুরই অপেক্ষা করছিল।

ফিরে এল গালকাটা। মেজাজ ভীষণ খারাপ। 'ক্রেগলি ফক্স!' কর্কশ কণ্ঠে জানাল সে। 'দলিলে সই করার সময় হয়ার বুড়োটা নাকি সামনে থাকতে চাইছে। এ বাড়ির বুড়িকে চেনে সে। তারমানে বুড়ির জায়গায় তোমাকে আর ব্যবহার করা যাচ্ছে না। সই তো করানো যাবেই না।'

'তাহলে?'

'দেখা যাক, কি করা যায়। ব্যবস্থা তো একটা করতেই হবে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল হ্যারি। 'বুড়ি আমাকে খুব বিশ্বাস করে। বার বার বলে, আমাকে ছাড়া চলতেই পারত না সে, মহা অসুবিধায় পড়ে যেত। আমার প্রতিটি কথা বিশ্বাস করে। যখন বললাম, পশু ডাক্তার বলেছে দ্বীপের অ্যানথ্রাক্স জীবাণুর কারণে ভেড়াগুলো মারা যাচ্ছে, কি রাগটা যে রাগল। মিনিস্ট্রি অভ ডিফেন্সকে হুমকি দিয়ে একটা চিঠিই লিখে ফেলল। আমাকে বলল পোস্ট করে দিতে। বাইরে এনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।' হাসল সে। নাক দিয়ে খোঁত-খোঁত শব্দ বেরোল।

গোঁ-গোঁ করে উঠল কিশোর।

'এটার আবার কি হলো?' বুড়ো আঙুল দিয়ে ওকে দেখিয়ে মহিলাকে জিজ্ঞেস করল হ্যারি।

'পায়খানায় যাবে।'

'হবে না!' ধমকে উঠল হ্যারি। পরে বোধহয় ভাবল, ধমক দিয়ে তো আর 'প্রকৃতির ডাক' বন্ধ করা যায় না, কোনও অঘটন ঘটিয়ে ফেললে সাফ করা নিয়ে শেষে নিজেরাই পড়বে বিপদে। বলল, 'ঠিক আছে, নিয়ে যাও বাথরুমে।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বলল, 'কোন রকম চালাকির চেষ্টা করলে ভাল হবে না বলে দিলাম।'

চোখ ঘুরিয়ে মাথা নেড়ে বোঝাল কিশোর, করবে না। এমন ভঙ্গি করছে যেন তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে।

বাথরুমে গিয়ে আবার মুখের কাপড়টা খুলে দিতে ইশারা করল কিশোর। খুলে দিল মহিলা। অধৈর্য কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'আবার কি?'

'হাত যে বাঁধা। কি ভাবে কি করব?'

এমন ভঙ্গি করল মহিলা, যেন গোলানো তেঁতুল ঢেলে দেয়া হয়েছে মুখের মধ্যে। বাঁধন খুলে দিয়ে বলল, 'যাও। বাইরে আছি আমি। বেশি দেরি করবে না।'

বাথরুমের দরজাটা ভেতর থেকে আটকে দিয়ে আর একটা মুহূর্ত দেরি করল না কিশোর। পকেট থেকে নোটবুক আর বলপেন বের করে লিখতে শুরু করল:

গালকাটা হ্যারি এখানে চিলেকোঠায়
আটকে রেখেছে আমাদের
—কিশোর।

'আই, তোমার হলো?' দরজার বাইরে থেকে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল মহিলা।

'হয়ে গেছে, আরেকটু,' জবাব দিল কিশোর। আস্তে করে ঠেলে ফাঁক করল খুদে জানালাটার পাল্লা। সেখান দিয়ে হাত বের করে নোটবুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে। কোথায় গিয়ে পড়বে জানে না। তবে অনুমানে বোঝা যাচ্ছে, চিলেকোঠার এই জানালাটা বাড়ির সামনের দিকেই হবে। হয়তো বাগানে পড়বে নোটবুক। যেখানেই পড়ুক, রবিনের চোখে এটা না পড়লে কোন আশা নেই। তার আগেই যদি অন্য কারও চোখে পড়ে যায়, সরিয়ে ফেলে, তাহলে তো ভরসা একেবারেই শেষ। ভেবে লাভ নেই। ওর যেটুকু করার করেছে।

আবার শোনা গেল মহিলার চিৎকার, 'আরে, এত দেরি করছ কেন?'

তেরো

কমোডের পানি ছেড়ে দিয়ে দরজা খুলে দিল কিশোর। সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল হাত দুটো। এটা আরেকটা চালাকি। বেঁধে দিল মহিলা। ভুলে গেছে, আগের বার পিছমোড়া করে বেঁধেছিল। গিঁট দেয়ার সময় হাত দুটো টানটান করে রাখল কিশোর। মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে ওকে ঘরে নিয়ে এল মহিলা।

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত হ্যারি। যেন বোঝার চেষ্টা করছে কোন চালাকি করে এসেছে কিনা ছেলেটা। ভয় পাচ্ছে কিশোর, হাত যে সামনের দিকে বাঁধা এটা না খেয়াল করে বসে হ্যারি। মুখের ভঙ্গি একেবারে নিরীহ করে রাখল সে।

ধমকে উঠল হ্যারি, 'যাও, চুপচাপ বসে থাকো ওখানে। আর কোন শয়তানির চিন্তা যেন মাথায় না ঢোকে...'

'পায়খানা করতে যাওয়া শয়তানি নয়,' খুব নিরীহ স্বরে জবাব দিল কিশোর। 'আপনি পায়খানা করেন না?'

'চুউপ! এই, বাধো তো, বাঁধো দুটোকে! পিঠে পিঠে লাগিয়ে। যেন নড়তেও না পারে। আমাকে তো চেনে না, বদমাশি ওদের আমি বের করে ছাড়ব। কিছু করলেই আমাকে ডাকবে। আর শোনো,' মহিলাকে বলল হ্যারি, 'ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর

ফক্স আসবে।…এ ঘরের দরজায় তালা দিয়ে রাখো। বলা যায় না…' কথাটা শেষ করল না সে।

কি বুঝল মহিলা কে জানে। মাথা ঝাঁকাল।

চলে গেল হ্যারি। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল ক্রমশ। ধাক্কা দিয়ে বিছানায় মুসার পাশে কিশোরকে ফেলে দিল মহিলা। ছোট শরীর হলে কি হবে, গায়ে অসম্ভব জোর। মুসা আর কিশোরকে পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে বসতে বলে পেঁচিয়ে বাধতে শুরু করল। চিৎকার দিয়ে উঠল কিশোর। থমকে গেল মহিলা। ব্যথা পাচ্ছে মনে করে ঢিল করে দিল সামান্য।

মনে মনে হাসল মুসা। কিশোর যে অভিনয় করছে, বুঝে গেছে। কোনও একটা বুদ্ধি নিশ্চয় বের করে ফেলেছে সে। মহিলা তো আর জানে না, কার পাল্লায় পড়েছে। সময় হলেই বুঝবে। কিশোরের বাথরুমে যাওয়া দেখেই দুশ্চিন্তা অনেকখানি কমে গেছে মুসার।

মহিলা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কব্জি টানাটানি শুরু করে দিল কিশোর। চামড়ায় কেটে বসছে দড়ি। ব্যথা লাগছে। কিন্তু থামল না সে। বাঁধার সময় হাত টানটান করে রাখাতে গিঁটটা শক্ত হয়নি। টানাটানি করতে করতে বাঁধন ঠিকই ঢিলে করে ফেলল। তবে তার জন্যে প্রচণ্ড ব্যথাও সহ্য করতে হলো। চামড়া ছিলে গেছে। রক্ত বেরোচ্ছে এক জায়গায়।

ওসব দেখা কিংবা ভাবার সময় নেই এখন। সুযোগ একবারই পেয়েছে, দ্বিতীয়বার আর পাবে না। হাতের বাঁধন খুলে ফেলার পর বাকিগুলো খোলা আর কোন ব্যাপারই হলো না।

মুসাকেও যখন মুক্ত করে ছাড়ল, অতি মূল্যবান বিশটা মিনিট পার হয়ে গেছে। বাঁধনের জায়গাগুলো ডলে ডলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে লাগল মুসা। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'কার বদমাশি কে বের করে–সুযোগ পেলেই হয় একবার, দেখে নেব আমি!'

'থাক, এখন ওসব কথা বাদ!' সাবধান করল কিশোর। ফিসফিস করে কথা বলছে। 'প্লাইউড দিয়ে দেয়াল তৈরি করেছে। পেরেক দিয়ে আটকে দিয়েছে তক্তাগুলোকে। কোনও একটাকে খুলে ফেলতে পারলেই বাকিগুলো খোলা সহজ।'

আলগা তক্তার খোঁজে সারা ঘরের দেয়াল পরীক্ষা করে দেখতে লাগল দুজনে। কিন্তু কোনটাই নড়ল না। যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে, কিশোরের হাত খুঁজে পেল একটা তক্তা। মুসাকে ইশারা করল, 'এদিকে এসো!'

আঙুলের মাথার চামড়া কেটে রক্ত বের করে ফেলে, একাধিক নখ ভেঙে, প্রচুর কায়দা-কসরত আর শক্তি খরচ করে দুজনে খুলে নিয়ে এল অবশেষে তক্তাটাকে। অন্যপাশে অন্ধকার। মাঝখানে ফোকর যেটা হয়েছে, সেটা গলে চলে যাওয়া সম্ভব। মুসাকে বলল, 'তুমি এখানে থাকো। আমি দেখে আসি কি আছে। আমি ঢুকে গেলে তক্তাটা আবার দাঁড় করিয়ে দেবে এখানে। কেউ যদি আসে এর মধ্যে, সোজা চাঁদি ফাটাবে, কোন কথা নেই।'

একটা কাজের মত কাজ পেয়ে গিয়ে খুশিতে ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল মুসার ঘরের মৃদু আলোতেও ঝিক করে উঠল ঝকঝকে সাদা দাঁত। চাঁদি ফাটানোর মত

একটা উপযুক্ত জিনিসের খোঁজে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে শুরু করল তার দৃষ্টি।

ফোকর গলে অন্যপাশে চলে এল কিশোর। মুসা তক্তাটা যথাস্থানে লাগিয়ে দিতেই গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। চোখে অন্ধকার সইয়ে নিতে চাইছে। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না। তারপর ধীরে ধীরে চোখের সামনে ফুটে উঠল ফাঁকা জায়গাটুকুর অবয়ব। মাঝখানে ফাঁক খুব সামান্যই। আসল দেয়ালের সঙ্গে দূরত্ব রেখে প্লাইউডের আরেকটা দেয়াল তৈরি করা হয়েছে। মূল দেয়ালটা ঢেকে দেয়া হয়েছে পুরু কার্পেট দিয়ে। এ ভাবে তৈরি করার উদ্দেশ্য, তাপ আটকানো। প্রচণ্ড শীতের সময়ও যাতে ঘর ঠাণ্ডা না হয়, সে-জন্যে।

সরু প্যাসেজের মত জায়গাটা দিয়ে এগিয়ে চলল সে। শেষ মাথায় গিয়ে পায়ে হোঁচট লাগল। একটা ট্র্যাপ-ডোর। সময়ে সময়ে ঢুকে দেয়ালের কার্পেট মেরামতের জন্যে রাখা হয়েছে দরজাটা। বসে পড়ে সাবধানে ট্র্যাপ-ডোরের কিনার ধরে টান দিল, যাতে শব্দ না হয়। নিচে কি আছে জানে না।

দুজন লোকের কণ্ঠ কানে এল। একজন বলল, 'বুড়ো হয়ারকে না এনে কি পারা যেত না?'

জবাব শোনা গেল, 'না যেত না। অফিস ডায়ারিটা দেখে ফেলেছে সে। যেই জানল, আমি মিসেস হ্যারল্ডের এখানে আসছি, নিজেও সঙ্গে আসার জন্যে চাপাচাপি শুরু করল। আমি বেশি বাধা দিতে গেলে, করে বসবে সন্দেহ। আমার বিশ্বাস, জোয়ান বয়েসে আন্তরিকতাটা বেশ গাঢ়ই ছিল বুড়ো-বুড়ির। বহুকাল কোন যোগাযোগ রাখতে পারেনি। এ সুযোগ হাতছাড়া করতে কোনমতেই রাজি নয় বুড়ো।'

ক্রেগলি ফক্স কথা বলছে, অনুমান করতে পারল কিশোর। কিন্তু অন্য লোকটা কে? হ্যারির গলা বলে মনে হলো না। দরজাটা আরেকটু উঁচু করে দেখবে নাকি?

'তারমানে এলিনাকে আর মিসেস হ্যারল্ড বলে চালানো যাচ্ছে না? আগে থেকেই বুড়োকে বলে নিয়ে আসতে পারো, যে এত বছরে চেহারা-সুরৎ অনেক বদলে গেছে মিসেস হ্যারল্ডের।'

'নাহ্,' ক্রেগলি জবাব দিল, 'এতটা ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। যতই বদলাক, বুড়ো হয়ার মিসেস হ্যারল্ডকে চিনবে না, এ হতেই পারে না। কোনভাবে যদি একবার সন্দেহ করে বসে, আমাদের দ্বীপে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, ড্রাগের ব্যবসা খতম। বুড়ো মনে করেছে, সত্যি সত্যি তার ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারি বানানোয় সাহায্য করার জন্যে ঘন ঘন দ্বীপে যাতায়াত করি আমি। বোকা ছাগল! খেয়েদেয়ে আর কাজ পেলাম না আমি, কতগুলো বেহুদা পাখি বাঁচাতে যাই।'

আরেকটা প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেল কিশোর। দ্বীপটা কে কিনতে যাচ্ছেন, নতুন মালিক কে, বুঝে গেল। কোস্টগার্ডরা তাহলে মিস্টার ডেভিড হয়ারের কথাই বলেছে। দ্বীপটা কিনে নিচ্ছেন ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারি করার জন্যে। আর তাতে ফক্সের গোষ্ঠীর জন্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে সুবর্ণ সুযোগ। চুটিয়ে বেআইনী ভাবে মাদকের ব্যবসা করছে ওরা।

'কিন্তু হ্যারিকে নিয়ে কি করা যায়, বলো তো?' অন্য লোকটা বলল। 'ওকে আমি মোটেও বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'না করার তো কিছু দেখছি না আমি। বাজারে ছাগল-ভেড়া বেচতে নিয়ে যাওয়া একটা লরির দিকে কেউ নজর দেবে না, সন্দেহও করবে না কিছু। সহজেই পশু চালান দেয়ার আড়ালে মাল চালান দিয়ে আসতে পারবে হ্যারি। ওকে আর এই ফার্মের গাড়িটা আমাদের দরকার। তোমাদের স্ক্র্যাপইয়ার্ডের গাড়ির চেয়ে ওরটা কম সন্দেহজনক।...তবে এমন কিছু যদি করে বসে হ্যারি–বিপদ হতে পারে আমাদের, তোমার চোখে পড়ে থাকে, তাহলে আলাদা কথা। ব্যবস্থা নিতেই হবে।'

'তোমাদের স্ক্র্যাপইয়ার্ড' শুনেই বুঝে ফেলল কিশোর, অন্য লোকটা কে। গলাটাও চেনা চেনা লাগছিল। অন্য লোকটা শার্ক ওশনের ভাই ব্যারাকুডা ওশন।

'তা তো হলো,' ব্যারাকুডা বলল, 'বুড়িটার সমস্যার কি হবে সেটা আগে বলো।'

'এটা সত্যি সমস্যা,' ফগ্ বলল। 'দেখি, কি করা যায়!'

'আমি উঠি,' ব্যারাকুডা বলল। 'তাড়াতাড়ি গুহায় গিয়ে মালগুলো সরানোর বন্দোবস্ত করি। জোয়ার আসতে দেরি নেই, পানি ঢুকে যাবে সুড়ঙ্গে।'

'যাও। ও হ্যাঁ, হ্যারিকে বলে রেখো, হয়ার বুড়োটা এলে যেন প্রথমেই ওকে বুড়ির সামনে না নিয়ে আগে ভালমত গিলিয়ে নেয়। বুড়িটাকে ঘুমের বড়ি বেশি করে খাওয়াতে হবে, আর বুড়োটাকে হুইস্কি। অনেক কিছু সামাল দেয়া যাবে তাহলে।'

'হ্যাঁ, বুদ্ধিটা মন্দ না।' হাসি শোনা গেল ব্যারাকুডার।

ধীরে ধীরে মিলিয়ে এল কথার শব্দ। দরজা লাগানোর শব্দ হলো। অপেক্ষা করছে কিশোর। লোকগুলো আর ফিরে আসে নাকি দেখছে। তারপর ট্র্যাপ-ডোর পুরোটা তুলে নিচে লাফিয়ে পড়ল। একটা বেডরুম। বাড়ির পেছন দিকে মুখ। সাধারণ আসবাবপত্র। একটা চেয়ারে রাখা একটা পুরুষের জ্যাকেট, পুরানো আমলের ড্রেসিং টেবিলের আয়নার ওপর ঝোলানো একটা টাই। হ্যারি থাকে নাকি এ ঘরে? যে খুশি সে থাকুক, ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় এখন নেই।

করিডরে বেরিয়ে এল কিশোর। খানিক দূরে একটা বাতি জ্বলছে। উল্টো দিকের দরজাটা দেখে মিসেস হ্যারল্ডের কথা মনে পড়ল। এটাই সুযোগ। ছুটে এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। ভেতরে ঢোকার আগে দরজায় টোকা দিয়ে নিল।

গ্যাসের আগুনের দিকে মুখ করে লম্বা একটা উইং চেয়ারে বসে আছেন এক মহিলা। দরজার দিকে পেছন করা। পাণ্ডুর মুখটা জানালার দিকে ফেরানো। নরম চেহারা, ধূসর চুল। চিৎকার করে উঠতে গিয়েও মুখে হাত চাপা দিয়ে থামালেন মিসেস হ্যারল্ড। অস্ফুট একটা শব্দ হলো কেবল।

কারণটা কি জানার জন্যে কিশোরও ঘুরল জানালাটার দিকে।

চোদ্দ

'রবিন!'

জানালার দিকে দৌড়ে গেল কিশোর। ঠেলে তুলতে শুরু করল ভারী কাঁচের

শার্শিটা। এই সময় মনে পড়ল, মিসেস হ্যারল্ড এখন চিৎকার করে উঠলে বিরাট ঝামেলায় পড়ে যাবে ওরা। সব নষ্ট হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি মিসেস হ্যারল্ডের দিকে ফিরে ঠোঁটে আঙুল রেখে তাঁকে চিৎকার করতে নিষেধ করল কিশোর। 'চিৎকার করবেন না, মিসেস হ্যারল্ড, প্লীজ! আমরা আপনার ক্ষতি করতে আসিনি, সাহায্য করতে এসেছি। দয়া করে শুনুন আমাদের কথা, তাহলেই বুঝতে পারবেন।'

বিমূঢ় হয়ে গেছেন মিসেস হ্যারল্ড। হাত দিয়ে কপাল মুছলেন, চোখের কোনা ডললেন যেন দৃষ্টিশক্তি খোলসা করার জন্যে। জেগে আছেন না ঘুমের মধ্যে, বুঝতে পারছেন না যেন।

জানালা খুলে দিয়ে রবিনকে ঘরে ঢুকতে সাহায্য করল কিশোর। প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, 'পুলিশকে জানিয়েছ?'

মাথা নাড়ল রবিন, 'আমি বুঝতেই পারছিলাম না কি করব। তোমরা কোথায় আছ জানতাম না। শেষে বাগানে তোমার নোটবুকটা পেয়ে বুঝলাম, বিপদে পড়েছ তোমরা। বাড়িতে ঢোকার জন্যে একটা মই খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, সাইকেল দুটো...'

'আমার মেসেজ দেখনি?'

'কোথায়?'

'নোটবুকে লিখে দিয়েছি। সাহায্য আনতে বলেছি তোমাকে।'

'তাই নাকি? নোটবুকটা পেয়েছি। তবে ভেতরে কিছু লেখা আছে ভাবিনি। বুঝতেই পারিনি ইচ্ছে করে ফেলেছ নাকি...'

রবিনকে বিব্রত হয়ে যেতে দেখে হাত নাড়ল কিশোর, 'যাকগে, এখন আর মেসেজের দরকার নেই। বেরিয়ে যখন চলে আসতে পেরেছি, বাকিটাও করতে পারব।'

তবে প্রথম দরকার এখন লুকানোর একটা জায়গা বের করা। খাটের নিচে উঁকি দিল। আছে, অনেক জায়গা। বেডশীটের কিনারও ঝুলে আছে একেবারে মেঝের ওপর। ওখানে ঢুকে বসে থাকলে কেউ দেখতে পাবে না ওদের।

'মিসেস হ্যারল্ড,' মোলায়েম স্বরে বলল কিশোর, 'আপনার সমস্যাটা কি, জানেন কি আপনি?'

ভ্রূকুটি করলেন মিসেস হ্যারল্ড। চিন্তাগুলো সব এক করতে পারছেন না যেন। তারপর মাথা ঝাঁকালেন, 'বাত,' দুর্বল হাসি ফোটালেন মুখে। 'বুড়ো বয়েসের রোগ, মনে হয়। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর কোন কিছুই আর স্বাভাবিক হচ্ছে না, রোগটাও বেড়েছে। উনি বেঁচে থাকতে প্রতিমাসেই ডাক্তারের কাছ থেকে ব্যথার ওষুধ এনে দিতেন। এখন এনে দেয় হ্যারি। ও না থাকলে কি যে করতাম আমি!...আমি এতটাই কাহিল, গাড়ি চালাতে পারি না।'

'মিসেস হ্যারল্ড, আমার মনে হয় ব্যথা কমানোর ওষুধ সে দেয় না আপনাকে। দেয় ট্র্যাংকুইলাইজার, দিয়ে সারাক্ষণ আপনার মগজটাকে অবশ করে রাখে। ফার্মটা ওশনদের কাছে কম দামে বেচে দেয়ার জন্যে চালাকি করা হচ্ছে।'

'ফার্ম?' চোখ মুদলেন মিসেস হ্যারল্ড। মেলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে যেন। 'চালাকি করছে? কি জানি। বহুকাল ধরেই তো এটা বেচার চেষ্টা করছি আমি।' এক মুহূর্ত

চুপচাপ থেকে ভাবার চেষ্টা করলেন তিনি। 'ঘুমের ওষুধ দেয়, না?...আমার স্বামীর মৃত্যুর পর ঘুমের বড়ি খেতে হয়েছিল আমাকে। তবে মাত্র দুদিন। পুরো শিশিটাই বোধহয় বাথরুমে রয়ে গেছে। বাথরুমের কেবিনেটে। দেখো তো, আছে নাকি।'

'দেখছি। রবিন, থাকো এখানে। কেউ ঘরে ঢুকছে শুনলে সঙ্গে সঙ্গে খাটের তলায় লুকিয়ে পড়বে।'

দরজা খুলে করিডরের এমাথা-ওমাথা দেখে এল কিশোর। কেউ নেই। দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে এসে বাথরুমে ঢুকল। মেডিসিন কেবিনেট থেকে বের করল ঘুমের বড়ির একটা শিশি। ভ্যালিয়াম। মাত্র তিনটে ট্যাবলেট অবশিষ্ট রয়েছে আর।

ফিরে এসে মিসেস হ্যারল্ডকে শিশিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এটা?'

শিশিটার দিকে তাকিয়ে রইলেন মিসেস হ্যারল্ড। 'কিন্তু এত ওষুধ তো আমি খাইনি।'

'খেয়েছেন,' কিশোর বলল, 'তবে আপনি সেটা জানেন না।'

'কেন জানব না? আমি যদি খেয়ে থাকি...কিছু তো বুঝতে পারছি না!'

শিশিটা নিয়ে গিয়ে আগের জায়গায় রেখে এল কিশোর। তারপর অল্প কথায় সব বুঝিয়ে দিল মিসেস হ্যারল্ডকে। বলল, 'এখন বুঝলেন তো ঘটনাটা কি ঘটছে? হ্যারি আর এলিনা কি এখানে কাজ করে?'

'হ্যাঁ, ফার্মের কর্মচারী। এলিনা হ্যারির স্ত্রী।'

'অ, একেবারে মানিক-জোড়! যে হ্যারি আর এলিনাকে আপনি আপন ভাবছেন, ওরা আপনার ভয়াবহ শত্রু। এখানে থেকে আপনার খাচ্ছে, আপনার পরছে, আর আপনারই সর্বনাশ করছে। ওষুধ খাইয়ে খাইয়ে একটা ঘোরের মধ্যে রেখে দিয়েছে আপনাকে যাতে সঠিক চিন্তা-ভাবনা করতে না পারেন, জায়গার দাম নিয়ে দর কষাকষি না করেন।'

মিসেস হ্যারল্ডের মগজের ধারণ ক্ষমতা এ মুহূর্তে কতখানি বুঝতে পারছে না কিশোর। সব শোনার পর আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেল তাঁর চেহারা, দৃষ্টি ঢুলুঢুলু।

'এত কিছু করছে শুধু ফার্মটা কম দামে বিক্রি করার জন্যে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ, যারা কিনতে চাইছে জায়গাটা ওদের অতি প্রয়োজন, ড্রাগ লুকিয়ে রাখার জন্যে। হল্যান্ড থেকে ওগুলো কিনে আনে ক্রেগলি ফক্স আর ব্যারাকুডা ওশন। জাহাজ প্রথমে গিয়ে থামে দ্বীপটায়, অ্যানথ্রাক্স-আইল্যান্ডে; সেখান থেকে নিয়ে আসা হয় মূল ভূখণ্ডে। এই জায়গাটা নিতে পারলে আর কোন সমস্যা থাকে না। চমৎকার ঘাঁটি। লোকালয় থেকে বেশ দূরে থাকেন আপনি। কাছেই সাগর। পুরানো একটা জেটিও আছে। ড্রাগ চোরাচালানের জন্যে এরচেয়ে ভাল জায়গা আর কোথায় পাবে ওরা। আপনি যাতে কোনমতেই অন্য কারও কাছে বেচে দিতে না পারেন, সে-জন্যেই এই অপচেষ্টা। ওদের ইচ্ছে, জায়গাটা হাতছাড়াও না হয়, আবার দামও বেশি না দেয়া লাগে।'

'আমাকে এখন কি করতে বলো?'

'হ্যারিকে না জানিয়ে পুলিশকে একটা ফোন করতে পারবেন? ড্রাগের কথা জানান ওদের। এখুনি চলে আসতে বলুন। রবিন, জানালার কাছ থেকে মইটা সরিয়ে ফেলো, যাতে কেউ বুঝতে না পারে এ ঘরে কেউ ঢুকেছে। তারপর বাইট কুনারে

গিয়ে নজর রাখো ব্যারাকুডার ওপর।'

এতক্ষণে আসল প্রশ্নটা করল রবিন, 'মুসা কোথায়?'

'চিলেকোঠায়। এখন গিয়ে নিয়ে আসব ওকে। তারপর গুহার কাছে চলে যাব। দেখি একটা ফাঁদ পেতে ড্রাগ সহ হাতেনাতে ধরা যায় কিনা ওদের।'

পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল এ সময়। করিডর ধরে এগিয়ে আসছে।

'জলদি করো!' বলে উঠল কিশোর। 'কে যেন আসছে!'

মুহূর্তে গিয়ে জানালার চৌকাঠে উঠে বসল রবিন। চলে গেল অন্যপাশে। নেমে যেতে শুরু করল মই বেয়ে। কিশোর ঢুকে পড়ল খাটের নিচে। কয়েক সেকেন্ড পরেই দরজা খুলে গেল। বেড-শীট উঁচু করে জানালার দিকে তাকাল কিশোর। দেখল, দুলে উঠে সরে যাচ্ছে মইটা। বেড-শীটটা নামিয়ে দিল আবার। চোখের সামনে দেখল খাটের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দুটো পা। ট্রে আর বাসন-পেয়ালার আওয়াজ হলো।

'মিসেস হ্যারল্ড, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? উঠুন। আপনার খাবার নিয়ে এসেছি। গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নিন। ঠাণ্ডা হলে আর ভাল লাগবে না। খেয়ে নিয়ে ওষুধ খান।'

এলিনার কণ্ঠ। আহা, কত দরদ! মুখ বাঁকাল কিশোর। পরক্ষণে ধড়াস করে উঠল বুক, মহিলার কথা শুনে, 'জানালাটা খোলা কেন? বন্ধই তো ছিল। কে খুলল?' কিশোর ভাবছে, রবিন কি সরে গেছে? দেখে ফেললে বিপদ।

'ঠাণ্ডা লাগছে না আপনার, মিসেস হ্যারল্ড? দাঁড়ান লাগিয়ে দিয়ে আসি,' জানালার দিকে এগোতে গেল এলিনা।

'না না, থাক ওভাবেই,' মিসেস হ্যারল্ড বললেন।

বাথরুমে চলে গেল এলিনা। ফিরে এল মিনিটখানেকের মধ্যেই। 'এই যে, আপনার ট্যাবলেট। আর কিছু লাগবে? বিছানায় তুলে দেব আপনাকে? নাকি পরে আসব?'

'না না, তুমি যাও। তোমার আর আসা লাগবে না। আমি নিজেই পারব। ট্রে'টাও নিতে এসো না। একটু একা থাকতে দাও।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। ঠিক কাজটাই করেছেন মিসেস হ্যারল্ড। এলিনা হঠাৎ করে এসে আবার ঢুকে পড়লে ঝামেলা বাধত।

চোখের সামনে থেকে সরে গেল পা দুটো। দরজা লাগানোর শব্দ হলো। মহিলা চলে গেছে নিশ্চিত হয়ে নিয়ে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। 'চমৎকার, মিসেস হ্যারল্ড। খুব ভালভাবে কাজ সেরেছেন।'

হাসি ফুটল মিসেস হ্যারল্ডের শীর্ণ মুখে। নীল চোখের তারায় এতক্ষণে আলোর ঝিলিক দেখা যাচ্ছে। 'আগাথা ক্রিস্টির গোয়েন্দা গল্পের মত লাগছে আমার কাছে। মজা পাচ্ছি।...কিন্তু ট্যাবলেটগুলো কি করব? জেনে যখন গেছি আর তো আমি খাব না। হ্যারি এসে দেখে ফেললে চাপাচাপি করবে। না খেলে সন্দেহ করবে।'

হাসল কিশোর। 'চেষ্টা করলে ভাল গোয়েন্দাই হতে পারবেন আপনি। দিন ওগুলো। জানালা দিয়ে ফেলে দিয়ে আসি।'

ট্রে থেকে ট্যাবলেটগুলো তুলে নিয়ে গিয়ে বাইরে ফেলে দিল কিশোর। ফিরে

এসে বলল, 'আমি এখন যাচ্ছি। পুলিশকে ফোন করতে ভুলবেন না। ড্রাগের কথা অবশ্যই জানাবেন ওদের। আসতে যেন দেরি না করে।'

দরজা খুলে উঁকি দিল কিশোর। করিডরে কাউকে দেখতে পেল না। চট করে বেরিয়ে এসে দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে দৌড় দিল সিঁড়ির দিকে। চিলেকোঠার দরজার কাছে এসে দেখল কেউ নেই। তালাও খোলা। টোকা দিয়ে বলল, 'মুসা? আমি!'

'চলে এসো। কোন সমস্যা নেই।'

ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল কিশোর। মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে এলিনা। অজ্ঞান। মুসা তাকে দড়ি দিয়ে বাঁধছে। পাশে পড়ে আছে নীল রঙের একটা ধাতব ফুলদানী। এত জোরে মাথায় মেরেছে, চেপে গেছে ফুলদানীর পেট।

কিশোরের দৃষ্টি অনুসরণ করে ফুলদানীটার দিকে তাকিয়ে হাসল মুসা, 'দিলাম দামী জিনিসটা শেষ করে।'

মুসার রসিকতায় কিশোরও হাসল, 'তাতে কিছু মনে করবেন না মিসেস হ্যারল্ড।'

মুসাকে সাহায্য করল সে। দুজনে মিলে দ্রুত বেঁধে ফেলল মহিলাকে। বেরিয়ে এসে তালাটা লাগিয়ে দিল কিশোর। সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে নেমে আসতে লাগল দুজনে।

'একটা ইবলিস বাতিল,' মুসা বলল। 'বাকি রইল আর একটা। খালি হাতে হলে কেয়ারই করতাম না। পিস্তল দেখায় বলেই না সমস্যা।'

নিরাপদে নিচতলায় নেমে এল ওরা। হ্যারি বা অন্য কাউকে চোখে পড়ল না। অন্ধকার হয়ে গেছে। আলো জ্বালানো হয়নি।

'গেল কোথায় ব্যাটা?' মুসার প্রশ্ন।

'নিশ্চয় কাজ করছে কোথাও,' কিশোর বলল। 'এসো, সুযোগ থাকতে বেরিয়ে যাই।'

বাইরে বেরোতে দুধ দোয়ানোর মেশিনের শব্দ কানে এল। তারমানে গোহালে রয়েছে হ্যারি। আলোও দেখা যাচ্ছে ওখানে।

'সাইকেলগুলো আর নেয়া যাচ্ছে না,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'থাক যেখানে আছে সেখানেই। পরে নেব। চলো।'

পনেরো

গাছপালা, ঝোপঝাড় আর পাতাবাহারের বেড়ার যেটুকু আড়াল পেল, তাতে গা ঢাকা দিয়ে ফার্মের কাছ থেকে দূরে সরে এল ওরা। রাস্তায় বেরিয়েই ছুটল পাহাড়ের চূড়ার দিকে, যেটাতে রয়েছে গুহাটা।

আজ আবার দেখতে পেল সাইনবোর্ড। একবার উধাও, একবার থাকার কারণটা বুঝে ফেলল কিশোর। যেদিন মাল পাচার করে, সেদিন সাইনবোর্ড লাগায়; যাতে কেউ কাছাকাছি না আসে। পাচার করা হয়ে গেলে আবার সরিয়ে নেয়। ওরা প্রথম যেদিন দেখেছিল, আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণেই বোধহয় সময়মত সরাতে

পারেনি। পরে সরিয়েছে।

ঘাস আর বালির ঢিবিগুলোর কাছাকাছি আসতেই শোনা গেল একটা ভারী ইঞ্জিনের শব্দ। ঢিবির ওপাশে রয়েছে ছোট্ট সৈকত আর সেই জেটিটা।

'লুকাও! লুকিয়ে পড়ো!' কিশোর বলল।

ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল দুজনে।

পাশ দিয়ে চলে গেল একটা ট্রাক্টর। টেনে নিয়ে গেল পেছনে জুড়ে দেয়া ছোট একটা ট্রেলার। ট্রাক্টর চালাচ্ছে ব্যারাকুডা। আড়াল থেকে তার চেহারা দেখতে পাচ্ছে দুই গোয়েন্দা। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে সে। দৃঢ়বদ্ধ চোয়াল। স্টিয়ারিং হুইলে আঙুলের চেপে বসা দেখেই আন্দাজ করা যায় মানসিক অস্থিরতার মধ্যে আছে।

দ্রুত নামছে সাঁঝের অন্ধকার। ট্রাক্টরের সঙ্গে দূরত্ব রেখে পেছন পেছন সাইকেল চালিয়ে আসা মূর্তিটাকে প্রথম চোখে পড়ল মুসার। 'কে, রবিন নাকি!'

ফিরে তাকাল কিশোর। 'হ্যাঁ, রবিনই।'

ট্রাক্টরটা অনেক এগিয়ে গেছে। আস্তে করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল সে। হাত তুলে থামতে ইঙ্গিত করল রবিনকে।

পাশ কেটে যাওয়ার সময় শেষ মুহূর্তে কিশোরকে চোখে পড়ল রবিনের। ব্রেক কষে দাঁড়াল। 'মুসা কই?'

'এখানে,' ঝোপ থেকে উঁকি দিল মুসা। হাত-পা চুলকানো শুরু করেছে। 'বাপরে বাপ, বিছুটি!'

'তুমি ওর মধ্যে গেলে কি করে?' কিশোর অবাক। 'আমিও তো একই ঝোপে ছিলাম।'

'কি জানি, কি করে গেলাম!' চুলকানো ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে মুসার।

হেসে ফেলল রবিন, 'হয়তো বিছুটিরাই কাছে টেনে নিয়েছে ওর রক্তের কেমিক্যালের লোভে। পোকা-মাকড় আর পিঁপড়ে যখন সব সময় ওর পিছে লেগে থাকে, বিছুটিরা লাগবে না কেন?'

তিক্তকণ্ঠে মুসা বলল, 'আমি মরি আমার জ্বালায়! আর...'

ট্রাক্টরের ইঞ্জিন বন্ধ হতে মুসার কথাও থেমে গেল।

'কি করব?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'চুপ করে বসে থাকি। দেখি কি করে,' জবাব দিল কিশোর।

ভরা জোয়ারের সময় এখন। যে কোন মুহূর্তে সঙ্কেত দেয়া শুরু হয়ে যেতে পারে, ভাবল সে। ক'জনের সঙ্গে লাগতে হবে? প্রথমেই আছে, ব্যারাকুডা। তারপর, হ্যারি। তবে সে এখনও খামারেই রয়ে গেছে। তার বৌটাও আপাতত অকেজো। মাল পাচারের সময় ক্রেগলি ফক্স নিশ্চয় সামনে আসে না। ওহ্‌হো, আরেকটা লোকের কথা ভুলেই গিয়েছিল। সেই স্প্যানিয়ার্ডটা। সে এর সঙ্গে কিভাবে জড়িত? যে ভাবেই হোক, হয়তো আসতে পারে এখানে। তাহলে ব্যারাকুডা আর স্প্যানিয়ার্ড। দুজনের বিরুদ্ধে তিনজন। পারা হয়তো অসম্ভব না। কেবল পিস্তল না থাকলেই হয়।

পুলিশ চলে এলে অনেক বেশি সুবিধে হত। মাল সহ হাতেনাতে পাকড়াও

করতে পারত অপরাধীদের। মিসেস হ্যারল্ড কি সময়মত ফোন করতে পারবে না? নাহ্, ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।

'রবিন, থানায় যেতে কতক্ষণ লাগবে তোমার?'

'সাইকেলে করে?'

'হ্যাঁ।'

'মিনিট দশেক...বড়জোর পনেরো।'

'তাহলে চলে যাও। যত তাড়াতাড়ি পারো ওদের নিয়ে এসো। বলবে, এখন না এলে হাতেনাতে ধরতে পারবে না। চুপি চুপি আসতে বলবে, আলো না জ্বেলে, সাইরেন না বাজিয়ে। বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ,' সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল রবিন।

'আমরা কি করব?' মুসার প্রশ্ন। 'পুলিশ আসার অপেক্ষায় হাত গুটিয়ে বসে থাকব?'

'না,' জবাব দিল কিশোর। 'ব্যারাকুডা যখন আলো নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, আমরা তখন গিয়ে ট্রাক্টর থেকে খুলে দেব ট্রেলারটা। যতভাবে বাধা সৃষ্টি করা যায়, সব করব। চলো, দেখি গিয়ে কি করছে।'

রাস্তার কিনার ঘেঁষে পা টিপে টিপে এগোল দুজনে। পাহাড়ের চূড়ায় যেন ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে ট্রাক্টর আর ট্রেলারটা। মানুষের নড়াচড়া চোখে পড়ল না। বুকের কাঁপুনি বেড়ে যাচ্ছে কিশোরের। দেখে ফেলবে না তো? অলক্ষে থেকে সত্যি পারবে খুলতে? লোহালক্কড়ের ব্যাপার। শব্দ হওয়ার ভয় ষোলোআনা।

কাছাকাছি পৌঁছে ঘাপটি মেরে বসে রইল মিনিটখানেক। ব্যারাকুডা গাড়ির কাছে আছে বলে মনে হলো না। ঝুঁকিটা নিল কিশোর। মুসাকে নিয়ে এগিয়ে গেল জোড়াটা যেখানে আছে সেখানে। এখনও দেখা যাচ্ছে না ব্যারাকুডাকে। কড়া নজর রাখল কিশোর। কাপলিংটা খুলে দিল মুসা। কয়েক সেকেন্ডের বেশি লাগল না তার খুলতে। শব্দও হলো না।

কাজ শেষ। ব্যারাকুডা দেখতে পায়নি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সরে আসতে যাবে কিশোর, এই সময় লক্ষ করল, ধীরে ধীরে সরে যেতে আরম্ভ করেছে ট্রেলারটা। ঢালের ওপর রাখা ছিল, চাকার নিচে কিছু না দিয়ে এ ভাবে খুলে দেয়াটা উচিত হয়নি মোটেও। কিন্তু মাথার চুল ছিঁড়ে লাভ নেই এখন। প্রায় ডাইভ দিয়ে গিয়ে পড়ল কিশোর। ধরে ফেলল ট্রেলারের ধাতব দণ্ডটা, যেটা দিয়ে আটকে রাখা হয়।

মুসাও গিয়ে হাত লাগাল কিশোরের সঙ্গে। থেমে গেল ট্রেলারটা। কিন্তু ছেড়ে দিলেই আবার গড়ানো শুরু করবে।

কয়েকটা সেকেন্ডের জন্যে ভোঁতা হয়ে গেল যেন কিশোরের মগজ। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ব্রেকটেক নেই নাকি?'

'অন্ধকারে খুলেছি,' জবাব দিল মুসা, 'কি করে বুঝব? তবে মনে হয় নেই। তাহলে আটকে রেখে যেত ব্যারাকুডা।'

'সে নিশ্চয় ট্রাক্টরের ব্রেক আটকে রেখে গেছে...ব্রেক নিয়ে মাথা ঘামিয়ে এখন লাভ নেই। ধরে রাখো, আমি চাকা আটকানোর ব্যবস্থা করি। পারবে তো?'

'তাড়াতাড়ি করো। বেশিক্ষণ পারব না।'
মাথা ঝাঁকিয়ে ধীরে ধীরে হাত সরিয়ে নিল কিশোর।
মুসা বলেই পারল। খায় বেশি, গায়ে জোরও বেশি, জুতোর ডগা ওপর দিকে তুলে দিয়ে গোড়ালি দুটো গেঁথে ফেলল প্রায় মাটিতে।
মরিয়া হয়ে উঠল কিশোর। চাকার নিচে কি দেয়া যায়? আশেপাশে যে সব পাথর আছে, বেশি ছোট, চাকা আটকাতে পারবে না।
সরে গেল খানিকটা দূরে।
দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে মুসা। হাতের পেশি ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। বেশিক্ষণ পারবে না আর। তাগাদা দিল কিশোরকে।
পাওয়া গেল অবশেষে দুটো পাথর। আকারটা ঠিকই আছে, কিন্তু যা ওজন, সন্দেহ হলো কিশোরের আটকাতে পারবে কিনা। পারুক না পারুক, এগুলো দিয়েই দেখতে হবে। এরচেয়ে ভাল আর পাবে না কাছেপিঠে। একটা করে পাথর চাকার নিচে রেখে ভালমত ঠেলে দিল। আস্তে আস্তে ছাড়তে বলল মুসাকে।
ছেড়ে দিল মুসা। তাকিয়ে আছে গাড়িটার দিকে। আটকে গেছে। নড়ছে না।
বিশ্বাস করতে পারছে না যেন কিশোর। ঠেকাতে পারল সত্যি সত্যি!
'একটা কাজ তো সারলাম,' হাত ঝাঁকি দিয়ে পেশির ব্যথা কমানোর চেষ্টা করতে করতে বলল মুসা। 'এবার কি করব?'
'ব্যারাকুডা ধারেকাছে নেই,' কিশোর বলল। 'থাকলে আমাদের নড়াচড়া চোখে পড়ে যেত। তারমানে গুহায় গিয়ে ঢুকেছে সে। চলো, দেখে আসি কি করছে।'
ঢাল বেয়ে গুহামুখের কাছে নামতে শুরু করল দুজনে। নিচে পাথরের গায়ে ঢেউ ভাঙার ক্রমাগত শব্দ। এর মধ্যে অদ্ভুত আরেকটা শব্দ কানে এল। মরচে পড়া কব্জার ওপর ভারী ধাতব পাল্লা ঘুরল যেন। তারপর কংক্রীটের ওপর ধাতব চাকা গড়ানোর শব্দ।
ঠিক এই সময় বলে উঠল মুসা, 'ওই যে, আলো দেখানো শুরু করেছে!'
দ্বীপের দিকে তাকাল কিশোর। সাদা...সবুজ...সাদা... লাল।
গুহামুখের ওপরে বসে মাথা নিচু করে ভেতরে উঁকি দিল সে। আলো জ্বলছে ভেতরে। লোহার দরজা লাগানো রয়েছে সুড়ঙ্গের মুখে। সেটা সরানোর শব্দই কানে এসেছে খানিক আগে। এ জিনিস ইদানীংকার বানানো নয়। বহু আগে বানিয়েছিল কেউ। কোন দুর্গের বেরোনোর পথ হতে পারে। শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় আগে থেকেই পালানোর পথটা ঠিক করে রাখত তখনকার দিনের রাজা-বাদশা-জমিদার-সেনাপতিরা। কাদের বাড়ি থেকে পালানোর পথ এটা, খুঁজলেই বেরিয়ে পড়বে, তবে আপাতত সেটা জরুরী নয়। তৈরি করা জিনিস পেয়ে গিয়ে ব্যবহার করছে চোরাচালানীরা, সেটাই হলো আসল কথা।
ব্যারাকুডাকে দেখতে পেল। একটা লোহার ঠেলাগাড়ি ঠেলে আনছে। তাতে সার্চ লাইটের মত বড় একটা বাতি। সঙ্গে ছোট একটা জেনারেটর। ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসছে গুহামুখের দিকে।
কি দিয়ে এ পাশ থেকে সঙ্কেত দেয়া হয়, দেখা হয়ে গেছে। আর এখানে বসে থাকার কোন দরকার নেই। থাকলে ব্যারাকুডার চোখে পড়ে যেতে পারে। অকারণ

ঝুঁকি না নিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। ফিসফিস করে মুসাকে বলল, 'চলো, ওপরে চলে যাই।'

ষোলো

ওপরে উঠে একটা হালকা ঝোপের মধ্যে ঢুকে বসল দুজনে। ট্রাক্টরটা থেকে দূরে। বলা যায় না, কখন উঠে আসে ব্যারাকুডা, গাড়ির কাছে থাকলে দেখে ফেলবে ওদের। এত কষ্ট করে এতখানি এগিয়ে এখন সব ভজকট করে দিতে চায় না।

চাঁদ উঠছে। পানির ওপর ছড়িয়ে দিচ্ছে রূপালী আভা। শান্ত, সুন্দর পরিবেশ। প্রথমে শোনা গেল ইঞ্জিনের শব্দ। তারপর দেখা গেল একটা কালো ছায়া এগিয়ে আসছে জেটির দিকে।

সময় হয়ে গেছে।

'বোট রেখে মাল নিয়ে নিশ্চয় নেমে আসবে যে-ই থাকুক বোটে,' কিশোর বলল। 'গিয়ে অকেজো করে দেবে, যাতে কোনমতেই আর স্টার্ট না নেয় ইঞ্জিন।'

'ফুয়েল পাইপ কেটে দিলেই হয়,' মুসা বলল।

'কি দিয়ে কাটবে?'

পকেট থেকে একটা ছুরি বের করল মুসা। 'চিলেকোঠায় পেয়েছি। কাজে লাগবে ভেবে পকেটে ভরে রেখেছিলাম। এমন কাজ করতে হবে কল্পনাও করিনি।'

ধীরে ধীরে গুহার দিকে এগিয়ে আসছে বোট। ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে দুই গোয়েন্দা। আকাশ পরিষ্কার। চাঁদের আলো বিচিত্র ছায়া সৃষ্টি করেছে পাহাড়ে। রাস্তা বোঝা যায় না ঠিকমত। আলগা পাথরে পড়ে কিংবা অন্য কোনভাবে পা পিছলালে এখন গড়িয়ে গিয়ে পড়তে হবে বহু নিচে। পাথরে পড়লে হাড়গোড় আর আস্ত থাকবে না।

তবে তেমন কোন অঘটন ঘটল না। নিরাপদে নেমে এল ওরা পানির দুই ফুট ওপরে। একটা খাঁজ দেখিয়ে তাতে বসে মুসাকে অপেক্ষা করতে বলল কিশোর। সে নিজে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল গুহাটার দিকে। ঢাল বেয়ে নামার সময় আড়ালে চলে গিয়েছিল, এখন চোখে পড়ল আবার বোটটা। সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে কথা শোনা যাচ্ছে। বোটের ডেকে দেখা যাচ্ছে গাঁইটগুলো। সেই অদ্ভুত লাল-সবুজ রঙে ছাপ মারা লোগোওয়ালা গাঁইট।

কথার শব্দ এগিয়ে আসছে শুনে পাথরের দেয়ালের সঙ্গে গা মিশিয়ে ফেলল কিশোর।

'আবার এক হপ্তা পর মাল চালান দেয়ার সুযোগ পাব আমরা,' একটা কণ্ঠ বলছে। 'অকারণে ততদিন আর দ্বীপে থাকার দরকার নেই তোমার। ফার্মে গিয়ে গাঁইটগুলো খুলব আমি। কাল সকালেই লরিতে করে জায়গামত মাল চালান দিয়ে আসবে হ্যারি। তোমার কিছু চিন্তা করতে হবে।'

'আজ কি আর দ্বীপে ফেরা লাগবে?' দ্বিতীয় কণ্ঠটা বলল। 'বোটটা এখানে রেখে গেলে হয় না?'

লোকটা কে, অনুমান করতে পারল কিশোর। সেই স্প্যানিশটা। কথার টান শুনেই সেটা বোঝা গেল।

'তোমাকে যা বলা হয়েছে সেইমত করো,' রুক্ষ হয়ে উঠল ব্যারাকুডার কণ্ঠ। 'আমার ভাই এসে হাজির হতে পারে যে কোন মুহূর্তে। কি জানি কেন, সন্দেহ জেগেছে তার মনে। আর ওই বিচ্ছু ছেলেগুলো তো হয়েছে একেকটা ইবলিস। আটকে ফেলেছি অবশ্য।'

বিড়বিড় করে কি যেন বলল স্প্যানিশ লোকটা, বুঝতে পারল না কিশোর। কিন্তু ব্যারাকুডার কণ্ঠ স্পষ্ট। 'কোন সমস্যা নেই। সকাল বেলা গিয়ে তোমাকে তুলে নিয়ে আসব আমি। আমি হ্যারির সঙ্গে শেফিল্ড মার্কেটের জন্যে গরু তুলব গাড়িতে, তুমি চলে যাবে তোমার পথে। দশ লাখ ডলারের ব্যবসা। কোন রকম ভুল করা চলবে না।'

বোট থেকে গাঁইট নামানো শুরু করল দুজনে। বয়ে নিয়ে চলে গেল সুড়ঙে। কাজটা শেষ করার এখনই সুযোগ, পরে আর পাওয়া যাবে না। ঢালের যে রকম অবস্থা, তাড়াহুড়া করা বড় কঠিন। তারপরেও যতটা সম্ভব দ্রুত মুসার কাছে চলে এল কিশোর। 'জলদি এসো!'

বোটের কাছে চলে এল দুজনে। নিচে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগল কিশোর, মুসা উঠে গেল বোটে।

অস্থির হয়ে উঠল কিশোর। মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করছে। অথচ পেরিয়েছে মাত্র দুই মিনিট। তিন মিনিটেই কাজ সেরে ফিরে এল মুসা। হাতে এক টুকরো কাটা পাইপ। হাসিমুখে জানাল, 'সব তেল পড়ে যাচ্ছে সমুদ্রে।'

'বাড়তি ক্যান নেই?'

'আছে একটা।'

'ওটাও খালি করে দিয়ে এসো। কাটা পাইপ বদল করে যাতে স্টার্ট দিতে না পারে। কোন সুযোগই দেব না আজ ব্যাটাদের।'

আবার চলে গেল মুসা। ক্যানের মুখ খুলে পানিতে ঢেলে খালি করতে সময় লাগবে। তারচেয়ে যেটা অনেক সহজ, সেই কাজটাই করল। যতটা সম্ভব দূরে পানিতে ছুঁড়ে ফেলল। নেমে এল বোট থেকে।

কাজ শেষ। আবার পাহাড় চূড়ায় ফিরে চলল দুজনে।

ঘুরপথে এসেছে। সময় লেগেছে প্রচুর। ওপরে উঠতেই কানে এল ট্রাক্টরের ইঞ্জিন স্টার্ট নেবার শব্দ। ভারী হলো শব্দ। চলতে শুরু করল গাড়িটা।

চাঁদের আলোয় একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হাসল দুই গোয়েন্দা।

'ট্রেলারটা যে যাচ্ছে না সঙ্গে,' নিজেকেই প্রশ্ন করল কিশোর, 'কতক্ষণ লাগবে বুঝতে? চলো, চলো, মজা দেখিগে!'

লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে দৌড় দিল দুজনে।

চিৎকার শোনা গেল, 'জলদি এসো! ট্রেলারটা যাচ্ছে না!'

চাঁদের আলোয় গোয়েন্দারা দেখল, উঁচুনিচু জমিতে দোল খেতে খেতে রাস্তার দিকে চলেছে ট্রাক্টর। অনেক পেছনে লাফালাফি করছে একজন লোক। ওপর দিকে করে মুঠো ঝাঁকাচ্ছে আর চিৎকার করছে।

হা-হা করে হেসে উঠতে গিয়েও তাড়াতাড়ি মুখে হাত চাপা দিল মুসা। মাটিতে গড়াগড়ি খেতে ইচ্ছে করছে ওর। কিশোরের মুখেও নীরব হাসি।

স্প্যানিশ ভাষায় চিৎকার করে কিছু বলতে বলতে ট্রাক্টরের দিকে ছুটে গেল লোকটা। দাঁড়িয়ে গেছে ট্রাক্টর। কাছে চলে গেল লোকটা। উত্তেজিত কথাবার্তা আর গালাগাল শোনা গেল। আবার পিছিয়ে আসতে শুরু করল ট্রাক্টর।

'ওই দেখো!' মুসার গায়ে কনুই দিয়ে গুঁতো দিল কিশোর।

মুসাও দেখল। ঘাস যেখানে শেষ হয়েছে, তার ওপাশে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা গাড়ি, অপেক্ষা করছে নীরব শিকারীর মত।

হঠাৎ বেজে উঠল বাঁশি। জ্বলে উঠল শক্তিশালী আলো। আলোকিত করে দিল পুরো এলাকাটা। গাড়ি থেকে টপাটপ লাফিয়ে নামতে শুরু করল নীল ইউনিফর্ম পরা পুলিশের লোক।

স্প্যানিশ লোকটাকে সৈকতের দিকে দৌড় দিতে দেখল কিশোর। মেগাফোনে চিৎকার করে তাকে থামার নির্দেশ দিল একজন পুলিশ অফিসার। হোঁচট খেয়ে যেন দাঁড়িয়ে গেল লোকটা। দুই হাত ওপরে তুলে ঘুরে দাঁড়াল। তবে ব্যারাকুডা এত সহজে থামল না। ট্রাক্টর চালিয়ে কেটে পড়ার চেষ্টা করল সে। পুলিশও ছাড়ল না। লাফ দিয়ে একজন উঠে পড়ল ট্রাক্টরের পা-দানীতে। ঢুকে গেল কেবিনে। অবাক হয়ে এতক্ষণে লক্ষ করল, ব্যারাকুডা নেই ড্রাইভিং সীটে।

গেল কোথায় সে? নিশ্চয় লাফ দিয়ে নেমে পালিয়েছে।

ব্যারাকুডা যে নেই, সেটা আগেই লক্ষ করেছে মুসা। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে ওর খোঁজে। স্প্যানিশ লোকটা হাত তুলতেই বড় একটা পাথরের কাছে ঝোপের আড়াল থেকে একটা ছায়ামূর্তিকে বেরিয়ে সরে যেতে দেখল সে।

'ওই যে, ওই যে, যাচ্ছে!' বলে চিৎকার করে উঠে মুসা দিল দৌড়।

কিশোর ছুটল মুসার পেছনে। ওদের দেখতে পেয়েছে রবিন। সে-ও ছুটে এল। পুলিশও হই-হই করে উঠল।

তাড়া খেয়ে মাথার ঠিক রইল না ব্যারাকুডার। এলোপাতাড়ি ছুটতে গিয়ে পড়ে গেল হোঁচট খেয়ে। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে আবার দৌড় দিতে গেল। পথরোধ করে দাঁড়াল মুসা। রাগে চিৎকার করে উঠল ব্যারাকুডা। পকেট থেকে পিস্তল বের করতে গেল। কিন্তু সুযোগ দিল না মুসা। মাথা নিচু করে ছুটে গেল তীব্র গতিতে। পেটে গুঁতো খেয়ে হুঁক করে উঠল ব্যারাকুডা। হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তলটা। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

দুই হাত ঝাড়তে ঝাড়তে মুসা বলল, 'গুঁতো মেরে আমাদের রাস্তা থেকে ফেলে দিয়ে মারতে চেয়েছিল না? প্রতিশোধ নিলাম।'

'দারুণ দেখিয়েছ তোমরা!' প্রশংসা করলেন ইন্সপেক্টর।

পরদিন এনিড আন্টির লিভিং-রূমে বসে কথা হচ্ছে। তিন গোয়েন্দা বসেছে মুখোমুখি। খানিক দূরে এনিড আন্টি।

'এক ট্রিপেই দশ লাখ ডলারের ভাং,' ইন্সপেক্টর বললেন, 'সোজা কথা! অনেক দিন থেকেই এদের পেছনে লেগে ছিলাম আমরা। পুরো দলটার হদিস পাইনি।

এবার পেলাম। ধন্যবাদটা পুরোপুরি তোমাদেরই প্রাপ্য। শেফিল্ডের সব কটাকে ধরেছি। ক্রেগলি ফক্সও বাদ যায়নি। কাল রাতেই ধরা হয়েছে হ্যারি আর তার স্ত্রীকে।'

'মিসেস হ্যারল্ডের খবর কি?' জানতে চাইল কিশোর। 'তিনি ভাল আছেন?'

মাথা ঝাঁকালেন ইন্সপেক্টর। 'কাল রাতেই ডাক্তার গিয়েছিল তাঁকে দেখতে। বলেছে, কয়েক দিনের মধ্যেই পুরোপুরি সেরে উঠবেন।'

'তাঁর জন্যে একটা সারপ্রাইজ আছে,' এনিড আন্টি বললেন। 'একজন ক্রেতা ঠিক করেছি। এক চাষীর ছেলে কিনতে চায় ফার্মটা। বেশ ভাল দাম দিতে রাজি। এতটা দেবে আমিও আশা করিনি।'

'দ্বীপটার কি অবস্থা?' জানতে চাইল রবিন।

'মিনিস্ট্রি অভ ডিফেন্স ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে, দ্বীপটা এখন পাবলিকের। মিস্টার হয়ার কিনে নিচ্ছেন ওটা। ওখানকার বুনো পাখিদের বাঁচানোর জন্যে। দেখাশোনার জন্যে ভাল একজন কেয়ার-টেকার খুঁজছেন। দেখি, জোগাড় করে দেয়া যায় কিনা। ক্রেগলি ফক্সের মত শয়তান হলে হবে না।'

ঘড়ি দেখলেন ইন্সপেক্টর। 'আমাকে যেতে হচ্ছে,' উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালেন। 'আশা করি ছুটির বাকি দিনগুলো তোমাদের ভালই কাটবে এখানে।' তারপর চোখের দৃষ্টি বাঁকা করে বললেন, 'দেখো, ইতিমধ্যে আরেকটা রহস্য জোগাড় করে ফেলতে পারো নাকি। যা বুঝতে পারছি, রহস্য আপনাআপনি এসে হাজির হয় তোমাদের সামনে। নইলে বাড়িতে পা দিয়েই দ্বীপের আলো চোখে পড়বে কেন রবিনের?'

মুচকি হেসে দরজার দিকে পা বাড়ালেন তিনি।

***

জবরদখল

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

'বরফ ছাড়া আর তো কিছুই চোখে পড়ছে না,' কিশোরের দিকে ফিরে তাকাল মুসা। 'রাস্তা কই?'

সানগ্লাসটা কপালের ওপর ঠেলে দিল কিশোর। 'বরফই তো ভাল। নইলে ক্রস-কান্ট্রি স্কি জমে না। কষ্ট বেশি হয়।'

'হুঁ,' এ সব কথা মুসারও জানা দূরের পর্বত-চূড়াটার দিকে তাকাল সে। পোল দিয়ে আবার বরফে খোঁচা মারবে কিনা ভাবছে। 'রকি বীচ থেকে বহুদূরে চলে এলাম। বিশ্বাসই হচ্ছে না, কাল ছিলাম একটা জমজমাট শহরে, আর আজ এ রকম একটা অপার্থিব জায়গায়, কিচ্ছুই নেই যেখানে।'

'সাবধান,' রবিন বলল, 'শহরে গিয়ে কারও সামনে এ ভাবে বলে বোসো না আবার। কলোরাডোর মানুষ তাদের দেশ সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য পছন্দ করবে না।'

'ভুলটা কি বললাম?' চারপাশে তাকাল মুসা। মানুষ চোখে পড়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ সবচেয়ে কাছের শহর এলক স্প্রিঙও এখান থেকে আট মাইল দূরে। ট্রেইলহেড, অর্থাৎ রাস্তার যে মাথা থেকে স্কি শুরু করেছে ওরা, যেখানে ভাড়া করে আনা গাড়িটা রেখে এসেছে, সেই জায়গাটাও এখান থেকে তিন মাইল।

'না থাকাই তো ভাল,' জবাব দিল কিশোর 'নির্জনতাই দরকার আমাদের। মানুষ নেই, কোলাহলমুক্ত, প্রকৃতি আর আমাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না কেউ।' রবিনের দিকে তাকাল, 'রবিন, কেমন লাগছে তোমার?'

'খুব ভাল। তবে অতিরিক্ত নির্জন।'

'হয়তো এ কারণেই এ রকম একটা জায়গায় তোমাকে নিয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছেন ডাক্তার।'

'কি জানি! হতে পারে। তবে নির্জনতাটা সহ্য করতে সময় লাগবে মনে হচ্ছে।'

'পস্তাচ্ছ না তো?'

এক হাতের একটা স্কি-পোল বরফে চেপে ধরে নিজেকে আটকে রাখল রবিন, যাতে পিছলে না যায়। জিনিসটা ফাইবারগ্লাসে তৈরি সরু লাঠির মত। মাথাটা ইস্পাতের। সামনের ঢালু তরাই অঞ্চলটার দিকে তাকাল। উপত্যকায় ছড়ানো-ছিটানো পাইন বন। ঢালের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা। আকাশ ঘন নীল। বাতাস এতটাই স্বচ্ছ আর পরিষ্কার, গাছপালা, আকাশ—সব কিছুর রঙ হয়ে গেছে অতিমাত্রায় উজ্জ্বল। বরফ ধবধবে সাদা। নাক চিরে ঢুকে যাচ্ছে পর্বতের বাতাস, শরীরটা খুব তাজা লাগছে।

'মোটেও না,' জবাব দিল সে।

'মাথার মধ্যের গোলমালটা আছে আর?' জিজ্ঞেস করল মুসা।
'এখন তো টের পাচ্ছি না।' জবাব দিল রবিন। অথচ হোটেল থেকে বেরোনোর সময়ও কেমন যেন লাগছিল। তার অসুস্থতার কারণেই কলোরাডো রকির পার্বত্য অঞ্চলে বেড়াতে এসেছে ওরা। মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছিল তার। 'রূপালী মাকড়সা' অভিযানে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছিল। ডাক্তার বলেছেন, সেই আঘাতটাই বর্তমান গণ্ডগোলের কারণ। চেপে ছিল এতদিন, মাথা চাড়া দিয়েছে এখন। কেন দিয়েছে, সেই কারণটা খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি। তাই বলেছেন, ব্ল্যাক ফরেস্টের বদ্ধতা থেকে দূরে কোথাও সরে যেতে। এমন কোথাও, যেখানটা অতিরিক্ত খোলামেলা, কোলাহল বর্জিত, একেবারে প্রকৃতির কোলে কোনখানে। তিন বন্ধু মিলে আলোচনা করে এই জায়গাটাই পছন্দ হয়েছে ওদের। চলে এসেছে। ছুটি কাটাতে। রবিনের জন্যে বেড়ানোও হবে, সেই সঙ্গে আবহাওয়া বদল। তিনজনের খরচের টাকাটা রবিনের বাবা-মা'ই বহন করছেন।
'এখান থেকে আর যেতেই ইচ্ছে করছে না আমার,' মুসা বলল।
'আমারও খুব ভাল লাগছে,' কিশোর বলল।
পোল দিয়ে আবার ঠেলা দিল মুসা। পিছলে গেল তার পায়ে বাঁধা স্কি দুটো। ছুটতে শুরু করল সে। চিৎকার করে ডাকল কিশোর আর রবিনকে, 'এসো, দেখা যাক কত মাইল পথ পাড়ি দিতে পারি আজকে আমরা।'
বরফে স্কি-এর চাপে সৃষ্টি হওয়া দুটো গভীর খাঁজ রেখে যাচ্ছে মুসা। যতটা সম্ভব সে-দুটো অনুসরণ করেই এগোল রবিন। পেছনে কিশোর। এক লাইনে থাকা ভাল।
কিছুদূর এগোনোর পর ডেকে বলল কিশোর, 'একদিনেই বেশি কষ্টের দরকার নেই। নির্দিষ্ট কোথাও যাবার তো তাড়া নেই আমাদের। তা ছাড়া পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবারও ব্যাপার আছে। বাতাস দেখেছ, কি রকম পাতলা? বেশি ছোটাছুটি দ্রুত কাহিল করে ফেলবে। তারচেয়ে থেমে থেমে এগোই। ক্লান্তও কম হব, প্রকৃতিও দেখতে পারব।'
'ওই ন্যাশনাল ফরেস্টের সব দেখতে চাই আমি,' মুসা বলল।
'ছুটি তো মাত্র সাত দিন। সব দেখবে কি করে? স্কি করে গানিসন ন্যাশনাল ফরেস্টের পুরোটা দেখতে চাইলে এক বছরেও পারবে না।'
'প্লেন ভাড়া করলে দেখা যায়,' রবিন বলল।
'তা হয়তো যায়,' কিশোর বলল। 'কিন্তু তাতে তোমার রোগের কোন উপকার হবে না। আসল উদ্দেশ্যটা সব সময় মাথায় রাখতে হবে আমাদের।'
শীঘ্রিই ছোট্ট উপত্যকাটার অন্য পাশে বেরিয়ে এল ওরা। ঢাল বেয়ে আবার ওপরে উঠতে শুরু করেছে পথ। গতি কমে গেল মুসার।
'এখন কি মনে হচ্ছে?' শৈলশিরার ওপরে উঠে এসে জিজ্ঞেস করল কিশোর। সারাদিন ছুটতে পারবে? এখানে বসা যেতে পারে। প্রয়োজন মনে করলে কিছু খেয়েও নেয়া যায়।'
'ভাল কথা মনে করেছ তো,' হাসি ফুটল মুসার মুখে। 'আমার প্রয়োজন আছে।'

দেরি করল না আর সে। স্কি দুটো খুলে নিয়ে খাড়া করে গেঁথে রাখল বরফে। শৈলশিরার একেবারে কিনারে একটা পাথরের ওপর এসে বসল। ব্যাকপ্যাক থেকে গ্র্যানোলা বার বের করে চিবানো শুরু করল। কিশোরের মতই তারও নজর নিচের উপত্যকার দিকে। দৃশ্যটা অবাক করল ওকে। যেদিক দিয়ে উঠে এসেছে সেদিকের ঢালটার চেয়ে উল্টোপাশের ঢাল অনেক বেশি দীর্ঘ, অনেক খাড়া ভাবে নেমে গেছে গভীর খাদের মধ্যে।

'নামতে কি পারব এদিক দিয়ে?' মুসার কণ্ঠে সন্দেহ।

ব্যাকপ্যাকটা গাছের গোড়ায় ঠেস দিয়ে রেখেছে কিশোর। চেন খুলে সাইড পকেট থেকে ন্যাশনাল ফরেস্টের একটা ম্যাপ বের করল। দেখেটেখে বলল, 'খাড়াই বেয়ে নামার দরকার হবে না। শৈলশিরা ধরে একটা রাস্তা আছে।'

মুসাও তাকাল ম্যাপের দিকে। 'ম্যাপ দেখে বলতে পারবে কতটা ওপরে রয়েছি আমরা?'

কাত হয়ে গলা বাড়িয়ে এল রবিনও।

'সঠিক বলা যাবে না,' কিশোর বলল। 'বিশদ ভাবে সব দেখানো নেই এটাতে। তবে মোটামুটি অনুমান করা সম্ভব।'

'অনুমানে কাজ হবে না,' মাথা নাড়ল মুসা। 'মনোকিউলারটা দিয়ে দেখো না চেষ্টা করে।'

ব্যাকপ্যাক থেকে ছোট একটা যন্ত্র বের করল কিশোর, হাতের তালুতে জায়গা হয়ে যায়। হালকা, খুদে একটা টেলিস্কোপ, রেঞ্জফাইন্ডার, কম্পাস, ঘড়ি আর উচ্চতামাপক যন্ত্র অলটিমিটারের সংমিশ্রণ ওটা। যন্ত্রটা চোখের সামনে তুলে এনে ওপরের দিকের একটা বোতাম টিপে দিল সে। নিচের দিকে একটা ডিজিট্যাল ডিসপ্লে মিটমিট শুরু করল। 'আট হাজার ফুট ওপরে রয়েছি এখন আমরা।'

'খাইছে!' মৃদু শিস দিয়ে উঠল মুসা, 'তারমানে দেড় মাইল!'

'হ্যাঁ-ও বলা যায়, না-ও বলা যায়,' জবাব দিল কিশোর। 'সমুদ্র সমতলকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে নিয়ে রিডিং দিচ্ছে যন্ত্রটা। সমুদ্র সমতল থেকে দেড় মাইল, কিন্তু আমরা যে জায়গাটা থেকে ওঠা শুরু করেছি, সেটাও সমুদ্র সমতল থেকে অনেক ওপরে। তারমানে দেড় মাইলের অনেক কম।'

'ওসব জটিল অঙ্ক বুঝি না। আসলে ঠিক কতখানি ওপরে আছি, সেটা বলো।'

মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। 'ট্রেইলহেডের কাছে যেখানে গাড়ি ফেলে এসেছি, সেটাকে সমতল ধরলে রয়েছি তিনশো ফুট ওপরে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা, 'তাই বলো। আমি তো ভেবেই পাচ্ছিলাম না, স্কি করে এত হাজার হাজার ফুট ওপরে উঠলাম কি করে আমরা!'

'তারপরেও বলতে হয়, তিনশো ফুট ওঠাটাও কম না।

'দেখি, দাও তো জিনিসটা,' হাত বাড়াল মুসা।

'তুমিও মাপবে নাকি?'

'না, টেলিস্কোপ দিয়ে দেখব।'

যন্ত্রটা চোখে লাগিয়ে খাদের দিকে তাকাল মুসা। আঁকাবাঁকা একটা রাস্তামত চোখে পড়ল। পাহাড়ী নদী সম্ভবত, পানি এখন জমাট বরফ।

কয়েক মিনিট পরও যখন চোখ সরাল না মুসা, রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কি দেখছ?'

'কিছুই নেই,' হতাশ কণ্ঠে জবাব দিল মুসা। 'এল্‌ক্‌ দেখব ভেবেছিলাম। কিংবা অন্য কোন হরিণ। বুনো জানোয়ারই যদি না দেখলাম, বুনো এলাকায় আসাটাই বৃথা।' ঠিক এই সময় একটা নড়াচড়া দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার। 'দাঁড়াও দাঁড়াও, এক মিনিট! কিছু একটা আছে ওখানে। নড়ছে।

মুসার হাত থেকে মনোকিউলারটা নিয়ে চোখে ঠেকাল রবিন। প্রথমে গাছপালা, বরফ আর পাথর ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না। তারপর দেখল, বরফে ঢাকা এক টুকরো খোলা জায়গার ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে একটা কমলা রঙের আকৃতি। খানিক পর আরও তিনটি বিভিন্ন রঙের আকৃতি গোচরে এল, খাদের দিকে এগোচ্ছে। দুপুরের রোদে ধাতব জিনিসের প্রতিফলনও চোখে পড়ল। তারমানে তিনজন মানুষ, অন্তত দুজনের হাতে রাইফেল আছে।

'শিকারী।' মনোকিউলারটা কিশোরের হাতে দিতে দিতে বলল রবিন, 'বোধহয় বিগহর্ন ভেড়ার পেছনে লেগেছে।'

শঙ্কিত কণ্ঠে মুসা বলল, 'দূর থেকে আমাদেরকে আবার ভেড়া ভেবে বসবে না তো?'

মুসার পরনে উজ্জ্বল নীল স্কি-স্যুট। কিশোর বলল, 'না, তোমার কোন ভাবনা নেই। ভেড়ার রঙ নীল হয় না।'

দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল শিকারীরা। দ্রুত ওদের কথা ভুলে গেল তিন গোয়েন্দা দিনটা চমৎকার। যেখানে বসে আছে, জায়গাটা খুব সুন্দর। আশেপাশের দৃশ্যও দারুণ। বিশ্রাম, খাওয়া, দুটোই হয়ে গেছে। উঠে পড়ল ওরা।

দুটো ঢাল যেখানে মিলিত হয়েছে, সেখান দিয়ে চলে যাওয়া ট্রেইল ধরে এগোল। কয়েক ঘণ্টা পর এসে পৌঁছল সরু একটা গভীর গিরিখাতে। আগে আগে চলেছে এখন কিশোর। থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। তার গায়ের ওপর এসে পড়ল মুসা।

'খাওয়ার সময় হয়েছে নাকি আবার?' জানতে চাইল সে।

'হয়তো,' চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর। 'তবে সেটা কার, বলা মুশকিল।'

নিচের দিকে চোখ পড়তেই কিশোরের কথার মানে বুঝে গেল মুসা। পার্বত্য সিংহের পায়ের ছাপ। জন্তুটার আরেক নাম কুগার। 'খাইছে! মানুষ খায় নাকি ওরা?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'সিংহ যখন, মানুষখেকো হতে বাধা নেই। ছাপ দেখেছ কত বড়? অনেক বড় জানোয়ার।' ঝুঁকে বসে ভালমত দেখল ছাপগুলো। 'ধারগুলো সামান্য ভোঁতা হয়ে গেছে। তারমানে তাজা নয়। গতকালকেরও হতে পারে, কিংবা পরশুর। পাহাড়ের দেয়ালের জন্যে বাতাস লাগে না বলে ছাপগুলো আছে এখনও, নইলে পুরোপুরিই ঢেকে যেত।'

'তারমানে, ধরে নেয়া যেতে পারে কাছাকাছি নেই জানোয়ারটা,' রবিন বলল

'কাছাকাছি আছে কিনা বলা কঠিন।'

'দেখতে দোষ কি?' মুসা এগিয়ে যেতে আগ্রহী।

'কুগারের পিছু নেবে?'

'সাবধানে এগোব। বিপদ দেখলেই পেছন ফিরে দৌড়।'

কৌতূহল দমন করতে পারল না কিশোরও। প্রাকৃতিক পরিবেশে উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে ভয়ানক হিংস্র প্রাণীটাকে দেখার লোভ সংবরণ করতে না পেরে বলল, 'চলো।'

কিছুদূর এগোতে সামনে একটা বরফের স্তূপ চোখে পড়ল মুসার। তার মধ্যে অদ্ভুত কি যেন দেখা যাচ্ছে। 'ওটা কি?'

স্তূপটার দিকে তাকিয়ে কিশোরও দেখতে লাগল বেরিয়ে থাকা জিনিসটা। বরফে জমাট জানোয়ারের খুর নাকি!

'এল্‌ক্ দেখতে চেয়েছিলে না?' রবিন বলল, 'ওটাই তোমার হরিণ। তবে আংশিক দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে, পুরো দেহটা আর পাবে না।'

'চলো, গিয়ে দেখি কতখানি আছে,' কথা শেষ করার আগেই পোল দিয়ে বরফে ঠেলা মারল মুসা।

'কাছে যাওয়া ঠিক হবে না!' বলতে গিয়েও থেমে গেল কিশোর। লাভ নেই। চলতে আরম্ভ করেছে মুসা।

বরফে অর্ধেক ঢেকে যাওয়া একটা হরিণের মৃতদেহই ওটা সিংহের রেখে যাওয়া মড়ি।

মড়িটার বেশি কাছে যাওয়ার আগেই ভয়ঙ্কর একটা গর্জন চমকে দিল ওদের। ঘোরের মধ্যে যেন ফিরে তাকিয়ে পাহাড়ের ঢালের শৈলশিরায় দাঁড়ানো কুগারটাকে দেখতে পেল মুসা। মাথা নিচু করে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। হাঁ করা মুখের মধ্যে মারাত্মক শ্বদন্তগুলো চোখে পড়ছে। আশেপাশের পাথরের সঙ্গে চমৎকার ভাবে মিশে গেছে ওটার চামড়ার রঙ। টানটান হয়ে যাচ্ছে জন্তুটার পেশীগুলো। ঝাঁপ দিতে তৈরি হচ্ছে ভয়ঙ্কর শিকারী।

বোবা হয়ে ওটার চোখে চোখে তাকিয়ে আছে মুসা। জন্তুটার সবচেয়ে কাছে রয়েছে সে।

দুই

দৌড় দেয়ার চেষ্টা বৃথা, বুঝতে পারছে মুসা। মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা হবে তাকে।

আবার গর্জন করে উঠল কুগারটা। আস্তে করে একটা পোল হাত থেকে ছেড়ে দিল মুসা। দুই হাতে তুলে ধরল অন্য পোলটা। ইস্পাতের মাথাওয়ালা ফাইবারগ্লাসের দণ্ডটাই এখন তার একমাত্র অস্ত্র। বিনা যুদ্ধে পরাস্ত হবে না সে।

তীক্ষ্ণ একটা শব্দ হলো হঠাৎ। পিস্তলের গুলির শব্দের মত। চিৎকার দিয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠল কুগারটা। ঝট করে মাথা নিচু করে ফেলে পোলটা সামনে বাড়িয়ে দিল মুসা। কয়েকশো পাউন্ড ওজনের মারাত্মক দাঁত আর নখ সমৃদ্ধ দেহটা গায়ে এসে পড়ার অপেক্ষা করছে।

পড়ল না। কুগারটা তাকে ছুঁলো না লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে আবার সেই

শৈলশিরাটার ওপরই নেমে এল। পাক খেয়ে ঘুরে, শরীর বাঁকিয়ে নিজের নিতম্বে থাবা মারতে শুরু করল, যেন বোলতায় কামড়ে দিয়েছে ওখানে।

জানোয়ারটার চোখে সন্দেহ আর দ্বিধা দেখতে পেল মুসা। ভড়কে যাওয়া ভঙ্গিতে পায়চারি শুরু করল ওটা। তারপর, আচমকা, পেছনের পা দুটো ভাঁজ হয়ে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে দেখল নিজের অবশ হয়ে আসা অর্ধেকটা শরীর। সামনের পা দুটোও ভাঁজ হয়ে গেল। ধপ করে চ্যাপ্টা পাথরের ওপর পড়ে গেল সে। শেষবারের মত হিসিয়ে উঠে নেতিয়ে পড়ল। বুজে এল চোখ। মুসাকে দিয়ে লাঞ্চ করা আর হলো না ওর।

চোখের পাতা সরু করে তাকিয়ে আছে মুসা। কি ঘটে গেল, বুঝতে পারছে না। কাছের একটা পাইন গাছ থেকে লাফিয়ে নামল ক্যামোফ্লেজ পরা একটা মূর্তি। হাতে শক্তিশালী রাইফেল।

'কেউ নড়বে না!' স্কি মাস্কের আড়াল থেকে আদেশ শোনা গেল।

এইমাত্র মুসার প্রাণ বাঁচালেন যিনি, ভারী পায়ে এগিয়ে এসে রাইফেলটা তুলে ধরলেন তার দিকে। 'নাও, ধরো এটা।'

মাস্ক খুলে ঝাড়া দিয়ে লম্বা বাদামী চুলগুলো ছড়িয়ে দিলেন শিকারী। 'আট ঘণ্টা ধরে গাছে বসে আছি আমি, কুগারটার ফেরার অপেক্ষায় মাঝখানে তোমরা ঢুকে পড়ে আরেকটু হলেই কেঁচে দিচ্ছিলে সব।'

স্তব্ধ হয়ে গেছে মুসা কি বলবে? কুগারের আক্রমণের চমক কাটতে না কাটতেই ধমক শুনতে হচ্ছে। তার ওপর শিকারী একজন মহিলা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন মহিলা। ধমকের সুরেই বললেন, 'আমা.. দিকে তুলে ধরে রেখেছ কেন?...আরে, ধুর, আবার মাটির দিকে নামায়! কুগারটার দিকে ধরো না। নড়তে দেখলেই দেবে আরেকটা মেরে।' ঘুরে পাইন গাছটার দিকে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি।

'এক মিনিট ' এতক্ষণে কথা খুঁজে পেল মুসা 'আমি ওটাকে খুন করতে পারব না।'

'তা তো করবেই না!' জবাব দিলেন তিনি। 'গত দশটি বছর ধরে ওকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছি আমি।'

কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। কনুই দিয়ে গুঁতো দিল মুসার গায়ে। 'আজব একটা জিনিস লক্ষ করেছ কুগারটার?'

কিশোর বলার পর এতক্ষণে লক্ষ করল মুসা ব্যাপারটা। রবিন এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। সে-ও দেখল, মোটা কালো একটা কলার লাগানো কুগারের গলায়। গায়ে বিঁধে আছে একটা ডার্ট।

'গুলি করা হয়নি,' কিশোর বলল, 'ট্রাংকুইলাইজার ডার্ট ওষুধের ক্রিয়া শেষ হয়ে গেলেই জ্ঞান ফিরে আসবে।'

মোটা কলারটায় লাগানো বাক্সের মত একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছে মুসা। খুব ছোট একটা ধাতব দণ্ড বেরিয়ে আছে সেটা থেকে। 'কোন ধরনের অ্যান্টেনা নাকি?'

'বাহ্, বুদ্ধিশুদ্ধি তো বেশ ভালই,' মন্তব্য করলেন মহিলা। 'কিন্তু ও রকম বোকার মত কাজ করে বসেছিলে কেন?'

কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি, টের পায়নি কিশোর। নজর ছিল পার্বত্য সিংহটার দিকে। ফিরে তাকাল। 'মুসাকে অবশ্য আমি এ ভাবে ছুটে যেতে মানা করতে চেয়েছিলাম,' বলল সে। 'কিন্তু সুযোগই দিল না। আপনি না থাকলে গেছিল আজ। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না। গাছের মাথায় বসে তো সবই দেখেছেন আপনি। আমাদের সাবধান করে দিতে পারতেন।'

'মাত্র এসেছে তখন কুগারটা,' জবাব দিলেন তিনি। 'ভয় দেখিয়ে তাড়াব নাকি? তা ছাড়া আমি ভেবেছিলাম, ট্রেইল ধরে স্কি করে চলে যাবে তোমরা। মড়ির দিকে নজর দেবে বুঝতে পারিনি। তবে তোমাদের কাজটাকে ভুল বলা যায় না। আমি হলেও ওরকম কৌতূহলী হতাম।' হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি, 'আমি মারিসা কুপার। জীববিজ্ঞানে ডক্টরেট করেছি।'

কিশোরও তাদের পরিচয় দিল।

কাঁধে ঝোলানো লাল ব্যাকপ্যাকটা নামিয়ে তাতে বসলেন ডক্টর কুপার। কিশোর লক্ষ করল, ব্যাগের পেছনে বাঁধা রয়েছে নীল রঙের একটা ধাতব বাক্সের মত জিনিস, সেটা থেকে বেরিয়ে আছে দুই ফুট লম্বা একটা অ্যান্টেনা। বাক্সের ওপরে লাগানো একটা সিগন্যাল মিটার। একপাশের সকেট থেকে ইলেকট্রিকের তার গিয়ে যুক্ত হয়েছে অ্যান্টেনার সঙ্গে।

'তারমানে, কুগারটা এখানে পৌঁছার অনেক আগে থেকেই আসছে যে জেনে গিয়েছিলেন আপনি,' নীল বাক্সটা দেখাল কিশোর। 'কুগারের কলারে লাগানো ওটা রেডিও, তাই না? ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ওটার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন আপনি।'

'এদিকে আসছে বুঝতে পারছিলাম,' ডক্টর কুপার বললেন। 'তবে ঠিক কতটা কাছে এসেছে, বুঝিনি। অত নিখুঁত নয় যন্ত্রগুলো।'

যন্ত্রপাতিগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'কি ভাবে কাজ করে এগুলো?'

'এটাকে বলে ডিরেকশনাল অ্যান্টেনা,' ডক্টর কুপার বললেন। 'এদিক ওদিক তাক করে ঘোরাতে থাকবে যতক্ষণ না সিগন্যাল পাও। তারপর সিগন্যাল যেদিক থেকে পাবে, সেদিকে এগোতে হবে জন্তুটার দেখা পাওয়ার জন্যে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'মিটারের কাঁটাটা যত বেশি ওপরে উঠবে, বুঝতে হবে তত বেশি কাছে পৌঁছে গেছে।'

কৌতূহলী চোখে কিশোরের দিকে তাকালেন ডক্টর কুপার 'আমার কাজটা তো বেশ ভাল বোঝো তুমি।'

'আপনার মত বুঝি না ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে মোটামুটি জ্ঞান আছে আমার,' জবাব দিল কিশোর 'তা ছাড়া জন্তু-জানোয়ার ধরার অভিজ্ঞতাও আছে। সে-জন্যেই বলতে পারছি।'

মহিলাকে ভাল করে দেখল সে লম্বাটে, চ্যাপ্টা মুখ, হালকা-পাতলা শরীর। মুখে বেশ কিছু ভাঁজ, বিশেষ করে সবুজ সদাসতর্ক চোখ ঘিরে, যেটা বলে দিচ্ছে ঘর থেকে বেশি সময় বাইরে বাইরেই কাটান তিনি। বয়েস তিরিশের ঘরে, তবে দেখে অতটা মনে হয় না।

'দশ বছর ধরে কুগারটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন বলে কি বোঝাতে চেয়েছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'শুধু ওই একটাকেই না,' ডক্টর কুপার বললেন, 'বাঁচাতে চাইছি এই পর্বতে যতগুলো কুগার আছে সবগুলোকে। পার্বত্য সিংহের প্রজাতিকে। চারপাশ থেকে ঘিরে আসছে সবাই। গাছপালা কেটে, বনভূমি উজাড় করে গড়ে উঠছে শহর, বাড়িঘর; মানুষের বাসস্থান। বিরাট এলাকা নিয়ে তৈরি করছে গরু-ঘোড়ার র‍্যাঞ্চ। খনি থেকে মূল্যবান ধাতু আর তেল উত্তোলনের নামেও প্রকৃতি ধ্বংস করছে নেহায়েত কম না। অন্তত তিরিশ-চল্লিশ বর্গমাইল জায়গা না পেলে শিকার করে টিকতে পারে না কুগার। কিন্তু যে হারে ওদের জায়গা দখল করে নিচ্ছে মানুষ, এ অবস্থা চলতে থাকলে বিলুপ্ত হতে দেরি হবে না কিন্তু ওদেরও বেঁচে থাকা প্রয়োজন।'

মরা এল্‌কটার দিকে ইঙ্গিত করে মুসা বলল, 'বনের অন্য জানোয়ারেরা আপনার সঙ্গে একমত হবে না।'

'তুমি তো খুব মজার ছেলে হে,' হাসলেন ডক্টর কুপার। 'একমত হতেই হবে কারণ ওদের ভাল থাকার জন্যেও পার্বত্য সিংহের প্রয়োজন। ওই মরা এলকটার মত বুড়ো আর অসুস্থ জানোয়ারগুলোকেই কেবল শিকার করে কুগার। দু'দিন আগে মেরেছে ওটাকে। খেয়ে শেষ করতে পারেনি। বাকিটা লুকিয়ে রেখে গেছে পরে এসে খাওয়ার জন্যে আসবে, আমি জানতাম, তাই গাছে উঠে বসে ছিলাম।'

বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকা কুগারটার দিকে তাকাল মুসা। 'এখন তো পেলেন। কি করবেন?'

'দ্রুত একবার তার মেডিক্যাল চেকআপ করব। তারপর কলারের রেডিওটার ব্যাটারি বদলে দেব।'

'একবার বদলালে কতদিন যায়?' জানতে চাইল রবিন।

'বছরখানেক তো ভাল থাকার কথা,' ডক্টর কুপার বললেন। 'কিন্তু ইদানীং লক্ষ করছি, কয়েক মাসের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গত ছয় মাসে তিনটা কুগারের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়েছি। ব্যাটারি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণেই সম্ভবত সে-জন্যেই সব এখন বদলে দিতে চাচ্ছি।'

খানিক চুপ করে থেকে বললেন আবার, 'আমার এখন ওয়াশিংটনে থাকার কথা। রিসার্চের ফান্ড বাড়ানোর জন্যে সিনেটর আর ফিশ অ্যান্ড ওয়াইল্ডলাইফ সার্ভিসের কাছে ঘ্যানর-ঘ্যানর করার চেয়ে ব্যাটারি বদলানোটা বেশি জরুরী মনে হয়েছে আমার কাছে। তাই সব বাদছাদ দিয়ে চলে এসেছি।'

গিরিখাতের দেয়ালের কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। কুগারটাকে দেখিয়ে বললেন, 'ও জেগে ওঠার আগেই কাজটা সারা দরকার।' গোয়েন্দাদের দিকে ফিরলেন। 'ওকে নামাতে সাহায্য করবে? ওপরে কাজ করার চেয়ে নিচে অনেক সুবিধে।'

'বলুন, কি করতে হবে?' এগিয়ে গেল মুসা।

কিশোর আর রবিনও গিয়ে দাঁড়াল তার পাশে।

তাকটা হাতের নাগালের বাইরে। দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যায় না। লাফ দিয়ে উঠে কার্নিসটা ধরে ঝুলে পড়ল মুসা। বেয়ে উঠে গেল ওপরে। হাত বাড়িয়ে টেনে তুলল কিশোরকে। কি করে নামালে সুবিধে হবে, নিচ থেকে বলে দিতে লাগলেন ডক্টর কুপার। দড়ি সরবরাহ করলেন। ওপর থেকে কুগারটাকে নামিয়ে দিল কিশোর আর মুসা। ধরে ধরে মাটিতে নামাল রবিন আর ডক্টর কুপার। কাজটা মোটেও সহজ হলো না। আকার দেখে অত ভারী যে বোঝা যায় না।

'বাপরে বাপ, মেলা ওজন!' মুসা বলল। 'দুশো পাউন্ডের কম হবে না!'

'গত সেপ্টেম্বরে একশো ঊনআশি ছিল,' ডক্টর কুপার জানালেন। 'যতগুলো কুগারকে কলার পরিয়েছি, তারমধ্যে এটা সবচেয়ে বড়।' হাঁটু গেড়ে বসে আঙুল দিয়ে ঠোঁট সরিয়ে দাঁত দেখতে শুরু করলেন তিনি।

'এ পর্যন্ত মোট ক'টা কুগারকে কলার পরিয়েছেন?' জানতে চাইল কিশোর।

প্যাক থেকে একটা স্টেথোস্কোপ টেনে বের করতে করতে ডক্টর কুপার বললেন, 'কথা বলার সময় নেই এখন। কাজটা সারতে সময় লাগবে আমার। ওর জেগে ওঠার সময় কাছাকাছি থাকাটা ঠিক হবে না তোমাদের। আধঘণ্টার মধ্যেই জেগে উঠবে।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বললেন, 'আমাকে সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ কিন্তু আমি যখন কাজ করি, দয়া করে তোমরা কাছে না থাকলেই খুশি হব।'

'আমিও খুশি,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল মুসা। 'কুগারের সঙ্গে কুস্তি লড়ার কোন ইচ্ছেই আমার নেই। কিন্তু কথা হলো, আপনি একা পারবেন তো?'

হেসে বললেন ডক্টর কুপার, 'একা কাজ করতেই অভ্যস্ত আমি। নিশ্চিন্তে চলে যাও।'

তিন

বিশাল এক পার্বত্য সিংহের সঙ্গে ডক্টর কুপারকে একা ফেলে আসার ইচ্ছে ছিল না কিশোরের। কিন্তু কিছু বলে লাভ হবে না বুঝতে পারল। যে পথে যাচ্ছিল, এগিয়ে চলল। আরও আধঘণ্টা স্কি করার পর উত্তরের পর্বত চূড়ার কাছে কালো মেঘ জমতে দেখল। এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

পাহাড়ের ঢালের মাঝামাঝি জায়গায় ক্যাম্প করার জায়গা বেছে নিল কিশোর। ঝোড়ো বাতাসের ঝাপটা কম লাগবে এখানে। সঙ্গে করে আনা হালকা তাঁবুটা খাড়া করতে সময় লাগল না। খুদে একটা বুটেন স্টোভ জ্বেলে খাবার গরম করে খেয়ে নিল ওরা। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়ল স্লীপিং ব্যাগে

সারাদিনে প্রচুর পরিশ্রম করেছে। মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়ল। রাতে মাঝে মাঝেই চমকে চমকে জেগে উঠল সবাই, বাতাসের গর্জনে। ক্রমাগত তাঁবুর গায়ে ঝাপটা মারতে থাকল ঝোড়ো হাওয়া। তাঁবু উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ভয়ে শঙ্কিত হয়ে থাকল ওরা

ভোর হতে হতে তুষারে অর্ধেক ঢেকে গেল তাঁবুটা তাতে ভালই হলো।

নিচের ফাঁকগুলো পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। বাতাস ঢুকতে পারছে না আর। গরম রইল তাঁবুর ভেতরটা। হাই-প্রোটিন গ্র্যানোলা বার দিয়ে নাস্তা সারল ওরা। ঝড় থামার অপেক্ষা করতে লাগল। ন'টার পর তুষারপাত বন্ধ হলো মিনিট পনেরোর জন্যে। তারপর আবার শুরু হলো। দশটার আগে সূর্য দেখা দিল না।

'এখান থেকে ট্রেইলটা কোনদিকে গেছে?' তাঁবু গোটাতে গোটাতে প্রশ্ন করল মুসা।

গাছের দিকে তাকাল কিশোর। ডালগুলো সব নুয়ে পড়েছে তুষারের ভারে। 'আর না এগিয়ে মনে হয় ফিরে যাওয়াই ভাল।'

ওর দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। 'কেন? খাবারে তো ঘাটতি পড়েনি। পাঁচ দিন অনায়াসে চলে যাবে।'

'তুষার-ধস নামে এ সব অঞ্চলে যখন তখন,' কিশোর বলল। 'প্রচুর তুষারপাত হয়েছে। গাছের অবস্থা দেখেছ? পাহাড়ের ঢালে কি পরিমাণ জমেছে বোঝা যায়। এগোনোর চেষ্টা করলে বিপদে পড়ব।'

রবিনেরও ফিরে যাবার ইচ্ছে।

'তাহলে আর কি, ফিরেই চলো,' হতাশ মনে হলো মুসাকে। এত তাড়াতাড়ি এল্‌ক্ স্প্রিং শহরে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না তার। কিন্তু উপায়ও নেই।

দুপুর হয় হয়, এমন সময় গিরিখাতের সেই জায়গাটাতে পৌঁছল ওরা যেখানে ক্ষুধার্ত কুগারটার সঙ্গে রেখে গিয়েছিল ডক্টর কুপারকে।

একটা পাইন গাছের গোড়ায় জমা বরফের স্তূপ থেকে কয়েক ইঞ্চি বেরিয়ে থাকা ডক্টর কুপারের লাল ব্যাকপ্যাকটা চোখে পড়ল কিশোরের। সেটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'মনে হচ্ছে এই এলাকাতেই রাত কাটিয়েছেন ডক্টর

'কিন্তু তিনি গেলেন কোথায়?' এগোতে গিয়ে কি যেন ঘষা লাগল রবিনের স্কি'র তলায়। একটা ধাতব জিনিস চোখে পড়ল তার। নিচু হয়ে তুলে নিল। তুষার সরাতেই বেরিয়ে পড়ল ছয় ইঞ্চি লম্বা একটা সিলিন্ডার, খুদে একটা অ্যান্টেনা লাগানো। আকারের তুলনায় যথেষ্ট ভারী। 'এটা খুঁজতে গেলেন নাকি?'

'উঁহু,' গম্ভীর হয়ে গেছে কিশোরের কণ্ঠ, 'খোঁজাখুঁজির পর্যায়ে নেই উনি এখন।' লাল ব্যাকপ্যাকটার ওপাশে, পাইন গাছটা থেকে দূরে দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে তার। আরেক ঝলক লাল রঙ চোখে পড়ছে। ব্যাগের রঙের চেয়ে গাঢ় রঙ। গোলাকার। তুষারের মধ্যে থাকাতে অনেক বেশি স্পষ্ট লাগছে। রক্ত! বুঝতে সময় লাগল না তার। নিথর হয়ে পড়ে থাকতে দেখল ডক্টর মারিসা কুপারকে।

ছুটে গেল ওরা।

চিৎ হয়ে পড়ে আছেন ডক্টর কুপার মুখটা কাত হয়ে গিয়ে গাল ঠেকে আছে বরফে। শরীরের ওপর তুষারের আস্তর। বুকের কাছটা রক্তে লাল।

স্কি খুলে নিয়ে হাঁটু গেড়ে তাঁর কাছে বসে পড়ল কিশোর। ঘাড়ের কাছে আঙুল রেখে নাড়ি দেখল। 'দুর্বল,' বলল সে। 'তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে হয়তো বাঁচানো যাবে।' রবিনের দিকে তাকাল সে, 'রবিন, ফার্স্ট এইড বক্সটা দাও, জলদি!'

'কুগারটার কাছে একা ফেলে যাওয়া মোটেও উচিত হয়নি,' মুসা বলল।

ক্ষতের দিকে তাকিয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'কুগার যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে, জানতাম না!'

'মানে?' হাঁ হয়ে গেল মুসা।

মুসার দিকে মুখ তুলল কিশোর। 'গুলি করা হয়েছে।'

'গুলি!' কিশোরের কথার প্রতিধ্বনি করল মুসা। 'কে গুলি করল?'

'সেটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে। এখন তাঁকে হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করা দরকার।'

'নাড়াচাড়া করাটা কি ঠিক হবে?'

'না নেড়ে নেব কি করে?'

'আমি আর রবিন বরং থেকে যাই এখানে,' মুসা বলল। 'তুমি গিয়ে সাহায্য নিয়ে এসো।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'একবারের জায়গায় তাতে তিনবার যাতায়াত করা লাগবে। এল্ক স্প্রিঙে যাব, ডাক্তার নিয়ে ফিরে আসব, তারপর ডক্টর কুপারকে নিয়ে আবার শহরে ফিরে যাব—ততক্ষণ তিনি টিকবেন বলে মনে হয় না।'

ক্ষতটায় ব্যান্ডেজ বাঁধতে আরম্ভ করল কিশোর। 'তাঁর স্কি আর পোল দিয়ে একটা ফ্রেম বানাব প্রথমে। তার সঙ্গে গাছের ডাল বেঁধে একটা কাজ চলার মত স্লেজ বানাব। তাতে পাতা বিছিয়ে গদি তৈরি করে তার ওপর ডক্টরকে রেখে টেনে নিয়ে যাওয়া খুব একটা কঠিন হবে না। কি বলো?'

এক মুহূর্তও দেরি না করে স্লেজ বানাতে বসল মুসা। আঙুল ব্যবহারে সুবিধের জন্যে দস্তানা দুটো খুলে নিয়ে পকেটে ভরে রাখল। তাকে সাহায্য করল রবিন আর কিশোর।

ছোট সিলিন্ডারের মত জিনিসটার ওপর আবার চোখ পড়তে কিশোরকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'ট্র্যান্সমিটার নাকি?'

'মনে হয়। রেখে দাও ডক্টরের ব্যাগে,' পাইনের ডাল ছেঁটে সমান করতে করতে জবাব দিল কিশোর।

বিচিত্র স্লেজটার ওপর সাবধানে ডক্টর কুপারের অজ্ঞান দেহটা তুলে চিৎ করে শুইয়ে দিল ওরা। স্লেজে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে চলল গিরিখাতের মাঝখান দিয়ে যাওয়া ট্রেইল ধরে। কাজটা মোটেও সহজ নয়। দেখতে দেখতে ঘামে ভিজে যেতে লাগল ওদের শরীর।

বিকেলবেলা এসে পৌঁছল ট্রেইলের মাথায়, যেখানে গাড়িটা রেখে গিয়েছিল। ভাড়া করে এনেছে। একটা সেডান গাড়ি। ডক্টরকে তুলে শুইয়ে দিল পেছনের সীটে।

গাড়ি চালাল মুসা। নতুন জমা তুষারের আস্তরের ওপর দিয়ে গাড়ি চালাতে যথেষ্ট সাবধান হতে হলো ওকে।

পিচ্ছিল পাহাড়ী পথ। একটু এদিক ওদিক হলে খাদে পড়ে মরতে হবে। এল্ক স্প্রিঙে যেতে মাত্র পাঁচ মাইল পথ পেরোতে একটা ঘণ্টা লেগে গেল।

নীল সাইনবোর্ডের ওপর সাদা অক্ষরে লেখা ইংরেজি 'এইচ' শব্দটা দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। 'পাওয়া গেছে হাসপাতালটা,' কিশোরকে নয়, যেন

নিজেকেই শোনাল মুসা।

আরেকবার ডক্টর কুপারের নাড়ি দেখল কিশোর। এ নিয়ে কতবার যে দেখল, বলতে পারবে না। 'নাহ্, চলছে। খুব দুর্বল।'

চার

নীল সাইনবোর্ডের নির্দেশক দেখে দেখে বড় একটা বিল্ডিঙের সামনে গাড়ি থামাল মুসা। কাউন্টি হাসপাতালটা এত নতুন আর এত বড় হবে কল্পনা করেনি।

ডক্টর কুপারের ক্ষতটার দিকে একবার চোখ বুলিয়েই সোজা সার্জারিতে নিয়ে যেতে নার্সকে হুকুম দিলেন ইমার্জেন্সির ডাক্তার।

প্রশ্নের ঝাঁক ছুটে আসতে শুরু করল গোয়েন্দাদের দিকে: তোমরা কে? কেন গিয়েছিলে ওখানে? কখন গুলি খেয়েছেন ডক্টর কুপার? কি করে ঘটল ঘটনাটা? আনলে কি করে?

ওয়েইটিং রুমে অপেক্ষা করতে লাগল তিন গোয়েন্দা। প্রায় এক ঘণ্টা পর সার্জারি থেকে বেরিয়ে এসে ডাক্তার জানালেন, আপাতত বেঁচে গেছেন ডক্টর কুপার। তবে কখন জ্ঞান ফিরবে, আদৌ ফিরবে কিনা, নিশ্চিত হয়ে বলতে পারলেন না।

ডাক্তার চলে গেলে মুসাকে বলল কিশোর, 'পুলিশকে জানানো দরকার। থানাটা খুঁজে বের করতে হবে।'

'তার আর দরকার হবে না,' ভারী কণ্ঠে জবাব শোনা গেল। ফিরে তাকাল তিনজনেই। মোটাসোটা একজন মানুষ। ঝুলে পড়া গোঁফ। ওয়েইটিং রুমে ওদের সঙ্গেই বসে ছিলেন এতক্ষণ। কিন্তু নজর দেয়নি গোয়েন্দারা। ধূসর রঙের ছোঁয়া লেগেছে তাঁর চুল আর গোঁফে। চুল পুরোটা দেখা যাচ্ছে না স্টেটসন হ্যাটে ঢেকে রয়েছে বলে, তবে যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতেই রঙটা স্পষ্ট। র‍্যাঞ্চারদের মত পোশাক পরেছেন।

'আপনাকে তো চিনলাম না?' কিশোরের প্রশ্ন।

কানায় ঠেলা দিয়ে হ্যাটটা পেছনে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। 'আমি আর্ক হ্যামিলটন।' শার্টের পকেট থেকে পাতলা একটা চামড়ার কেস বের করে আনলেন। অভ্যস্ত হাতে ঝাড়া দিয়ে খুলে ফেললেন পুরোটা। ফ্লোরেসেন্ট আলোয় ঝিক করে উঠল সোনালি ব্যাজ। 'আমি এখানকার শেরিফ। একজন বন্ধুকে দেখতে হাসপাতালে এসেছিলাম। এ সময় তোমরা ঢুকলে মারিসা কুপারকে নিয়ে।'

'তিনি যে গুলি খেয়েছেন, এ কথা তো তাহলে জেনেই গেছেন,' কিশোর বলল। 'এতক্ষণ ওখানে বসে বসে আমাদের দিকে নজর রেখেছিলেন, বোঝার চেষ্টা করছিলেন, আমাদের কথা কতটুকু বিশ্বাস করা যায়, তাই না?'

বিচিত্র হাসি দেখা দিল শেরিফ হ্যামিলটনের ঠোঁটে। ঘুরিয়ে জবাব দিলেন কিশোরের প্রশ্নের, 'বিশ বছর কোন কাজে অভিজ্ঞ হওয়ার পর প্রাথমিক কাজগুলো আর তেমন কঠিন থাকে না, কি বলো?' কোটরে বসা চোখে আলো ঝিলিক দিল

তাঁর। বোঝা গেল, এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি ওদের।

'আমি কিশোর পাশা,' পরিচয় দিল সে। 'ও মুসা আমান। আর ও রবিন মিলফোর্ড। আমার বন্ধু। ছুটি কাটাতে এসেছি আমরা।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরব থেকে শেরিফ বললেন, 'রাস্তার ধারে মারিসাকে খুঁজে পেয়েছ বলছ?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর। 'এমন করে বলছেন আপনি, মনে হচ্ছে ডক্টর কুপারকে চেনেন?'

মৃদু হাসলেন শেরিফ। 'এখানকার কে ওকে না চেনে? এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চারদের একজন ছিলেন ওর বাবা। এখন আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও দেখি।'

'কি প্রশ্ন?'

'পর্বতের ওখানে আসলে কি করতে গিয়েছিলে তোমরা?'

'স্কি করতে,' সহজ ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর।

'ঠিক কোনখানটাতে?'

ম্যাপ বের করে দেখাল কিশোর, কোন্ জায়গায় স্কি করছিল ওরা, আর কোন্খানে খুঁজে পেয়েছে ডক্টর কুপারকে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুরো একটা মিনিট চুপচাপ গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন শেরিফ। তারপর বললেন, 'একআধটু শিকারের ইচ্ছেও হয়েছিল নিশ্চয়, তাই না? হরিণ মারতে গিয়ে দুর্ঘটনাক্রমে গুলি লাগিয়ে দিয়েছ মারিসার বুকে।'

শুনে তেমন অবাক হলো না কিশোর। এ রকম সন্দেহই আশা করেছিল শেরিফের কাছে। একজন দক্ষ গোয়েন্দা সহজ সম্ভাবনাগুলোই খুঁটিয়ে দেখবে প্রথমে।

'না,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর, 'আমরা শিকারী নই। আমাদের মালপত্র চেক করে দেখতে পারেন। অস্ত্র তো দূরের কথা, শিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন জিনিসই খুঁজে পাবেন না।'

শ্রাগ করলেন শেরিফ। 'জানি। অপরাধের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে না তোমাদের আচরণে।' চিন্তিত ভঙ্গিতে গোঁফে টোকা দিলেন তিনি 'ক'টার সময় পেয়েছ তাকে?'

কিশোর জানাল, 'আমার ঘড়িতে তখন এগারোটা সতেরো।'

অবাক হলো মুসা এ রকম অবাক তাকে বহুবার করেছে কিশোর। এত উত্তেজনার মাঝে ঘড়ি বলে যে একটা জিনিস আছে, সেটাই মনে ছিল না তার, কিন্তু কিশোর ঠিকই সময়টা দেখে রেখেছে।

'তারমানে,' হিসেব করে বললেন শেরিফ, 'গুলি খাওয়ার আধঘণ্টা পরে গিয়েছ তোমরা।'

চোখের পাতা সরু হয়ে এল কিশোরের। 'আমরা যখন তাঁকে পেয়েছি, গায়ের ওপর তুষারের স্তর জমতে আরম্ভ করেছে কেবল। তারমানে আধঘণ্টাই হবে। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?'

'মারিসার হাতে একটা ঘড়ি ছিল শেরিফ জানালেন। 'দশটা ছেচল্লিশ মিনিটে

বন্ধ হয়ে গেছে। কাঁচ ভাঙা। পড়ে যাওয়ার সময় পাথরে বাড়ি লেগেছিল হয়তো।'

খবরটা অবাক করল কিশোরকে। ঘড়িটা কি করে নজর এড়াল তার! কল্পনায় ঘটনাস্থলটা দেখার চেষ্টা করল আবার। ডক্টর কুপারের হাতে দস্তানা ছিল। তাতে ঢেকে থাকাতেই ঘড়িটা দেখেনি সে। কিন্তু কোথায় যেন কি একটা গোলমাল রয়ে গেছে। খাপে খাপে মিলছে না।

স্কি জ্যাকেট পরা লম্বা একজন লোক হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল। চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল কিশোরের। দুই গোয়েন্দার দিকে এক নজর তাকিয়েই চোখ ফেরাল শেরিফের দিকে। 'মারিসা কেমন আছে?'

নতুন লোকটাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল কিশোর। বরফ-নীল চোখ। খাটো করে ছাঁটা হালকা বাদামী চুল। ছিপছিপে সুগঠিত শরীর। দীর্ঘ সময় ঠাণ্ডা অঞ্চলের রোদ-বাতাসে বাইরে পড়ে থাকার ঘোষণা দিচ্ছে মুখের চামড়ার পোড়া রঙ।

'অবস্থা বিশেষ ভাল না, ফ্র্যাঙ্ক হ্যান,' সত্যি কথাটাই জানালেন আগন্তুককে শেরিফ 'বেঁচে যে আছে এখনও, ওই ছেলেগুলোর বদান্যতায়। একটা ধন্যবাদ দাও কিশোর পাশা, মুসা আমান আর রবিন মিলফোর্ডকে। তোমরা কথা বলো, আমি কিছু খোঁজ-খবর নিয়ে আসি।' দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকালেন গোয়েন্দাদের দিকে। 'আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত থেকো, নাকি?' জবাবের অপেক্ষা না করে চলে গেলেন তিনি।

অবাক দৃষ্টিতে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে আছে ফ্র্যাঙ্ক হ্যান। 'কিছু তো বুঝতে পারছি না। তোমরা কি মারিসার সঙ্গে কাজ করছ? তার অ্যাসিস্ট্যান্ট?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছে গিয়েছিলাম, ব্যস। আপনি কি তাঁর কিছু হন?'

মৃদু হাসি ফুটল ফ্র্যাঙ্ক হ্যানের ঠোঁটে। 'না তবে দীর্ঘ দিনের বন্ধু আমরা। বহুদিন ওর সঙ্গে কাজও করেছি আমি, ওর গবেষণায় সাহায্য করেছি।'

'ডক্টরের ওপর আক্রোশ আছে, এমন কাউকে চেনেন আপনি?'

'চিনি।' চোখের পাতা সরু হয়ে গেল ফ্র্যাঙ্ক হ্যানের। 'বুঝেশুনে কেউ গুলি করেছে নাকি?'

'করতে পারে। আপনার কি ধারণা?'

জানালার কাছে এগিয়ে গেল ফ্র্যাঙ্ক হ্যান। দূরের পর্বতের দিকে তাকাল। 'আমিও তোমার সঙ্গে একমত,' দ্বিধায় ভরা কণ্ঠ। 'এটা একটা ক্যাট্‌ল্ টাউন। যে কোন র‍্যাঞ্চারের কাছে কুগার হলো একটা মূর্তিমান আপদ। সেই কুগারকে রক্ষা করতে চাইছে মারিসা কুগার শিকার এখন অনেক কমিয়ে দেয়া হয়েছে সরকারী ভাবে। শীতকালে প্রতি সীজনে প্রতিজনে একটার বেশি না। কিন্তু সেটাও সহ্য করতে রাজি নয় মারিসা। সে মারতেই দিতে চায় না ওয়াশিংটনের একটা জানোয়ার সংরক্ষণ সংস্থার সদস্য হিসেবে কাজ করছে সে। ন্যাশনাল ফরেস্টগুলোতে শিকার করাই বন্ধ করে দিতে চাইছে। তাতে রেগে গেছে স্থানীয় কিছু ক্যাট্‌ল্ ব্যারন।'

'বিশেষ কারও নাম উল্লেখ করতে পারেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'তা পারি,' বলতে সামান্য দ্বিধা করল ফ্র্যাঙ্ক হ্যান। 'এ এলাকার সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চার জেরাল্ড থার্স্টন। মারিসার সঙ্গে ভাল একটা লাগালাগি হয়ে গেছে তার। অবৈধ ভাবে কুগার শিকারের অভিযোগ এনে তাকে অ্যারেস্ট করানোরও চেষ্টা করেছে মারিসা। প্রমাণ করতে পারেনি বলে রক্ষা।'

'আর কেউ?'

'আছে।' সামান্য বিরতি দিয়ে জবাব দিল ফ্র্যাঙ্ক হ্যান, 'রাম্পা ওয়ালাপ্যাটুকুংক। তার গোত্রের লোকেরা তাকে যে নামে ডাকে সেটার ইংরেজি করলে দাঁড়ায় লঙ হার্ট'। সহজ বলে আমরাও ওই নামেই ডাকি। ও একজন নেটিভ আমেরিকান। ন্যাশনাল ফরেস্টের একটা বিরাট অংশ তার গোত্র ইউটিদের সম্পত্তি বলে দাবি করছে। ওই জায়গার প্রাণীকুলকে রক্ষা করারই চেষ্টা চালাচ্ছে মারিসা আর তার দল।'

'রাম্পা ওয়ালাপ্যাটুকুংক।' কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'ইনডিয়ান নাম না?'

জবাব দিল ফ্র্যাঙ্ক হ্যান, 'হ্যাঁ, ইনডিয়ান। ইউটি ইনডিয়ান।'

'হুঁ,' নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'দুজনের নাম জানা গেল। আর কেউ?'

'আছে। তবে এই দুজনই প্রধান।'

'আপনারও কি র‍্যাঞ্চ আছে?'

হাসল ফ্র্যাঙ্ক হ্যান। 'না, আমি ওসব ঝুট-ঝামেলায় নেই। শহরে একটা ছোটখাট দোকান করি, ক্যাম্প করার প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র পাবে আমার দোকানে।'

'ভালই হলো,' হাসল কিশোর। 'বাড়ি ফেরার আগে সময় পেলে যাব আপনার দোকানে। কয়েকটা জিনিস দরকার আমাদের।'

'এত জলদি বাড়ি ফেরা হচ্ছে না তোমাদের,' দরজার কাছ থেকে শোনা গেল শেরিফের কণ্ঠ। কতক্ষণ ধরে ওখানে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিলেন তিনি, বুঝতে পারল না কিশোর।

'অসমাপ্ত কিছু কাজ শেষ করতে হবে আমাদের,' ভ্রূকুটি করলেন শেরিফ। পেছনে দাঁড়ানো তাঁর দুজন ডেপুটি। পাথরের মত মুখ করে রয়েছে। দুই গোয়েন্দার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালেন তিনি, 'এসো আমাদের সঙ্গে।'

'আপনি কি আমাদের অ্যারেস্ট করতে চাইছেন?' শেরিফের চোখে চোখে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'শক্ত প্রমাণ দরকার হবে তাহলে।'

'অ্যারেস্ট?' ঝোপের মত দেখতে এক ভুরু উঁচু করলেন শেরিফ। 'তা করব কেন? অ্যাভালান্শ্ হোটেলে তোমাদের জন্যে রূম বুক করা হয়েছে, শহর কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে।' বুড়ো আঙুল তুলে কাঁধের ওপর দিয়ে দুই ডেপুটিকে দেখালেন তিনি, 'মারটিন তোমাদেরকে গাড়িতে করে পৌছে দেবে ওখানে। আর কিছু কাজ সেরে তোমাদের গাড়িটা নিয়ে যাবে ল্যানি।'

হোটেলে রূম বুক! তারমানে নজর বন্দী। 'কিছু কাজ সেরে' বলে কি বোঝাতে চাইছেন শেরিফ, বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোরের। গাড়িটাতে সার্চ করা হবে। খোঁজা হবে তন্নতন্ন করে। শেরিফের কথায় কিশোর রাজি না হলে কি করবেন তিনি, বলা কঠিন, তবে সেটা ভাল কিছু হবে না। তাই আপাতত মুখ বন্ধ রেখে যা করতে

বলা হচ্ছে, সেটাই করার সিদ্ধান্ত নিল সে। এত তাড়াতাড়ি রাগানো উচিত হবে না শেরিফকে।

পাঁচ

পরদিন সকাল ঠিক সাতটায় এসে গোয়েন্দাদের দরজায় টোকা দিল শেরিফ হ্যামিলটনের নির্বাক ডেপুটি মারটিন। গায়ে চামড়ার জ্যাকেট, ভেড়ার লোমের লাইনিং দেয়া।

'এতদিনে ছুটিটা বেশ জমে উঠছে মনে হয়,' মুসা বলল, গাড়িতে করে ওদের নিয়ে এসে যখন বেড়া দেয়া একটা জায়গায় ঢুকল মারটিন।

জায়গাটা হেলিপ্যাড। হাসপাতালের পেছনে। একটা হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছে। সকালের নির্মল বাতাস কেটে ঘুরতে শুরু করেছে ওটার রোটর ব্লেড। কাদের জিনিস, গায়ে লেখা নেই। ভেতরে বসে আছেন শেরিফ আর পাইলট।

পেছনের ছোট সীটটায় গাদাগাদি করে বসতে হলো তিন গোয়েন্দাকে। কানে হেডসেট পরতে দেয়া হলো তিনজনকেই, শেরিফ আর পাইলট যে রকম পরেছে। মুখের সামনে খুদে মাইক্রোফোন। রোটরের বিকট শব্দের মধ্যেও কথা চালানো যাবে এই হেডসেট আর মাইক্রোফোনের সাহায্যে।

'এত ছোট শহরের তুলনায় আপনাদের হাসপাতালটা কিন্তু বিরাট,' কিশোর বলল।

'শুধু শহর তো নয়, পুরো কাউন্টির জন্যেই বানানো হয়েছে,' শেরিফ জানালেন। 'ল্যান্ডিং প্যাডটা তৈরি করা হয়েছে অ্যামবুলেন্স চপারের (হেলিকপ্টার) জন্যে।'

'এটা কি হাসপাতালের হেলিকপ্টার?'

'না। জরুরী কাজের কথা বলে ধার নেয়া হয়েছে।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'সত্যি জানো না?' শেরিফের কণ্ঠ জোরাল হয়ে বাজল মুসার কানে।

চুপ হয়ে গেল মুসা। কোথায় যাচ্ছে ওরা, অনুমান করতে পারছে।

স্কি করে যে জায়গাটা পার হয়ে আসতে কয়েক ঘণ্টা লেগেছিল ওদের, হেলিকপ্টারে করে সেটা পেরোতে লাগল মাত্র কয়েক মিনিট। যে জায়গায় গুলি খেয়েছেন ডক্টর কুপার, সেখান থেকে কিছুটা দূরে কপ্টার নামাতে বললেন শেরিফ। আগের দিন কিশোরদের রেখে যাওয়া স্কি'র দাগ স্পষ্ট হয়ে আছে বরফে। সেটা ধরে এগোল ওরা।

পুরো এলাকাটা ঘুরে দেখতে লাগলেন শেরিফ মাঝে মাঝে নিচু হয়ে ঝুঁকে দেখছেন। পাইন গাছটার কাছে রক্তের দাগের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনশো ষাট ডিগ্রি পাক খেয়ে ভালমত দেখলেন গিরিখাতটা। গোয়েন্দাদের দিকে তাকালেন, 'এখানেই পেয়েছ তাকে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' মুসা বলল।

ঠেলা দিয়ে হ্যাটটা পেছনে সরিয়ে মাথা চুলকালেন শেরিফ। 'একটা ব্যাপারে শিওর হয়ে গেলাম, কাছে থেকে গুলি করা হয়নি তাকে।'

'কি করে শিওর হলেন?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'সহজ,' শেরিফের হয়ে মুসার প্রশ্নের জবাবটা দিল কিশোর, 'স্কি'র দাগ আছে মাত্র তিন সেট। গতকাল আমরা যেগুলো রেখে গিয়েছিলাম।'

'ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেন্টও হতে পারে,' শেরিফ বললেন। 'কোন শিকারী হয়তো হরিণ-টরিণকে গুলি করেছিল, মিস হয়ে এসে লেগেছে মারিসার গায়ে। বেচারা বুঝতেই পারেনি কারও গায়ে লেগেছে গুলিটা।'

'আমি সেটা বিশ্বাস করি না,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কিশোর।

এক ভুরু উঁচু করলেন শেরিফ। 'কেন?'

'কেন, আপনি বুঝতে পারছেন না!' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল কিশোর। 'আমাদেরগুলো ছাড়া আশেপাশে আর কোন স্কি'র দাগ নেই। তারমানে গিরিখাতের ওপরে ছিল শিকারী। তুষার পড়ছিল না তখন। ওপর থেকে নিচের শিকারের দিকে গুলি চালালে এ জায়গাটা পরিষ্কার দেখতে পাওয়ার কথা তার।'

'এটাকে দুর্ঘটনা হিসেবেই ধরে নিতে হচ্ছে,' শেরিফ বললেন। 'কারণ এ ছাড়া আর কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না আমি আপাতত।' তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালেন তিনি। 'এখন তোমরা মুক্ত। যখন খুশি চলে যেতে পারো শহর ছেড়ে।'

'ভেবে দেখব,' জবাব দিল কিশোর।

আরও কয়েক মিনিট ঘোরাঘুরি করে কাটাল ওখানে ওরা। কিশোর লক্ষ করল, শেরিফ আর তেমন সূত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন মনে হয় তিনি।

হোটেলে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। সকাল শেষ হতে এখনও অনেক দেরি। কেন তদন্তে অনিচ্ছা জন্মেছে শেরিফের, মনে মনে একটা ব্যাখ্যা খাড়া করে ফেলল কিশোর। 'ফ্র্যাঙ্ক হ্যান যে র‍্যাঞ্চারের কথা বলল আমাদের—জেরাল্ড থার্সটন—নিশ্চয় এখানে সাংঘাতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি তাঁর।'

'তারমানে,' কিশোরের কথার খেই ধরে বলল রবিন, 'থার্সটনকে সন্দেহ করেই তদন্তের ইচ্ছা ত্যাগ করেছেন শেরিফ?'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'প্রমাণের অপেক্ষায় আছেন তিনি। জোরাল প্রমাণ জোগাড় করতে পারলে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন থার্সটনের ওপর।'

'সুতরাং প্রমাণটা এখন জোগাড় করে দিতে হবে আমাদের, এই তো?' চওড়া হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুসার মুখে। 'তাহলে স্কি বাদ পায়ে দিতে হবে র‍্যাঞ্চারের কাঁটাওয়ালা জুতো, "গরুর" সঙ্গে কথা বলতে যাওয়ার জন্যে।'

ছয়

থার্সটনের র‍্যাঞ্চ খুঁজে বের করাটা মোটেও কঠিন হলো না। বরং এল্‌ক্ স্প্রিঙে এমন

কাউকে পাওয়া দুষ্কর, যে দুই হাজার একর জমির ওপর তৈরি র‍্যাঞ্চটা চেনে না।

মগজের মধ্যে যে চিত্রটা নিয়ে দেখতে এসেছিল মুসা, সেই পুরানো ওয়াইল্ড ওয়েস্ট সিনেমায় দেখা র‍্যাঞ্চের আদল, তার সঙ্গে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। লম্বা কাঠের তৈরি চালাঘর, গোলাঘর আর শ্রমিকদের থাকার ঘরগুলো পুরানো ধাঁচে তৈরি। কিন্তু বরফে চলার উপযোগী স্নো-মোবাইল আর নানা রকম গাড়ির বহর দাঁড়িয়ে আছে যে বাড়িটার সামনে, সেটা অত্যাধুনিক।

গেটে দাঁড়ানো প্রহরীর মাথায় স্টেটসন হ্যাট, পরনে নীল জিনস। মোটামুটি পুরানো আমলের কাউবয়দের মতই। তবে কোমরের বেল্টে ঝুলছে রিভলভার বা সিক্স-শুটারের বদলে ওয়াকি-টকি।

একটুও গতি শ্লথ না করে গেটের পাশ কাটিয়ে এল মুসা। 'ভুল হলে শুধরে দিও,' বলল সে। 'যে জায়গাটা খুঁজতে এসেছি, সেটার পাশ কাটিয়ে এলাম না?'

'শুধরে দেয়ার জন্যে আমি সদাপ্রস্তুত,' মুচকি হেসে জবাব দিল কিশোর। 'চলতে থাকো।'

রবিন কিছু বলছে না। তাকিয়ে আছে র‍্যাঞ্চের দিকে।

বেশ কয়েকটা মোড় ঘুরে ভাড়াটে সিডানটাকে নিয়ে একটা বুনো অঞ্চলে ঢুকে পড়ল মুসা। রিয়ারভিউ মিররে দেখল আর কোন গাড়ি অনুসরণ করছে কিনা। দাঁড় করাল রাস্তার পাশে। 'এরচেয়ে গেট দিয়ে ঢুকে সোজা গিয়ে সদর দরজার সামনে দাঁড়ালে হত না? আমন্ত্রণও জানাতে পারত।'

টান দিয়ে পার্কার জিপার তুলে দিল কিশোর। কানের ওপর টেনে দিল স্কি ক্যাপের কানা। হাত ঢোকাল মোটা দস্তানায়। 'গাড়ির দরকার কি, হেঁটে গিয়েই দেখা যাক না কি করে!' দরজা খুলতেই ঝাপটা মারল কনকনে ঠাণ্ডা ঝোড়ো বাতাস।

নিচু একটা কাঁটাতারের বেড়ার কাছে এসে দাঁড়াল তিনজনে। এই বেড়া গরুকে ঠেকাতে পারলেও মানুষকে পারে না। তার প্রমাণ ওরাই। বেড়া ডিঙাতে কোন সমস্যা হলো না। ভেতরে ঢুকে বেড়ার ধার ঘেঁষে এক সারিতে এগোল কিশোর আগে, রবিন মাঝে, সবার শেষে মুসা। মূল বাড়িটা লক্ষ্য। এক টুকরো খোলা জায়গায় এসে পৌঁছল ওরা। গাছপালার বাধা না থাকায় কয়েক পরত পোশাকের আস্তর ভেদ করেও চুইয়ে ঢুকতে শুরু করল ঠাণ্ডা।

'কি খুঁজতে এসেছি,' মাটিতে জুতো ঠুকে গা গরম রাখার চেষ্টা চালাল মুসা

কিশোরের চোখ জটলা পাকানো বাড়িঘরগুলোর দিকে। 'জানি না। মনে হলো, ঘুরে দেখে যাওয়া দরকার, তাই এলাম। কিছু না পেলে আর কি করব। সোজা গিয়ে মিস্টার থার্সটনের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করব, কোন বন্যপ্রাণী গবেষককে তিনি গুলি করেছেন কিনা।'

'হুঁ, জিজ্ঞেস করলেই যেন তিনি জবাব দেবেন,' কথা বলার সময় মুখ দিয়ে বেরোনো বাতাস কি ভাবে বরফের কণায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে আছে মুসা।

বাংকহাউস থেকে বেরিয়ে এল দুজন শ্রমিক। এগিয়ে গেল একটা স্নোমোবাইলের দিকে। দুজনের হাতেই রাইফেল। পিছিয়ে এসে একটা বড় গাছের

আড়ালে লুকিয়ে পড়ল দুই গোয়েন্দা।

'আজকে আশা করি ভাগ্য খুলতে পারে আমাদের,' বলল একজন। 'বাড়তি টাকাটা পেলে ভালমত খরচ করতে পারতাম।'

'হুঁ।' গাড়ির সঙ্গে আটকানো চামড়ার খাপে রাইফেলটা ভরে রাখল দ্বিতীয়জন। পা ঘুরিয়ে উঠে বসল স্নোমোবাইলের সীটে। ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে এক মোচড়ে চালু করে ফেলল ইঞ্জিন। 'পুরস্কারের টাকাটা যদি কুগারের মাথা হিসেবে না দিয়ে মিস্টার থার্সটন ওজন হিসেবে দিতেন, বড়লোক হয়ে যেতাম।' গ্যাস বাড়াতে ইঞ্জিনের গর্জন বেড়ে গেল। সে-শব্দকে ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল সে, 'আজ সকালে যেটার ছাপ দেখেছি, কুগারটা বিশাল।'

ফ্র্যাঙ্ক হ্যান কি বলেছিল, মনে পড়ল কিশোরের। পার্বত্য সিংহ শিকারের ব্যাপারে আইন বড় কড়া।

'কুগার শিকার করলে যদি নিজের শ্রমিকদের মোটা টাকা পুরস্কার দিয়ে থাকেন মিস্টার থার্সটন...' কিশোর বলল।

'এবং অকাজটা করার সময় ওদের দেখে ফেলে থাকেন ডক্টর কুপার...' রবিন বলল।

কিন্তু কথা শেষ হলো না তার। পেছনের বনে ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। তীক্ষ্ণ শব্দটা এগিয়ে আসছে দ্রুত। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তিন গোয়েন্দা। এমন জায়গায় রয়েছে, দ্রুত লুকিয়ে পড়ার কোন জায়গা চোখে পড়ল না।

আরেকটা স্নোমোবাইল। ওদেরকে দেখে ফেলল চালক। র‍্যাঞ্চের আরেক শ্রমিক। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল। 'কি কাণ্ড! এমন জায়গায় থাকে নাকি মানুষ? আরেকটু হলেই তো না দেখে দিয়েছিলাম তোমাদেরকে...'

থেমে গেল আচমকা। একটানে চোখ থেকে খুলে আনল সানগ্লাস। ভুরু কুঁচকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল গোয়েন্দাদের দিকে। 'তোমাদেরকে তো চিনি বলে মনে হচ্ছে না!' কর্কশ হয়ে গেল কণ্ঠস্বর, 'এখানে কি?'

'আমরা ফেডারেল সেফটি ব্যুরোর সঙ্গে জড়িত, জুনিয়র গ্রুপ,' চমকে যাওয়াটা সামলে নেয়ার চেষ্টা করছে কিশোর।

চোখের পাতা সরু হয়ে এল লোকটার। বেড়ার দিকে ঘুরে আচমকা চিৎকার করে উঠল, 'এই, কোথায় তোমরা! জলদি এসো! চোর ধরেছি, চোর...'

স্নোমোবাইল থেকে লাফিয়ে নেমে কিশোরের দিকে ছুটে এল লোকটা মাংসল থাবা কিশোরের ঘাড় চেপে ধরল। মুহূর্তে ঝট করে বসে পড়ল সে। ঘাড় থেকে ছুটে গেল লোকটার হাত। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর আগেই ছুটতে শুরু করল কিশোর।

ওদিকে যে সহজ বুদ্ধিটা মাথায় এল মুসার, সেটাই করে বসল সে। কোন রকম চিন্তা-ভাবনা না করে গিয়ে লাফ দিয়ে চড়ে বসল স্নোমোবাইলে। চিৎকার করে উঠল কিশোর আর রবিনের উদ্দেশে, 'জলদি এসো! উঠে পড়ো!'

রবিনের পেছনে কিশোর পুরোপুরি উঠে বসার আগেই চালানো শুরু করে দিল মুসা। ঝাঁকি দিয়ে সামনে লাফ মারল স্নোমোবাইল। একবার দুলে উঠেই সোজা

হয়ে গেল। দু'জনের সীটে তিনজন। আরেকটু হলে ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল কিশোর। পেছনের চাকার ঘায়ে ছিটকে উঠল তুষারকণা, ফুলঝুরির মত ছিটানো শুরু করল, গিয়ে লাগল লোকটার হাতে।

বুদ্ধিটা মন্দ করেনি, পার পেয়ে যেত, কিন্তু একটা ভুল করে ফেলল মুসা। যেদিকে যাওয়া উচিত ছিল, সেদিকে না গিয়ে রওনা হলো উল্টোদিকে। ভুল শোধরানোর জন্যে স্নোমোবাইল ঘোরাতে গিয়ে দেখে পিঁপড়ের সারির মত ঝাঁক বেঁধে বাংকহাউস থেকে দৌড়ে বেরোনো শুরু করেছে শ্রমিকেরা।

'আরে, হাঁ করে দেখছ কি!' চিৎকার করে উঠল একজন। 'থামাও না ছেলেগুলোকে!'

'শক্ত হয়ে বোসো!' কিশোর আর রবিনকে বলেই হ্যাঁচকা টানে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে দিল মুসা। একটা খোলা মাঠের দিকে ছুটল। পেছনে আবার উল্টে পড়ে যাচ্ছিল কিশোর, বহু কষ্টে সামলাল।

ছোট একটা পাহাড়ের মত টিলার দিকে প্রায় উড়ে চলল স্নোমোবাইল। চূড়াটা পেরোনোর সময়ও গতি কমাল না মুসা। তাতে মাটি থেকে চাকা সরে গেল। মুহূর্তের জন্যে তিন জন আরোহী সহ শূন্যে ঝুলে রইল যেন যানটা। তারপর আছড়ে পড়ল মাটিতে। প্রচণ্ড ঝাঁকিতে ছিটকে পড়ার জোগাড় হলো আরোহীদের। অন্য সময় হলে মজাই পেত মুসা।

বাঁচার উপায় খুঁজছে কিশোরের মন। কিন্তু বেশিক্ষণ চিন্তা করার সময় পেল না। হঠাৎ আধপাক ঘুরে গেল স্নোমোবাইলের সামনের চাকা, প্রচণ্ড ঝাঁকুনি, হোঁচট খেয়ে থেমে যাওয়া। এবার আর সামলাতে পারল না কিশোর। উড়ে গিয়ে পড়ল তুষারের মধ্যে।

লাফিয়ে নেমে পড়ল মুসা। রবিনও নামল।

দৌড়ে এসে টান দিয়ে কিশোরকে তুলল মুসা। 'কি হলো? ঠিক আছ?'

কোনমতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'মনে হয়। থামলে কেন?'

সামনের দিকে আঙুল তুলল মুসা। 'ওই দেখো।'

সামনে মাটি দেখতে পেল না কিশোর। শুধুই শূন্যতা। নিচে তাকাল। চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুহূর্তে। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে। যেখানে ব্রেক করেছে মুসা, তার মাত্র কয়েক ফুট দূর থেকে খাড়া নেমে গেছে পাহাড়ের দেয়াল। নিচে আরেকটা পাহাড়ের খাড়া মাথা নজরে পড়ছে। বিবর্ণ, প্রাণহীন, নিরানন্দ।

পেছনে হই-চই শোনা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে স্নোমোবাইল সহ অন্য গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ। ফিরে তাকাল ওরা। ওদের ধরার জন্যে দল বেঁধে ধাওয়া করে আসছে থার্সটনের কর্মচারীরা।

সাত

কিশোরের দিকে তাকিয়ে দুর্বল হাসি হাসল মুসা। খাড়া দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত করে রসিকতা করল, 'দড়ির মই নিশ্চয় সঙ্গে আনোনি।'

এগিয়ে গিয়ে একেবারে কিনারে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকাল কিশোর। গভীর গিরিখাত। গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল, 'এত লম্বা দড়ির মই বোধহয় বানানোও যাবে না।'

পাশে এসে দাঁড়াল রবিন। কিশোরের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিচে তাকাল সে-ও। ঝোড়ো হাওয়া ক্রমাগত গর্জন করে ফিরছে খাদের ওপরে, ঝাপটা মেরে দেয়ালে লেগে থাকা তুষারকণা উড়াচ্ছে। বের করে আনছে রুক্ষ পাথরের ধারাল দাঁত। মগজে প্রতিবাদের ভাষা জেগে ওঠার আগেই ভারী দম নিয়ে দেয়ালের কিনার বেয়ে নেমে পড়ল রবিন।

'করছ কি!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'একশো ফুটের কম হবে না।'

'এ ছাড়া আর উপায় কি?' ওপর দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল রবিন। ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল নিচের দিকে। পাহাড় বাওয়ার ওস্তাদ সে। চড়তে গিয়ে কয়েকবার পা ভেঙেছে। তা-ও নেশা যায় না। 'কতখানি ওপরে আছ এবং কি করছ, সেটা যদি ভাবনা থেকে দূর করে দিতে পারো, তাহলে খুব একটা কঠিন লাগে না কাজটা।'

মুসার হাতে চাপ দিল কিশোর। 'কি করব?'

'জানি না!' রবিনের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। যে ভাবে নামছে, একটু এদিক ওদিক হলেই নিচে পড়ে নিশ্চিত মৃত্যু।

'নেমে এসো,' ডাকল রবিন। পায়ের ডগা ঢোকানোর জন্যে আরেকটা ফাটল খুঁজছে। 'পালানোর এটাই একমাত্র পথ।'

হই-চই, ইঞ্জিনের গর্জন এগিয়ে আসছে। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল কিশোর। ধরা পড়লে কি ঘটবে পরীক্ষা করে দেখার কোন ইচ্ছে নেই তার। ফিরে তাকিয়ে দেখল, আরও নেমে গেছে রবিন। আর দ্বিধা করল না সে। রবিনের পথ ধরল। মুসা আর কি করে। সে-ও দেয়ালের কার্নিস বেয়ে নেমে পড়ল।

কোনদিকে না তাকিয়ে প্রায় অন্ধের মত দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে নেমে চলল তিনজনে। মাথার ওপর চিৎকার করছে কাউবয়রা। কানের কাছে বাতাসের গর্জনে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে সে-শব্দ।

খুব ধীরে, সাবধানে, বুঝেশুনে প্রায় ইঞ্চি ইঞ্চি করে নেমে চলেছে রবিন। উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা ঠাঁই দিচ্ছে না মগজে। দিলেই ঘাবড়ে যাবে, আর গেলেই না হবে নামা, না হবে ওঠা, আটকে যাবে মাঝপথে। পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর।

মনে হলো সাংঘাতিক এক দীর্ঘ দুঃস্বপ্নের মধ্যে পড়ে গেছে ওরা। অনন্তকাল ধরে নেমে চলেছে। নামার যেন আর শেষ হবে না। কতটা ওপরে আছে দেখার জন্যে ঝুঁকি নিয়েই নিচে তাকাল রবিন। ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে। আনন্দে। মাত্র আর কয়েক ফুট বাকি। হাত ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে নামল তুষারের মধ্যে।

কিশোর রয়েছে আরও কয়েক ফুট ওপরে। ওখান থেকে লাফিয়ে পড়লেও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। নিচে রয়েছে নরম তুষার।

চিৎকার করে জানাল কিশোরকে কিন্তু সাহস করল না কিশোর। এতটা নেমে আসার পর আর কোন ঝুঁকি নিতে চাইল না দেয়াল বেয়েই নেমে এল নিচে। তুষারে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে যেন দেহটা ছেড়ে দিল তার। ধপাস করে পড়ে গেল।

কি হলো! কি হলো! চিৎকার করে উঠে হাত ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল মুসাও।

না, কিছু হয়নি। উঠে বসে দেয়ালে হেলান দিল কিশোর।

কিন্তু স্বস্তিটা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারল না ওদের। কালো ছায়া দেখা দিল মাথার ওপর। সেই সঙ্গে জোরাল একঘেয়ে শব্দ। ওপর দিকে তাকাল তিনজনেই। হেলিকপ্টার। একটা মুহূর্ত ওদের ওপর ঝুলে থেকে সরে গেল ওটা। কেউ যেন ধরে টান মেরে নিয়ে চলে গেল একপাশে। খানিক দূরে উঁচু একটা চ্যাপ্টা বেদীমত জায়গায় নামল।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা, 'যাক, এখান থেকে কি ভাবে যাব সে-চিন্তাটা আর করতে হলো না আমাদের।'

কাদের জিনিস, হেলিকপ্টারের গায়ে কিছু লেখা নেই।

'চেনা চেনা লাগছে না?' রবিনের প্রশ্ন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'সকালবেলা এটাতে করেই গিয়েছিলাম আমরা।'

মস্ত একটা ফড়িঙের মত বেদীর ওপর বসে আছে কপ্টারটা। খপ-খপ-খপ-খপ করে বাতাস কেটে চলেছে ওটার রোটর। বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটায় মাটিতে পড়া তুষার ওড়াচ্ছে। তাকিয়ে থেকে অপেক্ষা করছে তিন গোয়েন্দা। খুলে গেল দরজা। আরও অপেক্ষা। মিনিটখানেক পরও যখন কেউ বেরোল না, বুঝতে পারল ওরা, বেরোবে না। ওদেরকেই যেতে হবে।

দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে ভুরু উঁচু করল কিশোর। নীরবে মাথা ঝাঁকাল রবিন। মুসা বলল, 'চলো।'

পাশাপাশি সাবধানে হেঁটে চলল তিনজনে। পা দেবে যাচ্ছে আলগা বরফে। সেদিকে তাকাচ্ছে না কেউ। কপ্টারটার দিকেই নজর। কাছে যেতে গায়ে এসে ঝাপটা মারল বরফ-শীতল বাতাস। কপ্টারের রোটরে সৃষ্টি হচ্ছে বাতাসের ঝড়।

মাথা নিচু করে এগিয়ে গিয়ে দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল কিশোর।

আত্মতৃপ্তির হাসি হাসলেন পাইলট। টারবাইন ইঞ্জিন আর রোটরের গর্জনকে ছাপিয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, 'লিফট লাগবে?'

'এ ছাড়া আর কোন উপায় আছে আমাদের?' পাইলটের কথার হালকা ভঙ্গিটা ফিরিয়ে দিল কিশোর। ককপিটে পাইলটকে একা দেখে অবাক হয়েছে।

হাসিটা চওড়া হলো পাইলটের। 'তা নেই,' একমত হলেন তিনি। নিজের পাশের সীটটা দেখিয়ে বললেন, 'উঠে বসো। ওদেরকেও আসতে বলো।'

সকালবেলা পাইলটের দিকে বিশেষ নজর দেয়নি কিশোর। দিলে, মাথার টুপিতে কাত করে লেখা টি· আর· শব্দ দুটো দেখতে পেত। টি· আর·, অর্থাৎ থার্সটন র‍্যাঞ্চ। উঠে বসতে বসতে বলল, 'কপ্টারটার মালিক তাহলে মিস্টার থার্সটন?'

মাথা ঝাঁকালেন পাইলট। 'হ্যাঁ। একেবারে নতুন এটা। কয়েক হপ্তা আগে কেনা হয়েছে। কোম্পানির নাম লেখানোরও সময় পাইনি এখনও।'

পেছনের সীটে গিয়ে বসল রবিন আর মুসা। দু'জন হওয়াতে প্রথমবারের মত গাদাগাদি হলো না।

'তারমানে জেরাল্ড থার্সটন বিরাট বড়লোক,' পাইলটের সঙ্গে কথা চালিয়ে গেল কিশোর। 'একটা প্রাইভেট কপ্টার কেনা, সেই সঙ্গে বেতন দিয়ে পাইলট রাখা–বিরাট খরচের ব্যাপার।'

'কিনতে অনেক টাকা লেগেছে ঠিকই,' কপ্টারটাকে তুলতে তুলতে জবাব দিলেন পাইলট। 'তবে পাইলটের জন্যে একটা পাইপয়সাও খরচ করা লাগে না।'

অবাক হলো কিশোর। 'তারমানে? বিনা বেতনে মিস্টার থার্সটনের কাজ করে দেয় নাকি?'

মৃদু হাসি ফুটল পাইলটের ঠোঁটে। 'নিজের কাজের জন্যে কে আর পয়সা নেয়, বলো। আমিই জেরাল্ড থার্সটন।'

জবাবটা স্তব্ধ করে দিল কিশোরকে। র‍্যাঞ্চে ফেরার পথে আর একটা কথাও বলতে পারল না। সামান্য ওই সময়টুকু ব্যয় করল থার্সটনকে পর্যবেক্ষণের কাজে।

কপ্টারটাকে যে রকম সহজ ভাবে চালাচ্ছেন, তাতেই বোঝা যায় বহু ঘণ্টা ওড়ার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। দক্ষ পাইলট। ক্লীন-শেভড, চৌকো চোয়াল। প্রথমে ভাবল বয়েস পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মাঝামাঝি। কোটের কলারের নিচে গলাটা যেখানে ঢুকে গেছে, ভাল করে তাকাতে সেখানকার চামড়া চোখে পড়ল। একলাফে বয়েস দশ বছর বাড়িয়ে দিল সে মনে মনে, তারমানে ষাটের কম না। বয়েসের তুলনায় অনেক বেশি জোয়ান লাগে থার্সটনকে।

আট

র‍্যাঞ্চহাউসের ভেতরে মস্ত একটা বৃত্তাকার গাড়িপথের মাঝখানের গোল জায়গায় কপ্টার নামালেন থার্সটন। সামনে দোতলা বাড়ি। অস্বাভাবিক মোটা মোটা চাকাওয়ালা প্রায় বাক্সের মত দেখতে একটা ফোর-ডোর জীপ ছুটে এল ড্রাইভওয়ে ধরে। ছাতের ওপর জ্বলছে-নিভছে একজোড়া নীল আলো। তিন গোয়েন্দা নামল। গাড়িটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল।

জীপ থেকে লাফিয়ে নামলেন শেরিফ হ্যামিলটন। ভীষণ অসন্তুষ্ট মনে হলো তাঁকে। তীব্র ভ্রূকুটি করলেন তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে। 'আমি তো ভেবেছি, ডেনভারের কাছাকাছি চলে গেছ তোমরা এতক্ষণে।'

'গাড়িটা সাতদিন রাখলে ভাড়ার হার কমে যাবে,' জানাল কিশোর। 'তা ছাড়া আমাদের ট্র্যাভেল এজেন্ট জানিয়েছে, হঠাৎ করে প্লেনের টিকেট বদল করতে গেলে জরিমানা দিতে হবে অনেক টাকা। তাই ভাবলাম, বাকি হপ্তাটা কাটিয়েই যাই। বাড়ি যাবার তো আর তাড়া নেই।'

'পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে এখন, তাতে সাতদিনেও ছাড়া পাবে কিনা সন্দেহ,' জবাব দিলেন শেরিফ। 'শুনলাম তোমরা একটা স্নোমোবাইল চুরি করেছ। কথাটা সত্যি হলে···'

'থাক না, ফ্র্যাঙ্ক, বাদ দাও,' বাধা দিলেন থার্সটন। 'শ্রমিকরা যখন আমাকে ফোন করল, ভেবেছিলাম, সাধারণ গরুচোরের কাজ। কল্পনাই করিনি মারিসাকে যে

ছেলেগুলো বাঁচিয়েছে, ওরা ঢুকেছে। নিশ্চয় কোন কারণ আছে।'

জ্বলন্ত চোখে গোয়েন্দাদের দিকে তাকালেন শেরিফ। 'কারণটা কি শুনে ফেলা যাক তাহলে।'

শেরিফের দৃষ্টিবাণে কাবু হলো না কিশোর। থার্সটনকে দেখিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'আমার বিশ্বাস, তারচেয়ে অনেক বেশি আগ্রহী হবেন, যদি শোনেন মিস্টার থার্সটনের লোকেরা কুগার শিকার করার জন্যে মোটা টাকা পুরস্কার পায়। ওটাও নিশ্চয় অপরাধের পর্যায়ে পড়ে, শেরিফ, যদি না কিছু কিছু মানুষ আইনের ঊর্ধ্বে থাকার ক্ষমতা অর্জন করে থাকে।'

'আমার কাছে কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়,' ভোঁতা স্বরে জবাব দিলেন শেরিফ।

'মনে হচ্ছে কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে,' শেরিফের দিকে তাকিয়ে মসৃণ কণ্ঠে বললেন থার্সটন। 'বুড়ো কুগারটার কথা বলেছি তোমাকে, আমার গরুগুলোকে মেরে শেষ করছে। পরশু দিন একটা দুধেল গাইকে ধরে নিয়ে গেছে। খোঁয়াড়ের জানোয়ারগুলো চেঁচামেচি শুরু করেছিল। তাতেই জানা গেছে ব্যাপারটা। আমার তো ভয় লাগছে; কখন পশু ছেড়ে মানুষের ওপর হামলা চালায়। মানুষখেকো হয়ে গেলে তো সর্বনাশ।'

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন শেরিফ। আচরণেই বোঝা গেল, কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হতে পারেননি তিনি। 'তারমানে পুরস্কৃত করার লোভ দেখিয়ে লোক পাঠিয়েছ কুগারটাকে খুন করতে। এ নিয়ে তোমার সঙ্গে বহু আলোচনা হয়ে গেছে আমার, গেরি। তুমি জানো, তোমার এ ধরনের সমাধান আমার পছন্দ না।'

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে শেরিফের দিকে তাকাল মুসা। 'খাইছে! শুধুই আপনার "অপছন্দ"। এ ব্যাপারে আর কিছুই করার নেই আপনার?'

'না, সত্যিই নেই,' জবাব দিলেন শেরিফ। 'গবাদি পশু কিংবা মানুষের প্রাণের জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়ালে নিজের সীমানার মধ্যে কুগার হত্যা করা যাবে—এর বিরুদ্ধে কোন আইন নেই।'

'আমার লোকেরাও জানে সেটা,' থার্সটন বললেন। 'আমার সীমানার মধ্যে পেলেই কেবল গুলি চালাবে। কড়া নির্দেশ আছে আমার।'

'কিন্তু ওরা আপনার হুকুম মানল কি মানল না, কি করে জানছেন?' প্রশ্ন তুলল কিশোর। 'কুগারটাকে মেরে নিয়ে এসে আপনাকে বলবে, সীমানার মধ্যেই পাওয়া গেছে, তখন? তাদের মুখের কথাই বিশ্বাস করতে হবে আপনাকে পুরস্কারের টাকা দিয়ে দেবেন?'

পাতলা হাসি ফুটল র‍্যাঞ্চারের ঠোঁটে। 'আমি ওদের বিশ্বাস করি। আমার আরও বিশ্বাস, তোমরাও আর কোন রকম গণ্ডগোল করবে না এখানে। তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে আর কোন রকম অভিযোগ আনা থেকে বিরত থাকব আমি। বেআইনী ভাবে আমার র‍্যাঞ্চে ঢোকা, স্নোমোবাইল চুরি করার কথা—কোনটাই আর মনে রাখব না।'

'তাহলে আমিও ঝামেলা থেকে বাঁচব,' শেরিফ বললেন। 'অ্যারেস্ট আর করতে হবে না তিনজনকে ফাইলপত্র আর লেখালেখির ঝামেলা থেকে মুক্তি। চলো, জীপে করে তোমাদের গাড়ির কাছে পৌঁছে দেব।'

থার্সটনকে গুডবাই জানিয়ে দুই সহকারীকে নিয়ে শেরিফের গাড়িতে উঠল

কিশোর।

'গল্পটা আপনি বিশ্বাস করলেন?' শেরিফকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কমবেশি,' জবাব দিলেন শেরিফ।

'তারমানে?'

'তার মানে, মাঝেসাঝে বেআইনী কাজ করে ফেলে থার্সটনের লোকেরা। আর দেখেও সেটা দেখে না সে।'

'আর সে-রকমই একটা বেআইনী কাজ করতে যদি ওদের দেখে ফেলে থাকেন ডক্টর কুপার,' প্রশ্ন করল কিশোর, 'তাহলে কি ঘটবে?'

'জানি না,' জবাব দিলেন শেরিফ। 'থার্সটন র‍্যাঞ্চের সীমানা থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে গুলি খেয়েছে মারিসা। সেটাও ভেবে দেখতে হবে।'

'এমনও তো হতে পারে,' থামল না কিশোর, 'মানুষের মাথার জন্যে অনেক বেশি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন থার্সটন?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগলেন শেরিফ। ধৈর্য হারালেন না তিনি। 'মারিসা কুপার বিরক্ত করছে থার্সটনকে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে ক্ষতি কিছুই করতে পারছে না। সুতরাং মারিসাকে নিয়ে অতটা মাথাব্যথাও নেই থার্সটনের। এল্‌ক্‌ স্প্রিঙ অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য নয়। তা ছাড়া জেরাল্ড থার্সটন একজন সম্মানী লোক। তার ওখানে যারা কাজ করে, তারাও সবাই মোটামুটি সৎ। কঠিন পরিশ্রমী কাউবয়।'

অবাক লাগল কিশোরের বন্ধু বলে থার্সটনের ব্যাপারে অন্ধ হয়ে গেলেন শেরিফ? নাকি নিজের মনের সঙ্গেই চুলচেরা বিশ্লেষণ করছেন?

'তুমি প্রশ্ন করার আগেই আরও একটা কথা জানিয়ে দিই,' শেরিফ বললেন, 'গতকাল একটা গরুর নিলামে গরু কিনতে মনটানায় গিয়েছিল থার্সটন। কাজেই গুলিটা সে করেছে, এই ধারণাটাও মাথা থেকে বের করে দিতে পারো।'

'গুলির কথা যখন উঠলই,' কিশোর বলল, 'কি ধরনের বন্দুক ব্যবহার করা হয়েছে, জানতে পেরেছেন?'

মাথা ঝাঁকালেন শেরিফ। 'মোটামুটি। ক্যালিবারটা জানা যায়নি এখনও। মারিসার জখম থেকে পাওয়া বুলেটটা দেখেই বোঝা যায়, শক্তিশালী হান্টিং রাইফেল থেকে ছোঁড়া। বেশি ভেতরে ঢোকেনি...'

'তারমানে ছোঁড়া হয়েছে বহুদূর থেকে,' বাক্যটা শেষ করে দিল কিশোর। 'আরেকটু কাছে থেকে মারলে বাঁচতেন না তিনি। তারমানে খাদের ওপর থেকে গুলি করার ব্যাখ্যাটা আরও জোরদার হচ্ছে।'

সিডানটার কাছে এসে জীপ থামালেন শেরিফ। কিশোরের দিকে ফিরলেন। 'অনেক কিছু জানো তুমি। এত শিখলে কোথায়?'

'বড় বেশি খুঁতখুঁতে তো,' পেছন থেকে জবাব দিল মুসা। 'কৌতূহলও বেশি। কম্পিউটারের মগজ। কোন জিনিস একবার মগজে ঢুকলে জীবনেও আর বেরোয় না।'

'সে-রকমই মনে হচ্ছে আমার,' কিশোরের দিক থেকে চোখ ফেরালেন না শেরিফ। 'সাধারণ হান্টিং অ্যাক্সিডেন্টের মধ্যেও কি বাঁকা কিছু দেখতে পাচ্ছে

তোমার কৌতূহলী মগজ?'

'সাধারণ দুর্ঘটনা মনে হচ্ছে না আমার,' ঘুরিয়ে জবাব দিল কিশোর। 'কে দুর্ঘটনাটা ঘটাল, খোঁজ পেয়েছেন তার?'

'ওসব খোঁজার জন্যেই বেতন দেয়া হয় আমাকে,' ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে আরম্ভ করেছে মনে হয় শেরিফের। 'কিছু সূত্র আমি পেয়ে গেছি।'

'যেমন?'

ড্যাশবোর্ডে বসানো টু-ওয়ে রেডিওটা খড়খড় করে উঠল এই সময়। 'শেরিফ হ্যামিলটন? শুনতে পাচ্ছেন?'

হ্যান্ডসেটটা তুলে নিয়ে কথা বলার বোতামটা টিপে দিলেন শেরিফ। 'মারটিন। বলো। কিছু পেলে?'

'বহুত ঘোরাঘুরি করলাম…'

'আরে সেকথা কে শুনতে চাইছে!' ধমকে উঠলেন শেরিফ। 'রাইফেলটা পেয়েছ নাকি, বলো!'

'পেয়েছি, স্যার,' স্পীকারের খড়খড়ানির সঙ্গে মিশে যান্ত্রিক শোনাল কণ্ঠটা। 'যেখানে খুঁজতে বলেছিলেন, সেখানেই দেখেছি বাকি জায়গাগুলো…'

'গুড। হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাও। আমি আসছি।' আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন শেরিফ।

'ঘটনাটা কি?' ভুরু নাচাল কিশোর

'মনে হচ্ছে তোমার সন্দেহই ঠিক, শেরিফ বললেন 'কেউ একজন ইচ্ছে করেই খুন করতে চেয়েছিল মারিসাকে। আশা করছি, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তাকে ধরে এনে হাজতে ভরতে পারব।'

নয়

'অস্ত্রটা পেলেন কি করে?' জানতে চাইল কিশোর। 'মনে হচ্ছে যেন হেঁটে হেঁটে এসে হাজির হয়েছে।'

'তোমার নিশ্চয় জানা আছে,' উত্তেজনার ভাবটা চলে গেছে শেরিফের ভঙ্গি থেকে, 'অনেক অপরাধীকেই ডোবায় হয় তাদের বন্ধুরা, কিংবা পরিচিত কেউ?'

'কে গুলি করল ডক্টর কুপারকে? আর কে-ই বা ডোবাল তাকে?'

'সন্দেহজনক ব্যক্তিটি একজন নেটিভ আমেরিকান,' শেরিফ বললেন। 'তার ডাক নাম লঙ হার্ট। নাম শুনে কিছু বুঝতে পারবে না। আমাদের এলাকার বাইরের কোন পত্রিকায় নাম ছাপা হয় না তার।'

'তিনি কে, জানি আমরা,' জবাব দিল কিশোর। 'উনিই দায়ী, কেন ভাবছেন?'

'একটা উড়ো ফোন পেয়েছি আমি,' শেরিফ বললেন। 'লোকটা জানিয়েছে, একটা গুলির শব্দ নাকি শুনেছিল সে। তার পর পরই লঙ হার্টকে গিরিখাতের কাছ থেকে চলে যেতে দেখেছে। লঙ হার্টের ট্রাকে একটা রাইফেল পাওয়া গেছে। মারটিন পরীক্ষা করে বুঝতে পেরেছে, দু'একদিনের মধ্যে গুলি করা হয়েছে ওটা

দিয়ে।'

ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'তাতে তেমন কিছু প্রমাণ হয় না। রাইফেল গাড়িতে নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন কেন লও হার্ট? আর কুমতলব থেকে থাকলে অন্য কোথাও লুকাতেন, ধরা পড়ার জন্যে গাড়িতে ফেলে রাখতেন না।'

'লুকানোই ধরা যেতে পারে এটাকে,' জবাব দিলেন শেরিফ। 'বনের মধ্যে তার কেবিন। রাস্তা বলতে প্রায় কিছুই নেই। সচরাচর যায়ও না কেউ ওদিকে। বাড়িতে রাখার অসুবিধে বলে শীতকালে শহরের একটা গ্যারেজে গাড়ি রাখে সে। স্কি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ও হয়তো ভেবেছিল রাইফেলটা এ সময় ট্রাকে রাখাই নিরাপদ।'

'তাতেও প্রমাণ হয় না তিনিই গুলি করেছেন,' কিশোর বলল। 'কেউ ফাঁসানোর জন্যে ওখানে নিয়ে গিয়ে রাইফেলটা রেখে দিতে পারে। এল্‌ক্ স্প্রিঙে সবার কাছেই নিশ্চয় হান্টিং রাইফেল আছে। আর যেটা পাওয়া গেছে, সেটা লও জনেরই রাইফেল, কি করে শিওর হচ্ছেন? ওটা তার জিনিস না-ও হতে পারে।'

ঘোঁৎ করে উঠলেন শেরিফ। 'সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নও তোমরা। তোমাদের ইচ্ছেটা কি? লও হার্টকে গ্রেফতার না করি?'

'তা বলব কেন? আমি চাইছি সঠিক লোকটাই গ্রেফতার হোক।'

'দেখো,' শীতল কণ্ঠে বললেন শেরিফ, 'আমাকে পরামর্শ দেয়ার চেয়ে তোমাদের বয়েসী ছেলেদের যা করা উচিত, তা-ই করো; আর আমাকে আমার কাজ করতে দাও। আসল অপরাধীকে আমি খুঁজে বের করবই।'

'তারমানে আপাতত আপনি লও হার্টকে অ্যারেস্ট করছেন না?'

'না,' জবাব দিলেন শেরিফ। 'তবে তোমাদের রেখে গিয়ে প্রথম কাজটাই হবে আমার তার সঙ্গে দেখা করা।' মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিতে জানালার বাইরে দেখালেন তিনি। 'ওই যে তোমাদের গাড়ি। যাও। যেখানে খুশি যেতে পারো যেখানে ইচ্ছে। কেবল আমার ঘাড়ের কাছ থেকে দূরে থাকলেই আমি খুশি।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধে হলো না তিন গোয়েন্দার।

'তাহলে কি করছি আমরা এখন?' নিজেদের গাড়িতে বসে জিজ্ঞেস করল রবিন। তাকিয়ে আছে শেরিফের গাড়িটার দিকে। চলে যাচ্ছে ওটা।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল মুসা। 'শেরিফ যা করতে বলেছেন, সেটাই করা উচিত আমাদের,' বলল সে। 'যেখানে খুশি চলে যাওয়া উচিত।'

'ঠিক,' রহস্যময় হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। 'কেবল তাঁর ঘাড়ের কাছ থেকে দূরে থাকতে বলেছেন আমাদের। কিন্তু পিছু পিছে যেতে মানা করেননি। কি বলো?'

যতটা সম্ভব দূরে থেকে জীপটাকে অনুসরণ করে চলল মুসা। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া প্রায় নেই। দুটো গাড়ির মাঝখানে ফাঁকা। চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

আঁকাবাঁকা, উঁচুনিচু পাহাড়ী পথে ঠোকর খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে গাড়ি।

'এতক্ষণে শিওর জেনে গেছেন,' কিশোর বলল, 'আমরা তাঁকে অনুসরণ করছি। যদি না দেখে থাকেন, তাহলে তাঁর রিয়ারভিউ মিররের কাঁচ নষ্ট।'

'বোকা বানানোর জন্যে অকারণে ঘুরিয়ে মারছেন না তো আমাদের?' রবিনের প্রশ্ন।

মাথা নাড়ল কিশোর, 'মনে হয় না। এ ভাবে নিজের সময় নষ্ট করবেন না শেরিফ।'

তীক্ষ্ণ একটা মোড়ের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল জীপ। উদ্বিগ্ন হলো না কিশোর। মোড়ের কাছে গেলেই আবার দেখা পাবে। কিন্তু গিয়ে দেখল, তার অনুমান ভুল। মোড়ের ওপাশে রাস্তা শূন্য। উধাও হয়ে গেছে জীপটা।

চোখ বড় বড় করে এপাশ ওপাশ তাকাতে লাগল মুসা। 'কি হলো? কোথায় গেল গাড়িটা?'

গাড়ি থামাতে বলল কিশোর। রাস্তার দুই পাশটা ভালমত দেখল।

'ওই যে,' হাত তুলে দেখাল রবিন। রাস্তা থেকে নেমে চাকার দাগ চলে গেছে বরফের ওপর দিয়ে। ঢুকেছে গিয়ে বনের মধ্যে।

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর। 'শেরিফ তো বলেইছিলেন, লঙ হার্ট রাস্তা থেকে দূরে একটা কেবিনে বাস করেন।'

'সে-জন্যেই আমাদের দেখে উদ্বিগ্ন হননি শেরিফ,' রবিন বলল। 'জানতেন, শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করে যাওয়া সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে। ফোর-হুইল ড্রাইভ জীপ। তুষারে চলার উপযোগী চাকা। রাস্তা প্রয়োজন নেই তাঁর। কিন্তু আমাদের এই গাড়ি নিয়ে ওদিকে দশ ফুটও যেতে পারব না।'

'তারমানে গাড়ি রেখেই যেতে হবে আমাদের,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল কিশোর।

তার দিকে ফিরে তাকাল রবিন। 'তুমি বলছ, পায়ে হেঁটে? লঙ হার্টের কেবিনটা কতদূরে, তাই তো জানি না আমরা।'

'গেলেই জানতে পারব।' গাড়ি থেকে নেমে পড়ল কিশোর। ছাতে রাখা স্কি র‍্যাক দেখিয়ে বলল, 'হেঁটে যেতে না ইচ্ছে করলে বরফের ওপর দিয়ে চলার আরও বিকল্প ব্যবস্থা আছে।'

কোনটা কঠিন হবে বুঝতে পারল না রবিন—গোড়ালি দেবে যাওয়া তুষারের মধ্যে বার বার পা উঁচু করে ছপাৎ-ছপাৎ করে হাঁটা, নাকি স্কি পরে ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠা। আরেকবার তাকাল সরু রাস্তাটার দিকে। প্রথম মোড়টার পরেই মোটামুটি সমতল হয়ে গেছে রাস্তা।

মুসাও দেখল। রবিনের মত দ্বিধা করল না সে। র‍্যাকের দিকে হাত বাড়াল। 'স্কি করতে এসেছি, স্কি-ই করব।'

বেশি দূর যেতে হলো না। ফিরে এল পুলিশের জীপটা। মুসা রয়েছে আগে। তার স্কি'র প্রায় সামনের ডগা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে গেল গাড়ির চাকা। জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিলেন শেরিফ। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, ওদের দেখে হাসবেন না কাঁদবেন সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না।

'দারুণ প্রাকৃতিক দৃশ্য এখানকার,' গভীর মনোযোগে প্রকৃতি দেখার ভান করল কিশোর।

হাসি চাপলেন শেরিফ। 'নাহ্, তোমাদের প্রশংসা না করে পারছি না। এত নাছোড়বান্দা ছেলে জীবনে দেখিনি আমি।' কাউবয়টা হ্যাটটা খুলে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপাল মুছলেন। 'তবে অহেতুক সময় নষ্ট করবে। লঙ হার্ট বাড়ি নেই।'

ঠোঁট গোল করে শিস দিয়ে উঠল মুসা। 'দূর! খামোকাই এলাম কষ্ট করে।'

মুচকি হাসলেন শেরিফ। 'কেন, প্রকৃতি দেখতে নাকি এসেছ তোমরা? যাকগে, সাবধান করে দিচ্ছি, লঙ হার্টের কাছে আরও বন্দুক থাকতে পারে। বিপজ্জনক লোক সে।'

'শুধু একটা রাইফেল পেয়ে এবং সেটা থেকে গুলি করা হয়েছে সন্দেহ করে কাউকে দোষী ঠাউরানো ঠিক মেনে নিতে পারছি না আমি,' কিশোর বলল।

'সামান্যতম সূত্র থেকে অনেক বড় বড় অপরাধী ধরার ঘটনার কথা জানি আমি,' জবাব দিলেন শেরিফ। গোঁফ চুলকালেন অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। 'আর সাবধান থাকাটা ভাল। তাতে জীবনটা দীর্ঘায়িত করা যায়।'

'তা ঠিক,' ইচ্ছে করেই তর্ক থেকে সরে এল কিশোর। শেরিফকে চটানোটা ঠিক হবে না।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন শেরিফ। 'তোমাদের পার করে দিয়ে আসা উচিত ছিল,' ঘড়ি দেখলেন তিনি। 'কিন্তু আমার সময় নেই। নিজেরা এসেছ, নিজেরাই ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করো। আমার একটাই অনুরোধ–গণ্ডগোল থেকে দূরে থাকবে।'

গাড়ি চালিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আবার চিৎকার করে বললেন, 'আর লঙ হার্টের কাছ থেকেও দূরে থাকবে।'

হাসিমুখে তাকিয়ে তাঁর উদ্দেশে জোরে জোরে হাত নাড়ল কিশোর। জীপটা চোখের আড়ালে চলে যেতেই আবার যে দিকে যাচ্ছিল সেদিকে রওনা হলো।

সামনে পথ মোটামুটি সমতল হয়ে এল। খাড়াই আছে এখনও, তবে কম।

'বাপরে বাপ, অলিম্পিকে জেতাও এরচেয়ে সহজ,' আধঘণ্টা পর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা।

'হুঁ,' গাল ফুলিয়ে মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়তে ছাড়তে বলল রবিন। 'রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখতে এরচেয়ে ভাল কোন উপায় বোধহয় আর নেই।'

'সে তো বটেই,' ঘড়ঘড়ে শব্দ বেরোচ্ছে কিশোরের গলা দিয়ে। 'হার্ট অ্যাটাকটা হোক না খালি এখন, টের পাবে স্বাভাবিক কাকে বলে।'

কষ্ট হচ্ছে এগোতে, তাই বলে থামল না ওরা। তুষারে পোলের খোঁচা মেরে মেরে এগিয়েই চলল সামনের দিকে।

বন থেকে বেরিয়ে এল এক সময়। সামনে তৃণভূমি। তুষারে ঢাকা। কোন্ দিকে যাচ্ছে জানার জন্যে কম্পাসের প্রয়োজন হলো না ওদের পশ্চিম আকাশে হেলতে থাকা শেষ বিকেলের রোদ ওদের দিক-নির্দেশনা দিচ্ছে।

অনেক নেমে গেছে, 'সূর্যের দিকে তাকিয়ে আনমনে বলল কিশোর।' দুই সহকারীর দিকে তাকাল। 'থামার বোধহয় সময় হয়েছে আমাদের।'

কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল মুসা, 'ক্লান্ত হয়ে গেছ?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, সে-জন্যে নয়। সূর্য দেখে বেশিক্ষণ আর দিক ঠিক রাখা যাবে না। ফিরে যেতে হলে এখনই সময়।'

কপালে হাত রেখে সামনের দিকে তাকাল মুসা 'কিন্তু এতখানি এসে ফিরে যাব? শেরিফ বেশি দূরে যাননি। তারমানে লঙ হার্টের বাড়িটা আর বেশি দূরে না। দেখেই যাই, কি বলো?'

'বাড়িটা তো আর রাতারাতি উধাও হয়ে যাবে না,' কিশোর বলল। 'কালও একই জায়গায় থাকবে। অন্ধকার হয়ে গেলে যদি বনের মধ্যে আটকা পড়ি, কোন নিরাপত্তা পাব না, ঠাণ্ডায় জমেই মরতে হবে।'

রবিনও একমত হলো কিশোরের সঙ্গে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুরে দাঁড়াল মুসা। কিশোর আর রবিনের পেছন পেছন তৃণভূমি থেকে ফিরে এসে আবার ঢুকল বনে।

খোলা সাদা প্রান্তরের চেয়ে ছায়াঢাকা পাইন বনের মধ্যে আলো অনেক কম। শীতে গায়ে কাঁটা দিল রবিনের। ঝাড়া দিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু কেমন করে উঠল মাথার মধ্যে। বনবন করে ঘুরতে শুরু করল। টলে উঠল দেহ। কোনমতে একটা গাছ ধরে ফেলে পতন ঠেকাল। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে হাঁ করে বাতাস গিলতে লাগল।

দু'দিক থেকে এসে তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেলল মুসা আর কিশোর।

'মগজটাকে শূন্য করে দাও,' কিশোর বলল। 'লম্বা লম্বা দম নাও, ধীরে ধীরে ছাড়ো। তোমার মাথার রোগটা তো আছেই, আরও একটা কারণে হতে পারে এ রকম–পর্বতের পাতলা বাতাস।'

দম নিয়ে আস্তে মাথা ঝাঁকাল রবিন। মগজের ঘোলাটে ভাবটা রয়ে গেছে, তবে দেহের টালমাটাল অবস্থা কাটতে আরম্ভ করেছে চলতে গেলে আবার কি ঘটবে, বলা মুশকিল

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'আবার কি তোমার উল্টোপাল্টা দেখা শুরু হতে যাচ্ছে? ব্ল্যাক ফরেস্টের মত?'

'দৈব-দর্শনের কথা বলছ?' মাথা নাড়ল রবিন। 'উঁহু। তোমরা যা দেখছ, আমিও তাই দেখছি।'

'একটা শব্দ শুনলাম মনে হলো?' কিশোর বলল।

'আমিও!' বলার সঙ্গে সঙ্গে ওপর দিকে মুখ তুলে তাকাল মুসা। তার মনে হলো, পাতার আড়ালে কাঠবিড়ালী নড়েছে।

আবার শোনা গেল শব্দটা।

'কুগার নাকি আবার?' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'না ভালুক?'

ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ থাকতে ইশারা করল কিশোর গাছের ডালে নজর। খুঁজে বেড়াচ্ছে।

মুখ তুলে রেখেছে তিনজনেই। এ ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে রবিনের। চোখ বুজল সে।

কিন্তু মুসা আর কিশোর তাকিয়েই আছে। পাইনের জট পাকানো ডাল-পাতা ভেদ করে কিছু চোখে পড়ছে না।

আবার শোনা গেল খসখস শব্দ

মট্ করে একটা ডাল ভাঙল।

না, ওপরে তো নয়!

প্রায় একই সঙ্গে ফিরে তাকাল মুসা আর কিশোর।

বড় ধরনের কিছু একটা রয়েছে গাছের আড়ালে। সন্দেহ আর নেই।

এক-দুই করে তিনটে সেকেন্ড পার হয়ে গেল।

হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কিম্ভূত একটা মূর্তি।

দশ

'খাইছে!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

ফিরে তাকাল রবিন।

ক্যামোফ্লেজে ঢাকা বিশালদেহী একজন মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। লম্বা কালো চুল ঘোড়ার লেজের মত করে বাঁধা ঘাড়ের ওপর। হাতে ধনুক। পিঠে ঝোলানো তীর ভর্তি তূণীর। তীক্ষ্ণ কালো চোখের দৃষ্টি ছুরির মত ধারাল। ভারী গলায় বললেন, 'এটা ব্যক্তিগত জায়গা।'

'সরি,' জবাব দিল কিশোর। 'কিন্তু ওরকম কোন সাইনবোর্ড তো দেখলাম না।'

'বোর্ড-ফোর্ড দেখতে পারি না আমি,' জবাব শোনা গেল। 'কাঁটাতারের বেড়া, সাইনবোর্ড, এ সব জিনিস প্রকৃতির সৌন্দর্য নষ্ট করে। অন্যের অধিকারের ওপর মানুষের শ্রদ্ধা থাকা উচিত। তাহলেই আর কেউ কারও এলাকায় ঢুকে পড়বে না। কিন্তু এ সব কথা আর মানছে কোথায় লোকে। শ্বেতাঙ্গরা ঢোকার পর থেকেই শুরু হয়েছে অনাচার।'

'আপনি নিশ্চয় লঙ হার্ট?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা ঝাঁকালেন ইনডিয়ান। 'এখন নিশ্চয় জানাবে তোমরা কে, আর কেন ঢুকেছ এখানে।'

নিজেদের পরিচয় দিয়ে কিশোর বলল, 'আপনাকে খুঁজতে এসেছি।'

'ইদানীং মনে হচ্ছে খুব বিখ্যাত হয়ে গেছি আমি,' লঙ হার্ট বললেন। 'প্রথমে এল শেরিফ হ্যামিলটন, তারপর তোমরা।'

'শেরিফকে দেখেছেন আপনি?'

'সরাসরি দেখিনি,' বরফে শেরিফের গাড়ির রেখে যাওয়া চাকার দাগের দিকে ইঙ্গিত করলেন লঙ হার্ট। 'দাগ চিনতে অসুবিধে হয় না আমার।' নেচে উঠল তাঁর কালো চোখের তারা। 'আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে এত কষ্ট করে এতদূর কেন এসেছিল শেরিফ, কোন ধারণা আছে তোমাদের?'

দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। সত্যি কথাটা বলার সিদ্ধান্ত নিল। লঙ হার্টের দিকে ফিরে বলল, 'ডক্টর মারিসা কুপারের গুলি খাওয়ার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

কিশোরের ওপর স্থির হয়ে গেল কালো চোখের তারা। 'আজ সকালেই জানলাম খবরটা। একজন বন্ধু রেডিওতে জানিয়েছে আমাকে। কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় কেন শেরিফ?'

'আপনার ট্রাকে একটা রাইফেল পাওয়া গেছে,' জানাল কিশোর। 'শেরিফ আর তাঁর ডেপুটির ধারণা, ওটা দিয়ে গুলি করা হয়ে থাকতে পারে।'

তিক্ত হাসি হাসলেন লঙ হার্ট। 'ট্রাকটা বাদ দিলে চলাফেরার জন্যে শুধু স্কি'র

ওপর নির্ভর করতে হবে আমাকে, যে জিনিসটা আমি ভাল পারি না। তোমরাই বলো, তুষারঝড়ের মধ্যে স্কি করে গিয়ে মারিসাকে গুলি করে, ফিরে এসে, শহরে গিয়ে রাইফেলটা কখন লুকালাম ট্রাকের মধ্যে? সম্ভব? তা ছাড়া আমি ওটা ওখানে লুকাতেই বা যাব কেন? তারপর সেখান থেকে আবার স্কি করে এখানে ফিরে আসা। কত দূরে বাস করি সে তো দেখতেই পাচ্ছ।...কিন্তু এ সবের সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক?'

বলতে গেল কিশোর, কিন্তু থামিয়ে দিয়ে লঙ হার্ট বললেন, 'ঠিক আছে, আমিই বলছি। তোমরা হচ্ছ সেই তিনজন, যারা মারিসাকে তুলে এনে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছ। ভালই করেছ। মারিসার বেঁচে থাকা দরকার। একটা অতি জরুরী গবেষণা করছে সে।'

'বন্য প্রাণী সংরক্ষণের কাজ,' বলল কিশোর। 'কিন্তু আমরা শুনলাম, ওই একই জায়গা দখলের জন্যে আপনিও লড়ে চলেছেন?'

'আমাদের লড়াইটার উদ্দেশ্য কমবেশি একই,' লঙ হার্ট জানালেন। 'শত শত বছর ধরে প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে, একে অন্যকে সহযোগিতা করে বাস করেছে ইউটি আর অন্যান্য গোত্রের ইনডিয়ানরা। আর কুগারের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা আছে আমাদের। আমরা ওদেরকে বলি পর্বতের প্রেত।'

'তারমানে, আপনি বলতে চাইছেন, ইউটিরা তাদের ভূমি ফেরত পেলে মারিসা কুপার আপনাদের জন্যে কোন হুমকি নন?'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন লঙ হার্ট। 'একটা কথা তোমাদের জোর দিয়ে বলতে পারি, যদি পূর্ব-পুরুষের জমি ফেরত পাই আমরা, চমৎকার ওই প্রাণীগুলোর বেঁচে থাকার জন্যে যতটা জায়গা দরকার, নির্দ্বিধায় ছেড়ে দেব।'

দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। মুসা আর রবিনের মুখ দেখে বোঝা গেল, লঙ হার্টের কথা বিশ্বাস করেছে ওরা। কিশোরও করল। 'তাহলে ধরে নিতে পারি, ডক্টর কুপারকে খুন করার কোন মোটিভ বা উদ্দেশ্য আপনার নেই। কিন্তু আপনার রাইফেলটা ট্রাকে গেল কি ভাবে? ব্যালিস্টিক রিপোর্ট যদি প্রমাণ করে গুলিটা আপনার রাইফেল থেকেই বেরিয়েছে, আবার আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসবেন শেরিফ। আপনার যে বড় শত্রু রয়েছে এখানে, এটা না জানার কথা নয় তাঁর।'

আকাশের দিকে তাকালেন লঙ হার্ট। 'অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের বন্ধুটিকেও অসুস্থ মনে হচ্ছে,' রবিনকে দেখালেন তিনি 'আগুন জ্বেলে গরম গরম খাবার রান্না করতে যাচ্ছি আমি। যাবে নাকি আমার সঙ্গে? না অন্য কোন কাজ আছে তোমাদের?'

'আপনার সঙ্গে যাওয়ার চেয়ে ভাল কোন কাজ আপাতত আমি অন্তত ভাবতে পারছি না,' হেসে বলল মুসা। অস্পষ্ট হয়ে আসা গোধূলির আলোতেও ঝকঝক করে উঠল তার ধবধবে সাদা দাঁত।

এগারো

পপলার গাছের বনের মধ্যে লঙ হার্টের বাড়ি। অতি সাধারণ একটা কাঠের কেবিন। ভেতরে বড় একটা ঘর। একপাশে ঘুমানোর জায়গা, আরেক পাশে পাথরের ফায়ারপ্লেস। ঘরের আসবাবপত্র বেশির ভাগই নিজের হাতে বানানো।

ঘরের আদিম পরিবেশে বড় বেশি বেখাপ্পা লাগছে এককোণে রাখা একটা আনকোরা নতুন রেফ্রিজারেটর, একটা রেডিও, আর লম্বা ওঅর্ক-টেবিলের ওপর রাখা একটা পার্সোনাল কম্পিউটার।

'পাওয়ার লাইন তো দেখছি না,' রবিন বলল। 'ইলেকট্রিসিটি পান কোন্‌খান থেকে?'

'ঘরের পেছনে একটা জেনারেটর আছে,' লঙ হার্ট জানালেন। 'লিকুইড প্রপেনে চলে।' জমিয়ে রাখা কাঠের স্তূপ থেকে এক পাঁজা কাঠ তুলে নিলেন তিনি। ফায়ারপ্লেসে ফেলতে ফেলতে বললেন, 'এখানে আগুন জ্বেলে খুব একটা সুবিধে হয় না। তাপ আটকায় না, বেশির ভাগটাই বেরিয়ে যায় চিমনি দিয়ে।'

ওক কাঠে তৈরি ম্যানটল্‌ থেকে দেশলাই তুলে নিয়ে এলেন তিনি। কাঠে আগুন ধরিয়ে শিক দিয়ে খুঁচিয়ে উসকে দিতে শুরু করলেন আগুন। 'তারপরেও, বাইরে যখন গর্জন করে ফেরে বাতাস, তুষার ঝড়ের তাণ্ডব চলে, এখানে এই আগুনের সান্নিধ্যটাই তখন সারা দুনিয়ায় আমার সবচেয়ে আরামদায়ক সঙ্গী।'

জ্বলে উঠা আগুনে হাত সেঁকতে সেঁকতে মুসা বলল, 'এ মুহূর্তে আমারও সে-কথাই মনে হচ্ছে।'

তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন লঙ হার্ট। 'খুব সহজ করে কথা বলো তুমি। ইউটি কিশোরদের মত।'

হেসে রবিনকে দেখাল কিশোর, 'অথচ ইনডিয়ান রক্তের মিশ্রণ ওর গায়ে।'

'ওকেও জটিল মনে হচ্ছে না।' ভুরু নাচালেন লঙ হার্ট, 'কেমন লাগছে তোমার এখন, রবিন?'

'ভাল। তবে মাথার মধ্যেটা ভাল না।'

'কি হয়েছে?'

'মাথায় একবার বাড়ি খেয়েছিল ও,' কিশোর জানাল। 'কয়েকটা দিনের কথা চিরকালের জন্যে মুছে গেছে স্মৃতি থেকে। ডাক্তার বলেছেন, ওই আঘাতেরই কুফল এটা। তবে সেই সঙ্গে অদ্ভুত কিছু ক্ষমতা তৈরি হয়েছে ওর মগজের মধ্যে।'

চোখের পাতা সরু করে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত রবিনের দিকে তাকিয়ে রইলেন লঙ হার্ট। তারপর বললেন, 'উল্টোপাল্টা দেখে নাকি? অতীত-ভবিষ্যৎ দেখে?'

'বর্তমানও দেখে,' কিশোর অবাক। 'কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?'

'ইনডিয়ানরা এ ধরনের নানা রকম অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী,' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন লঙ হার্ট। 'বাস্তবতা আছে বলেই হয়তো।'

ওঅর্ক-টেবিলটার কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। টেবিলের ওপাশের দেয়ালে

খোপ খোপ করে তার মধ্যে সাজিয়ে রাখা হয়েছে নানা রকমের পাথর, নুড়ি, অস্ত্র, ভাঙা পাত্র, তীরের মাথা, এ সব জিনিস। 'এখানে কেউ প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা চালায় মনে হচ্ছে?'

'এটা আমার হবি,' নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিলেন লঙ হার্ট।

'শুধুই হবি?' কম্পিউটারটার দিকে তাকাল কিশোর।

হাসলেন লঙ হার্ট। 'নাহ্, তুমি নাছোড়বান্দা ছেলে। না জেনে আর ছাড়লে না। সত্যি কথাটা হলো, প্রফেসরগিরি ছেড়ে পালিয়েছি আমি। ইউনিভার্সিটিতে আর টিকতে পারছিলাম না, দম আটকে আসছিল আমার। চলে এলাম এখানে। আমার গোত্রকে সহায়তা করার জন্যে। নিজেদের দাবি আদায় করতে গিয়ে জড়িয়ে পড়লাম এখানকার পলিটিক্সে।'

নতুন দৃষ্টিতে তাকাল কিশোর লম্বা কালো চুলওয়ালা বিশালদেহী মানুষটার দিকে। 'আপনার রাজনীতির কথা শোনার জন্যে সাংঘাতিক কৌতূহল হচ্ছে আমার।'

চওড়া, পেশীবহুল কাঁধটায় ঝাঁকি দিলেন লঙ হার্ট। 'বলার খুব বেশি কিছু নেই। গোত্রের কয়েকজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী আর আইনজ্ঞের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছি আমি কয়েক বছর হলো। আমাদের ভূমি আমরা ফেরত পাব কিনা, নিশ্চিত নই। তবে তোলপাড় করে ছাড়ব। অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রেও আমাদের ঠকাচ্ছে সরকার। আমাদের দাবি ইনডিয়ানদের জন্যে ভাল স্কুল, ভাল হাসপাতাল, ভাল থাকার প্রতিশ্রুতি।'

'তারমানে আন্দোলন। কিন্তু সহিংসতা ছাড়া কি সেটা সম্ভব?'

'দেখো, আমি সহিংসতায় বিশ্বাসী নই। আমি চাই শান্তি। জনমত তৈরি করে চাপ দিয়ে সরকারকে বাধ্য করতে চাই আমাদের জমি যাতে ফিরিয়ে দেয়।'

একটা র‍্যাকে ধনুক দেখতে পেল রবিন। গাছ থেকে নামার সময় যে রকম ধনুক ছিল লঙ হার্টের হাতে, সে-রকম আরও তিনটে ধনুক রয়েছে এখানে। ফাইবার গ্লাসে তৈরি দণ্ড আর ইস্পাতের তারে তৈরি ছিলাগুলোকে দুই মাথায় লাগানো পুলির ভেতর দিয়ে টেনে আনা হয়েছে। এতে নিখুঁত নিশানা সহ প্রচণ্ড শক্তিতে তীর ছুঁড়ে দেয়ার ক্ষমতা তৈরি হয়েছে ধনুকগুলোর। রাইফেলের গুলির চেয়ে কম মারাত্মক নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বরং বেশি। সহিংসতায় বিশ্বাসী নন, তাহলে এত অস্ত্র দিয়ে কি করেন তিনি?

ঘুরে বেড়াচ্ছে রবিনের চোখ। ওঅর্কবেঞ্চের এক ধারে রাখা কিছু কাজ করার যন্ত্রপাতি, কাছেই রাখা নতুন তৈরি কিছু অতি আধুনিক তীর, কোন কোনটা বানানো শেষ হয়নি এখনও। দেয়ালে বসানো কোট রাখার র‍্যাকটা তৈরি হয়েছে এল্‌ক্ হরিণের শিং দিয়ে। মেঝের মাদুরটাও পশুর চামড়ায় তৈরি।

'বোঝা যায়, বাড়ির মালিক শিকারী,' সন্দেহের কথাটা ঘুরিয়ে বলল রবিন।

'আর কি বোঝা যায়?' ভুরু নাচালেন লঙ হার্ট।

'সেটাই তো জানতে চাইছি আমরা,' রবিনের জবাবের দেরি দেখে বলে উঠল কিশোর। একটা তীর তুলে নিয়ে মাথাটায় সাবধানে আঙুল ছুঁইয়ে ধার পরীক্ষা করল সে। 'এ সব অস্ত্র দিয়ে কি করেন আপনি?'

'ওই যে রবিন বলল, শিকার,' জবাব দিলেন লঙ হার্ট। 'জন্তু-জানোয়ারকে যতই ভালবাসি আমি, বেঁচে থাকার জন্যে খাবার খেতে হয় আমাকে। তবে মাংসের জন্যে যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই শিকার করি আমি, তারচেয়ে এক ছটাকও বেশি নয়–আমার পূর্ব-পুরুষরা যা করতেন। তাদের মত তীর-ধনুকই ব্যবহার করি, কোন রকম আগ্নেয়াস্ত্র নেই আমার কাছে।'

'কিন্তু এত আধুনিক ধনুক নিশ্চয় ছিল না তাদের,' কিশোর বলল। 'তা ছাড়া এখানে কোন বন্দুক দেখতে পাচ্ছি না বলেই যে আগ্নেয়াস্ত্র নেই আপনার কাছে, তাই বা কি করে বিশ্বাস করব?'

'না, নেই,' জোর দিয়ে বললেন লঙ হার্ট। রান্নাঘরের জন্যে বরাদ্দ ছোট্ট জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। স্টোভের ওপরে দেয়ালে লাগানো একটা ছোট আলমারির দরজা খুললেন। 'আজ রাতে ক্যানড বীন দিয়েই খাওয়া সারতে হবে তোমাদের। হরিণই পেতে, গাছে উঠে বসেছিলাম; কিন্তু শেরিফের গাড়ি আর তোমাদের আনাগোনার কারণে পালাল ওটা। কি আর করা। তোমাদেরই পিছু নিলাম। তোমরা কে, কেন এসেছ জানার জন্যে।'

'ক্যানড বীনেই চলবে আমাদের,' কিশোর বলল।

দুই হাত ছড়িয়ে হাই তুলল রবিন। 'খাওয়ার চেয়ে শোয়ার দরকার বেশি আমার। আগুনের ধারে এই চেয়ারেই মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়ব।'

'সেটাই করতে হবে তোমাদের,' লঙ হার্ট বললেন। 'চেয়ারেই রাত কাটাতে হবে। কারণ তিনজনকে দেয়ার মত বিছানা আমার নেই। আর, সকালের আগে বেরোতেও পারবে না।'

তাঁর শেষ কথাগুলো বোধহয় কানে ঢোকেনি রবিনের। চোখ বোজা। ভারী নিঃশ্বাস। ঘুমিয়ে পড়েছে।

বারো

সূর্য ওঠার খানিক আগে দরজা বাড়ি খাওয়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। খোলা দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকছে বরফের মত শীতল বাতাস। লঙ হার্টকে দেখল না। টেবিলের ওপর একটা নোট চাপা দেয়া। জানিয়ে গেছেন, তিনি শিকারে বেরিয়েছেন। ফিরতে দেরি হবে। আরও লিখেছেন, ট্রেইল ধরে এগোলে গাড়ির কাছে পৌঁছতে কোন অসুবিধে হবে না ওদের। মেসেজটা পরিষ্কার: আমি ফিরে এসে আর তোমাদের দেখতে চাই না।

থাকার ইচ্ছে কিশোরেরও নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শহরে ফিরে যেতে চায়। ডক্টর কুপারের কোন উন্নতি হয়েছে কিনা জানার জন্যে অস্থির। কিন্তু বাইরে এখনও অন্ধকার। ট্রেইল দেখতে পাবে না। আলো ফোটার অপেক্ষা করতেই হবে।

দরজাটা আবার লাগিয়ে দিতে গিয়ে কি ভেবে বারান্দায় বেরিয়ে এল কিশোর। পর্বত থেকে আসা বাতাসের ঝাপটায় থরথর করে কেঁপে উঠল সে। নাহ্, দাঁড়ানো যাবে না। ঘরে ঢুকে আবার দরজা লাগাতে যাবে, ঠিক এই সময় তীক্ষ্ণ শব্দে ভেঙে

গেল দরজার কাঠ। তীক্ষ্ণ ব্যথা ছড়িয়ে গেল মাথায়। চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করল।

গরমকালে সৈকতে ঘুরে বেড়ানোর স্বপ্ন দেখছিল মুসা। স্বপ্নে বজ্রপাত হতে দেখল। শব্দ শুনে চমকে জেগে গেল সে।

কার যেন চিৎকার কানে এল, 'লেগেছে! লেগেছে!'

আরেকটা চিৎকার শোনা গেল, 'আরে করলে কি! মেরে ফেলেছ নাকি?'

চিৎকার শুনে ধীরে ধীরে চোখ মেলল রবিনও। মাথার মধ্যে ঘোলাটে ভাব। সব কিছু ঘুমের ঘোরে দেখছে বলে মনে হলো তার। দরজার কাছে পড়ে থাকতে দেখল একটা দেহ।

'কিশোর!' চিৎকার করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল সে। বোঁ করে চক্কর দিয়ে উঠল মাথার মধ্যে। ধপ করে বসে পড়ল আবার।

তবে মুসা রওনা হয়ে গেছে ততক্ষণে। হাঁটু গেড়ে বসল কিশোরের পাশে। মাথা থেকে রক্ত বেরোতে দেখল। মানুষের কথা কানে আসছে। তিনজন লোককে বেরিয়ে আসতে দেখল গাছের আড়াল থেকে।

হ্যাট দিয়ে একজন ডেপুটির হাতে বাড়ি মারলেন শেরিফ হ্যামিলটন। 'সরাও ওটা!' গর্জে উঠলেন তিনি। 'আবার টিপ দিয়ে বসবে তো।'

আহত দৃষ্টিতে বসের দিকে তাকাল মারটিন। 'আপনিই তো বললেন ও বিপজ্জনক। সাথে বন্দুক থাকতে পারে।'

হ্যাটের চাঁদিতে লাগা তুষার মুছতে মুছতে শেরিফ বললেন, 'ছেলেটার সাইজ দেখেও কি মাথায় কিছু ঢোকেনি? ওকে লঙ হার্টের মত মনে হচ্ছে? ওদের কাছে অস্ত্র আসবে কোত্থেকে?'

গুঙিয়ে উঠে চোখ মেলল কিশোর। 'কি হয়েছে?'

'গুলিতে কাঠের চলটা উঠে এসে তোমার মাথায় লেগেছে,' মুসা জানাল।

'ট্রিগারে টিপ দিয়ে ফেলেছিল এই গাধাটা,' মারটিনকে দেখালেন শেরিফ। কিশোরকে কথা বলতে শুনে স্বস্তি বোধ করছেন তিনি।

কিশোরকে উঠে বসতে সাহায্য করল মুসা।

'গতকাল এসেছিলেন লঙ হার্টের সঙ্গে কথা বলতে,' কিশোর বলল। 'আজ এসেছেন গুলি করতে। ঘটনাটা কি? ব্যালিস্টিক রিপোর্ট কি নিশ্চিত করেছে তাঁর রাইফেল দিয়েই গুলি করা হয়েছিল ডক্টর কুপারকে?'

'উঁহু, এখনও অমীমাংসিত রয়েছে ব্যাপারটা,' শেরিফ জানালেন।

'রাইফেলটা কার নামে রেজিস্ট্রি করা, চেক করেছেন?'

'করেছি। লঙ হার্টের নামে কোন আগ্নেয়াস্ত্র রেজিস্ট্রি করা নেই। রাইফেলের গা থেকে সিরিয়াল নম্বরটাও রেঁদা দিয়ে ঘষে তুলে ফেলা হয়েছে। কাজেই কার নামে রেজিস্ট্রি করা হয়েছিল ওটা, তা-ও আর জানা সম্ভব না। অতি চমৎকার একটা অস্ত্র—আনকোরা নতুন বোল্ট-অ্যাকশন উইনচেস্টার, জার্মান টেলিস্কোপ লাগানো।'

'একটা কথার সরাসরি জবাব দেবেন?' কিশোর বলল, 'কার রাইফেল জানেন না। ওটা দিয়ে আদৌ গুলি করা হয়েছে কিনা নিশ্চিত নন। তাহলে দল বেঁধে লঙ

হার্টের পেছনে লেগেছেন কেন?'

'একজন সাক্ষী আছে আমাদের,' জবাব দিলেন শেরিফ।

'সেই উড়ো টেলিফোনওয়ালা? নাকি আরও কাউকে খুঁজে পেয়েছেন, যে লঙ হার্টকে গুলি করতে দেখেছে?'

'গুলি করতে দেখেনি,' শেরিফ জানালেন, 'তবে সেদিন সকালে ওই এলাকায় দেখা গেছে লঙ হার্টকে। ওখান থেকে তিন মাইল উত্তরে ক্যাম্প করেছিল একটা শিকারী দল। ওদের গাইড এল্‌ক্ স্প্রিঙের লোক, নাম টেরি জনসন। ও বলেছে।'

'টেরি জনসন যে মিছে কথা বলেনি, কি করে জানছেন? সে-ও তো গুলি করে থাকতে পারে। নিজে বাঁচার জন্যে এখন অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে।'

'সে-কথা ভাবিনি মনে করেছ?' শেরিফ বললেন। 'টেরির কথা শোনার পর গিয়ে শিকারী দলটার সঙ্গে দেখা করেছি। একই কথা বলেছে সব ক'জন—[illegible]ছুট হয়নি সেদিন সকালে কেউ ওরা। একা সরে গিয়ে যে গুলি করে আসবে কেউ সে-সম্ভাবনা নেই। তা ছাড়া একজনও সেদিন সকালে একটা গুলি ছোঁড়েনি।'

'কিন্তু ঝড় ছিল তখন,' যুক্তি দেখাল কিশোর। 'ঝড়ের মধ্যে লঙ হার্টকে দেখল কি ভাবে? দশটার আগে তো ঝড় থামেইনি।'

'থেমেছিল একবার, সামান্য সময়ের জন্যে, ন'টার সময়,' [illegible]ন করিয়ে দিল মুসা।

'হুঁ!' শেরিফের দিকে তাকাল কিশোর। 'কি শিকার করতে বেরিয়েছিল ওরা, বলেছে কিছু?'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিলেন শেরিফ। 'কুগার।' কিশোরকে পাশ কাটিয়ে ঘরের মাঝখানে চলে গেলেন তিনি। চারপাশে তাকাতে তাকাতে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা এখানে কি করছ?'

'লঙ হার্টের বাড়ি দেখতে এসেছি,' হালকা স্বরে জবাব দিল কিশোর। 'বেআইনী কিছু করেছি?'

ঘুরে দাঁড়িয়ে শীতল দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকালেন শেরিফ। 'অন্যের ঘরে বেআইনী ভাবে ঢোকার অপরাধে আমি তোমাদের অ্যারেস্ট করতে পারি।'

আস্তে করে উঠে দাঁড়াল কিশোর। মাথার কেটে যাওয়া জায়গাটায় আঙুল চেপে ধরে জবাব দিল, 'আমি আপনাদের বিরুদ্ধে আমাকে গুলি করার অভিযোগ করে কেস করতে পারি।' লঙ হার্টই যে ওদের নিয়ে এসেছে, সেটা চেপে গেল শেরিফের কাছে।

একটা মুহূর্তের জন্যে থমকে গেলেন শেরিফ। হ্যাটের কানা ধরে ঠেলে সামান্য পেছনে সরিয়ে দিলেন। হাসিটা ফিরে এল আবার মুখে। 'অকারণেই কথা বাড়াচ্ছি আমরা। চলো, গাড়িতে করে বড় রাস্তায় পৌঁছে দিই তোমাদের।' রবিনের দিকে তাকালেন তিনি। 'ওর কি হয়েছে?'

'শরীর খারাপ,' জবাব দিল মুসা।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত রবিনের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন শেরিফ, 'কি হয়েছে?'

'মগজের অসুখ,' কিশোর জানাল। 'হাওয়া বদল করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন

ডাক্তার, সে-জন্যেই এল্‌ক্ স্প্রিঙে এসেছিলাম আমরা।'

'ও। তাহলে তো তোমাদের পৌঁছে দেয়াটা আরও জরুরী।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'তোমার জখমটা কি খুব ব্যথা করছে?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'চামড়া কেটেছে সামান্য। তবে কাঠের চলটার ধাক্কাটাও কম ছিল না। বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম।'

তেরো

শেরিফের গাড়ি থেকে নেমে নিজেদের গাড়িতে চড়ল তিন গোয়েন্দা। শহরে ঢুকে সোজা হাসপাতালে চলল ডক্টর কুপারকে দেখতে। ঢোকার মুখে ফ্র্যাঙ্ক হ্যানকে বেরিয়ে আসতে দেখল।

ওদের দেখে দাঁড়াল হ্যান।

'ডক্টর কুপার কেমন আছেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'জ্ঞান ফেরেনি এখনও,' জবাব দিল হ্যান। 'তবে অবনতিও আর হয়নি। আচ্ছন্নতার মধ্যে আছে।'

'তারমানে ভাল হয়ে যাবেন,' আশা করল কিশোর। 'অবনতি যেহেতু আর হয়নি।'

'আমি শুনেছি,' রবিন বলল, 'আচ্ছন্নতার মধ্যে রোগীর সামনে বসে তাকে নিয়ে কথা বললে, আলোচনা করলে দ্রুত উন্নতি হয়।'

কথাটা পছন্দ হলো না হ্যানের। বলল, 'সামনে বসে কথা বলা তো দূরের কথা, তাকে এক পলক দেখতেও দেবে কিনা সন্দেহ। মারিসার আঙ্কেল আর আন্টি এসেছিল, তাদেরকেই দেখতে দেয়া হয়নি। তোমরা তো আত্মীয়ও নও। পরিচয়ও অতি সামান্য। আমি যেতে পেরেছি কেবল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের একজন নার্সের সঙ্গে আমার খাতির আছে বলে।'

'তাহলে তাকে বলে আমাদের ঢোকার ব্যবস্থা করে দিন না,' অনুরোধ করল কিশোর।

ঘড়ি দেখল হ্যান। 'সরি। সময় নেই। আমাকে এক্ষুণি দোকানে ফিরে যেতে হবে। জরুরী কাজ আছে।'

'ওহ্হো, আপনার যে একটা দোকান আছে ভুলেই গিয়েছিলাম,' কিশোর বলল। 'বেশি দূরে?'

হাসল হ্যান। 'এল্‌ক্ স্প্রিঙে কোন কিছুই কোনখান থেকে বেশি দূরে নয়। এখান থেকে দুই ব্লক দূরে আমার দোকান।'

'ও, তাই নাকি। নতুন একটা স্লীপিং ব্যাগ দরকার আমার, বেশি গরম। আপনার সঙ্গে আসি?'

'আসো, অসুবিধে নেই,' হ্যান বলল। 'দামও কমিয়ে রাখব। একটা অন্তত ভাল স্মৃতি নিয়ে এ শহর থেকে যেতে পারবে।'

'শহরটা কিন্তু আমার ভালই লাগছে,' রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে বলল কিশোর।

'দোকানপাটগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে সেই আদিকাল থেকে আছে এখানে, থাকবে চিরকাল।'

'খাবারের দোকানও তো দেখছি না,' মুসা বলল, 'ফাস্ট ফুড।'

রবিন নেই ওদের সঙ্গে। হাঁটতে গেলে মাথা ঘুরে যদি আবার পড়ে যায়, এই ভয়ে ওর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওকে বসিয়ে রেখে এসেছে গাড়িতে।

একটা দোকানের সামনে এসে থামল হ্যান। দরজার কপালে কাঠের সাইনবোর্ড। তাতে খোদাই করে দোকানের নাম লেখা। দরজা ঠেলে খুলতে খুলতে বলল, 'এল্‌ক্‌ স্প্রিঙে আরও ট্যুরিস্ট আসা দরকার। নতুন রাস্তাটা হয়ে গেলে অবশ্য এখনকার অবস্থা থাকবে না।'

'আসা সহজ হলে তো অ্যাসপেনের মত হয়ে যাবে,' মুসা বলল। 'আরেকটা রিজর্ট টাউন।'

হেসে বলল হ্যান, 'আমার কোন অসুবিধে নেই তাতে। বাস করতে পারব। আমার দরকার ব্যবসা।'

স্তূপ করে রাখা ডে-প্যাক, ডাফল্‌ ব্যাগ, ক্যানটিন আর কুক স্টোভের মাঝের সরু গলি ধরে এগিয়ে গেল কিশোর। বৃষ্টিতে পরার উপযোগী নানা রকম পোশাক ঠেলে সরিয়ে রাখা হয়েছে ক্যামোফ্লেজ পোশাকগুলোর দিকে। ওগুলোর কাছেই রাখা হয়েছে তাঁবু আর ব্যাকপ্যাক। কাঁচের একটা তালা দেয়া কেসের মধ্যে রাখা শটগানের নানা রকম রঙিন কার্তুজ, হরিণ মারার গুলি আর হাই-ক্যালিবার রাইফেলের বুলেট।

'আপনার খদ্দেররা মনে হচ্ছে বেশির ভাগই শিকারী?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল হ্যান। 'হ্যাঁ। শিকারীরাই আমার ভরসা। শিকারের বিরুদ্ধে কেন এত আন্দোলন, মাথায় ঢোকে না আমার। রোজ রোজ কোটি কোটি গরু-ছাগল মাছ-মুরগী মেরে মেরে খাচ্ছে, সেগুলো নিয়ে তো কারও মাথাব্যথা নেই। একটিবার উচ্চারণও করে না। যত আপত্তি কেবল অন্য প্রাণী মারার বেলায়। তবে, আমি অবশ্য শিকার-টিকার করি না।'

কাউন্টারের পেছনে বড় একটা ছবি। তাতে স্কি'র পোশাক পরা একজন মানুষ। কাঁধে ঝোলানো রাইফেল। সেটা দেখিয়ে মুসা বলল, 'আপনার ছবিই তো মনে হচ্ছে। শিকারে যদি আগ্রহই না থাকে, এটা কিসের?'

'বিয়্যাথ্‌লন কমপিটিশন,' হ্যান জানাল। 'ক্রস-কান্ট্রি স্কিইং আর সেই সঙ্গে টার্গেট শূটিং প্র্যাকটিসের মিশ্রণ। আমি যে রাইফেল ব্যবহার করি, দেখে সবাই হাসে—টোয়েন্টি টু বোর। নিশানা হয় সাংঘাতিক, কিন্তু কাঠবিড়ালী ছাড়া আর কিছু পড়ে না।'

'অলিম্পিকেও তো বিয়্যথ্‌লন প্রতিযোগিতা হয়, তাই না?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল হ্যান। 'অলিম্পিক টীমেই ছিলাম আমি। তবে বাড়তি হিসেবে। খেলা চলার সময় কেউ হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়লে, কিংবা পা ভেঙে গেলে তার জায়গায় ঢুকতে পারতাম আমি। আমার কপাল খারাপ, তেমন কিছু ঘটেনি একবারও। ফলে সোনা জেতার সুযোগও আর পাইনি কখনও।'

'এখানকার গাইডদের নিশ্চয় চেনেন আপনি?' আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসতে

চাইল কিশোর।

'তা তো চিনিই,' ছবিটার দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিল হ্যান।

'টেরি জনসনকে চেনেন?'

ফিরে তাকাল হ্যান। 'কোথায় শুনেছ ওর নাম?'

'শেরিফ বলেছেন। গিরিখাতের যেখানে গুলি খেয়েছেন ডক্টর কুপার, সেখানে নাকি লঙ হার্টকে দেখেছে টেরি।'

'ওকে অত বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই,' হ্যান বলল। 'আগে গেম ওয়ার্ডেন ছিল। ঘুষ খেয়ে বেআইনী ভাবে শিকার করতে দেয়ার অপরাধে তার চাকরি যায়। এখন নিজেই একটা অফিস খুলে বসেছে। গাইডের কাজ করে। শিকারে সাহায্য করে।'

'আপনার কি মনে হয় শেরিফের কাছে মিথ্যে বলেছে টেরি?'

শ্রাগ করল হ্যান। 'বলা কঠিন। ওকে দিয়ে অনেক কিছুই সম্ভব।' চোখের পাতা সরু হয়ে এল তার। 'ডক্টর কুপারকে সে-ই গুলি করেছে ভাবছ না তো আবার?'

'ভাবতে তো আর দোষ নেই, কি বলেন?' মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'টেরি জনসনের সঙ্গে দেখা করে তাকেই তো জিজ্ঞেস করতে পারি কথাটা, কি বলো?'

টেরি জনসন কোথায় থাকে বলে দিল হ্যান। শহরের বাইরে। রবিনকে আর নিল না সেখানে কিশোর। তাকে হোটেলে বিশ্রাম করতে রেখে এসে মুসাকে নিয়ে রওনা দিল।

পুরানো ফার্মহাউসটার কাছে সবে পৌঁছেছে ওরা, দেখল নীল রঙের একটা পুরানো পিকআপ ট্রাক পেছনে লাগানো একটা ট্রেলারকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে আসছে ড্রাইভওয়ে দিয়ে। তিনজন লোক বসা গাড়িতে। ট্রাকের পেছনে কয়েকটা বাক্স রাখা। ট্রেলারে রাখা হয়েছে দুটো কালো রঙের স্নোমোবাইল।

গতি কমাল মুসা। পিকআপটাকে এগিয়ে যেতে দিল।

'মনে হচ্ছে শিকার শেখাতে নিয়ে যাচ্ছে,' কিশোর বলল। 'পিছু নিলে মন্দ হয় না, কি বলো? বিনে পয়সায় দু'চারটে উপায় আমরাও শিখে নিতে পারি।'

দাঁত বের করে হাসল মুসা। 'তা তো পারিই। চোখ-কান খোলা রাখলে হয়তো আরও অনেক কিছুই শেখা যাবে।'

ট্রেলারের পিছু নিল মুসা। বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে একই গতিতে এগিয়ে চলল।

'খুব বেশি এগোতে দিলে কিন্তু হারিয়ে যাবে,' সাবধান করল কিশোর।

'বেশি কাছে গেলেও দেখে ফেলবে,' মুসা বলল। 'এত বেশি ফাঁকা, চোখে না পড়লেই বরং অবাক হব।'

বরফে ঢাকা রাস্তা। তার ওপর তুষার ছাওয়া। আঁকাবাঁকা সেই পাহাড়ী পথ ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে ট্রেলার। থামল গিয়ে একটা ঢালের ধারে।

গাড়ি থামিয়ে দিল মুসা। দ্রুত পিছিয়ে নিয়ে এল মোড়ের আড়ালে, যাতে চোখে পড়ে না যায়। গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে প্যাক থেকে মনোকিউলারটা বের করল

কিশোর।

বড় একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে বসে শিকারী-দলটার ওপর নজর রাখতে লাগল ওরা। ভারী দেহের লাল দাড়িওয়ালা একজন লোক ট্রেলার থেকে স্নোমোবাইল দুটো নামানোর পর পিকআপের পেছনে গিয়ে উঠল।

'ওই লোকটাই মনে হয় টেরি জনসন,' ফিসফিস করে মুসাকে বলল কিশোর। বাক্স থেকে যা বেরোল দেখে ভুরু কুঁচকে গেল তার। মনোকিউলারটা মুসার হাতে দিতে দিতে বলল, 'কুকুর!'

মুসা যন্ত্রটা চোখে লাগিয়ে ফোকাস করতে করতেই বাক্সের ভেতরের খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল আধ ডজন বীগল। ঝোলা কানওয়ালা ছোট জাতের এই কুকুরগুলো শিকারের পিছু নিতে ওস্তাদ। লাফ দিয়ে তুষারের ওপর নেমে এসে নাক নিচু করে গন্ধ শুঁকতে শুরু করে দিল ওগুলো। পেছন পেছন লাফ দিয়ে দাড়িওয়ালা লোকটাও নামল। ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল গাড়ির সামনের দিকে। এমন একটা জিনিস বের করল, আরেকটু হলেই হাত থেকে মনোকিউলার ফেলে দিচ্ছিল মুসা।

'খাইছে!' বলে যন্ত্রটা ধরিয়ে দিল কিশোরের হাতে। 'দেখো!'

শুরুতে দেখতে পেল না কিশোর। এদিকে পেছন করে দাঁড়িয়েছে টেরি জনসন। ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল আবার। কোন কিছুর খোঁজ করছে যেন।

মুসার মতই চমকে গেল কিশোরও। টেরির এক হাতে একটা নীলচে বাক্স। তার বেরিয়ে গিয়ে ঢুকেছে লোকটার হাতের অন্য জিনিসটার মধ্যে। গিরিখাতের ঢালের দিকে জিনিসটা তাক করে রেখেছে টেরি। একটা অ্যান্টেনা। মারিসা কুপারের কাছে যে জিনিস দেখেছিল, অবিকল সেই জিনিস। পার্বত্য সিংহকে খুঁজে বের করার যন্ত্র।

মুসার চোখে চোখে তাকাল কিশোর। 'আমি যা ভাবছি তুমিও কি তাই ভাবছ?'

রাগত স্বরে মুসা বলল। 'এ কি কোন শিকার হলো!'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'ঠিক এই কথাটাই ভাবছি আমিও।'

আবার মনোকিউলার চোখে লাগাল সে। ধমকের সুরে কুকুরগুলোকে কি যেন বলল দাড়িওয়ালা লোকটা। ঢাল বেয়ে দৌড়ে নামতে শুরু করল ওগুলো। একটা স্নোমোবাইলের পেছনে একটা কেস সহ রাইফেল আটকে নিল লোকটা। কিছু জিনিসপত্র তুলল। বাকি মোবাইলটাতে নিজেদের রাইফেল রাখতে ব্যস্ত অন্য দুজন লোক। দ্রুত কি যেন আলোচনা করে নিল তিনজনে। দাড়িওয়ালা লোকটা অ্যান্টেনা উঁচু করে ধরে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল নীল বাক্সটার দিকে। আবার কথা বলল অন্য দুজনের সঙ্গে। হাত তুলে দূরে একদিকে নির্দেশ করল। তারপর তিনজনেই দুটো স্নোমোবাইলে উঠে রওনা হয়ে গেল।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। চিৎকার করে বলল, 'চলে যাচ্ছে তো!'

হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে তাকে বসিয়ে দিল কিশোর। 'গাড়ি রেখে গেছে, ফিরে আসতেই হবে। ওদের ফেরার আগেই তাড়াতাড়ি গিয়ে শেরিফকে নিয়ে আসতে পারলে কাজ হয়।'

'কিন্তু তাতে কুগার মারা বন্ধ করতে পারব না,' রেগে আগুন হয়ে গেছে মুসা।

'শিওর ডক্টর কুপারের সিংহগুলোকে মারতে গেছে। গলায় রেডিও লাগানো জানোয়ারগুলোকে অ্যান্টেনার সাহায্যে সহজেই খুঁজে বের করে ফেলবে। কোথাও লুকিয়ে বাঁচতে পারবে না ওগুলো। এরচেয়ে চিড়িয়াখানায় ঢুকে কুগার মারলেই তো পারে!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ভারী পায়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল সে।

পেছনে দৌড়ে গেল কিশোর। 'ইচ্ছেটা কি তোমার? কি করতে চাও?' মুসার মুখ দেখেই বুঝে ফেলেছে, সাংঘাতিক কিছু করতে যাচ্ছে সে। বিপজ্জনক কিছু।

'জানি না কি করব, তবে কিছু একটা করতেই হবে,' চাপা কঠিন কণ্ঠে জবাব দিল মুসা। গাড়ির ছাত থেকে টান দিয়ে খুলে নিল তার স্কি দুটো। গাড়ির ট্রাংক খুলে বের করল স্কি বুট।

'মুসা,' বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর। 'ওরা গেছে স্নোমোবাইলে করে। তা ছাড়া রাইফেল আছে ওদের কাছে। কোনমতেই ঠেকাতে পারব না। প্রথমে গুলি করে মারবে। তারপর গিয়ে রিপোর্ট করবে, ওদের রাইফেলের সামনে চলে গিয়েছিলাম আমরা, দুর্ঘটনায় মরেছি।'

বুটের মধ্যে পা ঢুকিয়ে দিল মুসা। গোঁয়ারের মত বলল, 'কোন যুক্তিই কানে ঢুকবে না এখন আমার। আমি ওই প্রাণীগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়াবই।'

হ্যাঁচকা টানে দস্তানা টেনে দিল কব্জির ওপর। শক্ত করে চেপে ধরল স্কি পোল। 'আমি যাচ্ছি।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'দাঁড়াও, আমিও আসছি। বেঁচে গিয়ে তোমার মৃত্যুর খবরটা তোমার মা-বাবার কাছে জানানোর সাহস আমার হবে না।'

চোদ্দ

ঢাল বেয়ে তীব্র গতিতে নেমে চলল দুজনে। স্পষ্ট দাগ রেখে গেছে স্নোমোবাইল। সহজেই অনুসরণ করা যাচ্ছে।

ইঞ্জিনের শব্দও কানে আসছে মৃদু ভাবে। নিজের ওপর আস্থা তাতে বেড়ে গেল আরও মুসার। 'ওই যে। ধরতে পারব।'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না কিশোর। স্কি থেকে মনোযোগ সরাচ্ছে না। ঢালের যা অবস্থা, একটু এদিক ওদিক হলে ডিগবাজি খেয়ে ছিটকে পড়তে হবে। তাতে ঘাড় ভেঙে মরাটাও অস্বাভাবিক নয়। ধীরে ধীরে গতিটা স্বাভাবিক করে আনল। নিঃশ্বাসের ফাঁকে ফাঁকে বলল, 'কাছে আছে বলেই যে শব্দ শোনা যাচ্ছে তা না-ও হতে পারে। পাহাড়ের ঢালে প্রতিধ্বনিত হয়েও শব্দ শোনা যায়।'

কিন্তু মুসা গতি কমাল না। পোল দিয়ে খোঁচা মেরে বিপজ্জনক গতিতে এগিয়ে চলল। 'বলা যায় না, পরের মোড়টাতেই দেখা হয়ে যেতে পারে ওদের সঙ্গে।'

তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে কিশোর। শেষে আর কোনদিকে না তাকিয়ে শুধু মুসার মাথাটা নজরে রেখে পোল ঠেলে এগিয়ে চলল।

কানের কাছে বাতাসের শাঁ-শাঁ শব্দ। ইঞ্জিনের শব্দ কমতে কমতে মিলিয়ে

গেল দূরে। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই এখন শুনতে পাচ্ছে না মুসা।

নিচে নেমে আবার ওপাশ থেকে খাড়া উঠে গেছে পাহাড়ের দেয়াল। দুটো উপত্যকা যেখানে মিলিত হয়েছে কোনাকুনি ভাবে, সেটা ধরে কিছুক্ষণ এগোল ওরা। তারপর বেরিয়ে এল চওড়া সমতল জায়গায়। বরফে গভীর দাগ কেটে চলে গেছে স্নোমোবাইল। জায়গাটা প্রায় গোলাকার। আধ মাইল মত হবে চওড়া। কিনারে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা লম্বা ফার, পাইন আর পপলার। কোন কিছু নড়তে দেখা গেল না তার মধ্যে।

সমভূমিটা কোন প্রান্তর নয়, বুঝতে পারল কিশোর। জমাট বরফে ঢাকা পার্বত্য হ্রদ। ভেঙে পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। আরোহী সহ দুটো স্নোমোবাইলের ওজন যদি সহ্য করতে পারে, দুজন মানুষের ওজনে ভাঙবে না বরফ। মসৃণ বরফের ওপর দিয়ে সহজেই পিছলে চলল ওরা।

দুই পাহাড়ের মাঝখানের আঁকাবাঁকা যে কোনাকুনি জায়গাটা পেরিয়ে এসেছে ওরা, ওটা কি বুঝতে পারল এতক্ষণে। নালা। গরমকালে ওটা দিয়েই পানি গড়িয়ে এসে এই লেকের সৃষ্টি হয়েছে। চারপাশ ঘিরে গাছপালা ক্রমশ উঠে গেছে ঢাল বেয়ে।

গাছের জটলার মাঝে এক জায়গায় ফাঁক দেখা যাচ্ছে। সেদিকেই গেছে স্নোমোবাইলের দাগ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেদিকেই তাকিয়ে আছে মুসা।

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল দুজনে। দাগ এখানেও স্পষ্ট। কিছুদূর গিয়ে ডানে মোড় নিয়েছে। তারপর এঁকেবেঁকে এগিয়েছে গাছপালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে। লেকের কিনার থেকে প্রায় শ'খানেক ফুট ওপরে একটা সরু রাস্তা চোখে পড়ল মুসার। দমে গেল সে। পোল ঠেলতে ঠেলতে হাত ব্যথা হয়ে গেছে। পা দুটো প্রায় অবশ। নিচে নামা এক কথা, আর স্কি করে ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। কয়েক মিনিট বিশ্রাম না নিলে আর দু'গজও এগোতে পারবে না। তার পরেও শেষ পর্যন্ত শিকারীদের ধরা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ আছে, কারণ ওদের কাছে আছে স্নোমোবাইল।

বিচিত্র একটা শব্দ কানে এল হঠাৎ। পর্বতের ঢালে প্রতিধ্বনিত হয়ে এসেছে বলে প্রথমে বুঝতে পারল না। বোঝার পর চকচক করে উঠল মুসার চোখ। কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'কুকুর!'

ওপরের দিকে কাছেই কোথাও রয়েছে টেরি জনসনের হাউন্ডগুলো।

নতুন শক্তি এসে ভর করল মুসার শরীরে। দ্রুত ছুটতে শুরু করল আবার। এতটা শক্তি যে অবশিষ্ট ছিল তার দেহে, দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল।

দেহের অবশিষ্ট শক্তিটুকু খরচ করে ওপরে উঠে এল দুজনে। খরচটা নিরর্থক হলো না। লেক বেসিনের অন্যপাশে আরেকটা উপত্যকা মত জায়গায়, বড় জোর শ'খানেক গজ দূরে খাড়া হয়ে আছে একটা পাথরের টিলা। ওটার চারপাশ ঘিরে নাচানাচি করছে কুকুরগুলো। ওদের কাছ থেকে সামান্য দূরে স্নোমোবাইল থামিয়ে অপেক্ষা করছে তিন শিকারী।

চাঙড়ের চ্যাপ্টা মাথায় অস্থির ভাবে পায়চারি করছে একটা কুগার। থেকে থেকে গর্জন করে উঠছে। ওর রাগ, ভয় আর অসহায়ত্ব এখান থেকেও অনুভব

করতে পারছে মুসা। দু'একটা কুকুরকে কাবু করতে কোন অসুবিধে হবে না কুগারটার। কিন্তু বাকিগুলোর সঙ্গে পারবে না। পালানোর পথ নেই। ফাঁদে পড়ে গেছে বেচারা।

গোয়েন্দাদের দিকে নজর নেই শিকারীদের। নিজেদের মধ্যে আলোচনায় ব্যস্ত। বাতাসে ভেসে আসছে ওদের টুকরো টুকরো কথা।

'আমি আগে দেখেছি,' বলে উঠল এক শিকারী। 'কাজেই প্রথম গুলিটা আমি করব!'

'দেখেছ তো কি হয়েছে?' ধমকে উঠল দ্বিতীয় জন। শক্ত হাতে রাইফেল চেপে ধরল সে। 'যে আগে গুলি লাগাবে ওটা তার। সরো।'

ঠেলাঠেলি শুরু করে দিল দু'জনে। মাঝখানে টেরি এসে না দাঁড়ালে মারামারিই বেধে যেত।

'ঝগড়া না করে টস্ করো না কেন?' পরামর্শ দিল সে।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। চোখে নীরব জিজ্ঞাসা, 'কি করব?'

তবে জবাবের অপেক্ষা করল না সে। কিশোর বাধা দেবার আগেই ছুটতে শুরু করল। নিচের দিকে নামছে। দ্রুত পৌঁছে যাবে শিকারীদের কাছে।

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল লাল দাড়িওয়ালা। মস্ত রিভলভারটা যেন লাফ দিয়ে হাতে উঠে এল তার। কিশোরের কাছে মনে হলো কামানের নল। মুসার দিকে তাক করল টেরি।

পরোয়াই করল না মুসা। দাঁতে দাঁত চেপে ছুটে যাচ্ছে শিকারীদের দিকে। হাঁটু ভাঁজ করে, পিঠ বেকিয়ে ঝুঁকে রয়েছে স্কি'র ওপর। নিশানা হিসেবে নিজেকে যতটা সম্ভব ছোট করে তুলতে চাইছে। কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে বলে মনে হলো না কিশোরের।

দ্বিধায় পড়ে গেছে টেরি। গুলি করতে দেরি করে ফেলল। শেষ মুহূর্তে লাফ দিয়ে সরে যেতে চাইল মুসার আগমন-পথ থেকে। গিয়ে পড়ল একজন শিকারীর গায়ে। দুজনেই পড়ে গেল মাটিতে।

পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল দ্বিতীয় শিকারী। হাতে রাইফেল। তার গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল মুসা। কাঁধ বাঁকা করে একপাশ দিয়ে ধাক্কা মারল শিকারীর গায়ে। রাইফেলটা আলগা ভাবে ধরেছিল বোধহয় শিকারী, পড়ে গেল হাত থেকে। ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে গিয়ে ঠেকল পাথরের গায়ে। চাপ লেগে গেল ট্রিগারে। বিকট শব্দে গুলি ফুটল। কারও গায়ে লাগল না বুলেট। ঠং করে উঠল ধাতব জিনিসে লেগে।

আচমকা এই হট্টগোলে দ্বিধায় পড়ে গেল কুকুরগুলো। ভড়কে গিয়ে ছুটাছুটি শুরু করল এদিক ওদিক। কুগারটার ওপর থেকে দৃষ্টি সরে গেল।

সুযোগটা কাজে লাগাল কুগার। শেষবারের মত গর্জন করে উঠে বিরাট এক লাফ মারল। পাথরের ওপর থেকে প্রায় উড়ে নেমে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল গাছপালার আড়ালে।

পনেরো

উঠে দাঁড়াল জনসন। রিভলভারটা খাপে ভরে রেখে গটগট করে এসে দাঁড়াল মুসার কাছে। মুসাও পড়ে গেছে।

কলার ধরে টেনে তুলল তাকে জনসন। 'পাগল, না মগজ নষ্ট তোমার!' রাগে নিজের দাড়ির মতই লাল হয়ে গেছে মুখ। 'আরেকটু হলেই তো গুলি খেতে!'

মুসাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'গুলি করাই উচিত ছিল। যদি বুঝতাম, সব ভজকট করে দেবে তুমি, আমার নতুন স্নোমোবাইলটাতে গুলি লাগাবে, তাহলে আর দ্বিধা করতাম না।'

স্নোমোবাইল দুটোর দিকে ফিরে তাকাল মুসা। বিশ্রী ভাবে রঙ চটে গেছে একটার। 'কই,' শুকিয়ে কণ্ঠস্বর খসখসে হয়ে গেছে তার। 'ফুটো তো হয়নি। ঘষা লেগে রঙ উঠেছে শুধু।'

'আর শিকারের যে ক্ষতিটা করলে?' গর্জে উঠল জনসন। 'এই দুই ভদ্রলোক কুগার শিকারের জন্যে টাকা দিয়েছেন আমাকে। তার কি হবে?'

শীতল দৃষ্টিতে জনসনের দিকে তাকাল মুসা। 'একে শিকার বলে?'

'তাহলে কি বলে!' চাবুকের মত শপাং করে উঠল জনসনের কণ্ঠ।

'খুন,' জবাব এল কিশোরের কাছ থেকে।

ফিরে তাকাল মুসা। মাটিতে পড়ে যাওয়া অ্যান্টেনাটা তুলে নিয়েছে কিশোর।

'আপনারা যা করতে যাচ্ছিলেন,' আবার বলল কিশোর, 'সেটা খুন।'

'শিকার মানেই তো খুন,' জনসন বলল।

'শিকার মানে হত্যা, ঠিক; তবে তাতে প্রতিপক্ষেরও লড়াইয়ের সুযোগ থাকে। তা ছাড়া, শিকারকে আত্মগোপন করে থাকার সুযোগটাও আপনারা দেননি।' অ্যান্টেনাটার দিকে নির্দেশ করে বলল কিশোর, 'ডক্টর কুপারের কলারে লাগানো রেডিও কুগার খুঁজে বের করা সহজ করে দিয়েছে আপনাদের জন্যে। কর্তৃপক্ষের কানে গেলে ওরা বেআইনী বলতে বাধ্য হবে। অ্যান্টেনা দিয়ে গবেষণার নিয়ম আছে, শিকারের নেই।'

'অ্যান্টেনা দিয়ে কুগার খুঁজে বের করি কে বলল তোমাদের?' হাত তুলে একটা কুকুরকে দেখাল জনসন। 'ওই দেখো, ওটার গলায় কলার। তাতে রেডিও আছে। কুকুরগুলো দূরে চলে গেলে অ্যান্টেনার সাহায্যে খুঁজে বের করি আমি। কুগার শিকারে কুকুর ব্যবহার করা এখানে বেআইনী নয়। সব গাইডেরাই তাই করে।'

'কুকুরের গলায় রেডিও লাগিয়ে রাখাটাও আপনার একটা ভাঁওতাবাজি,' জবাব দিল মুসা। 'কেউ চ্যালেঞ্জ করলে যাতে ফাঁকি দিতে পারেন।'

ভুরু নাচাল জনসন। 'কি করে বলছ এ কথা? কুগারটার গলায় কলার দেখেছ?'

কিশোর ছিল অনেক দূরে। কুগারের গলায় কলার ছিল কিনা দেখার কথা নয় তার। তাড়াহুড়ায় মুসাও লক্ষ করেনি। দ্বিধায় পড়ে গেল সে। জিজ্ঞেস করল, 'এত তাড়াতাড়ি তাহলে খুঁজে পেলেন কি করে কুগারটাকে? আপনারা যে বেরিয়েছেন,

এক ঘণ্টাও তো হয়নি।'

চওড়া কাঁধটায় ঝাঁকি দিল জনসন। 'স্রেফ ভাগ্য। ভাগ্যবলে তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করার বিরুদ্ধে নিশ্চয় কোন আইন তৈরি হয়নি, নাকি?'

জবাব খুঁজে বেড়াচ্ছে মুসা আর কিশোর, হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে চলে গেল কি যেন। ঠং করে ধাতব শব্দ হলো। লাফ দিয়ে পেছনে সরে গেল জনসন, যেন বোলতায় হুল ফুটিয়েছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মাটির দিকে। কালো পাতলা একটা তীর বিঁধে আছে তার রেডিওটায়।

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন লঙ হার্ট। হাতে ধনুক। আরেকটা তীর পরিয়ে ফেলেছেন তাতে। জনসনের দিকে উদ্যত। 'ভাগ্যবলের বিরুদ্ধে কোন আইন নেই, জনসন, ঠিক; কিন্তু কারও ব্যক্তিগত জায়গায় শিকার করার বিরুদ্ধে আছে। বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা গুরুতর অপরাধ।' জনসনের মুখের দিকে তাকিয়ে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করলেন লঙ হার্ট। 'কেন শুধু শুধু মিছে কথা বলছ, জনসন? ভাগ্যবলের ওপর নির্ভর করে শিকার যে তুমি করছ না, সেটা তুমিও জানো। তোমার এ সব শয়তানির গল্প অনেক দিন আগেই কানে এসেছে আমার। সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। তক্কে তক্কে ছিলাম হাতেনাতে ধরার জন্যে।'

কিশোরের দিকে একবার তাকিয়ে আবার জনসনের দিকে ঘুরে গেল তাঁর দৃষ্টি। 'বেশ কিছুদিন ধরে তোমাকে অনুসরণ করে বেড়াচ্ছি আমি, জনসন। পর পর তিনটে হান্টিং পার্টিকে নিয়ে শিকারে বেরিয়েছিলে তুমি, তিনটে কুগার খুন করেছ। দুটোর গলায় রেডিও কলার পরানো ছিল।'

'এতক্ষণে বুঝলাম!' বলে উঠল কিশোর, 'ডক্টর কুপারের ব্যাটারি নষ্ট ছিল না। কুগারগুলোকে মেরে রেডিও নষ্ট করে দেয়াতেই আর কোন সাড়াশব্দ পাননি তিনি। ধরে নিয়েছেন, ব্যাটারি খারাপ হয়ে যাওয়াতে রেডিওগুলো সিগন্যাল দিচ্ছে না।'

'শুধু শুধু ওকে দোষারোপ করছেন আপনারা,' জনসনের পক্ষে সাফাই গাইতে এগিয়ে এল একজন শিকারী। 'কুকুরগুলোর জন্যেই রেডিও ব্যবহার করেছে সে।'

'ঠিক,' সুর মেলাল অন্যজন। 'রাস্তার ধারে কুগারের পায়ের ছাপ দেখে পিছু নিয়েছিলাম আমরা। রেডিওর সাহায্যে নয়।'

হেসে উঠলেন লঙ হার্ট। 'সব শিয়ালের এক রা! ছাগল পেয়েছ আমাকে? মনে করেছ কিছু জানি না। ওই ছাপগুলো নকল ছাপ। জনসন করে রেখেছিল। ধরা পড়লে যাতে এ ধরনের কৈফিয়ত দিতে পারে, এখন যা দিচ্ছ। কাল ওর স্নোমোবাইলের চিহ্ন দেখে পিছু নিয়ে এসে লুকিয়ে থেকে ছাপ বসাতে দেখেছি ওকে। কুগারটার বাসা আগেই আবিষ্কার করে ফেলেছিল সে।'

কড়া গলায় বলল জনসন, 'তোমার এ সব প্রলাপ শোনার ধৈর্য আমার নেই! কুগার শিকারে আইনত বাধা দিতে পারবে না আমাকে।'

'কে তোমাকে আটকে রেখেছে?' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন লঙ হার্ট। 'যাও না।'

'চলো চলো,' জনসনকে তাগাদা দিল এক শিকারী। 'কুগারটার পায়ের ছাপ এখনও তাজা। পিছু নিলে আবার ওটাকে বের করে ফেলা যাবে।'

'চলো,' নড়ে উঠল জনসন।

'ধীরে, বন্ধু ধীরে,' ধনুক সহ তীরের মাথাটা নাচালেন লঙ হার্ট, 'আগেই বলেছি, কারও এলাকায় বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করাটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।'

'সেটা আমি মালিকের সঙ্গে বুঝব,' জেদ দেখিয়ে বলল জনসন। 'তুমি মালিক নও, তোমার সঙ্গে কথা নেই।'

হাসি ফুটল লঙ হার্টের মুখে। 'মালিকের সঙ্গে বুঝতে গেলে আরও বিপদে পড়বে। কি মনে হয়, মারিসা কুপার তোমাকে অনুমতি দেবে? এ জায়গাটা যে তার সম্পত্তি ভুলে গেছ? নাকি ভেবেছ, আমি সেটা জানি না?'

নীরব, পাথুরে দৃষ্টিতে লঙ হার্টের দিকে তাকিয়ে রইল জনসন। পারলে চোখের আগুনে তাঁকে ভস্ম করে ফেলে। আচমকা ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে গটগট করে হেঁটে গেল স্নোমোবাইলের কাছে। কুকুরগুলোকে ফিরে আসার জন্যে ডাক দিল। স্নোমোবাইল স্টার্ট দিয়ে রওনা হয়ে গেল। পেছনে চলল কুকুরগুলো। ধাপ্পাবাজিতে কাজ হবে না বুঝে স্নোমোবাইলে উঠে দুই শিকারীও চলে গেল তার পেছনে।

'দারুণ দেখালেন,' হেসে বলল মুসা।

ধনুক থেকে তীরটা খুলে নিয়ে ধনুকের এক মাথায় ঝোলানো ছোট একটা তূণীরে রেখে দিলেন লঙ হার্ট।

'জনসন কোন ভাবে মারিসা কুপারের রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আবিষ্কার করে ফেলেছে,' কিশোর বলল।

'এ ধরনের মানুষগুলোকে বুঝতে পারি না আমি,' লঙ হার্ট বললেন। 'গাইডের পেশায় সহজেই যেখানে সৎ থেকে সম্মানজনক কাজ করতে পারে, এরা সেখানে খালি ধান্ধাবাজি আর মিথ্যার মধ্যে যায়। গিয়ে গিয়ে ফাঁসে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল কিশোর। 'ডক্টর কুপার যেদিন গুলি খেলেন, সেদিন সে-জায়গায় আপনাকে দেখা গেছে, এ কথাটাও নিশ্চয় মিথ্যে বলেনি জনসন?'

জবাব দিলেন না লঙ হার্ট।

'একটু আগে আপনি বললেন,' আবার বলল কিশোর, 'গত তিন হপ্তা টেরি জনসনের পিছে লেগে থেকেছেন আপনি। তারমানে সেদিন সেই গিরিখাতে অবশ্যই গিয়েছেন আপনি।'

মাথা ঝাঁকালেন লঙ হার্ট। 'গিয়েছি।'

'তাহলে আমাদের সঙ্গে শহরে চলুন,' অনুরোধ করল কিশোর। 'শেরিফকে বলবেন।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে জবাব দিলেন লঙ হার্ট, 'আমি পরে যাব। এখন আমার অনেক কাজ। আমার এখানেই থাকতে হবে, এই পর্বতের আশেপাশে। তোমরাই গিয়ে শেরিফকে জানাও।'

'গুডবাই' বললেন না তিনি। স্রেফ ঘুরে হেঁটে চলে গেলেন।

ষোলো

শহরে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। খিদে পেয়েছে। ক্লান্তও খুব। তবু আগে শেরিফের সঙ্গে দেখা করাটা জরুরী মনে করল কিশোর। এল্‌ক্‌ স্প্রিঙ শহরের একটা মাত্র রাস্তার দুই ধারে সারি দিয়ে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট দোকানপাট আর রেস্টুরেন্ট। শেষ মাথায় একটা একতলা ইঁটের বাড়ি। দরজার ওপরে একটা মাত্র শব্দ লেখা: পুলিশ।

গাড়ি থেকে নামছে কিশোর আর মুসা, এই সময় দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন শেরিফ। 'তোমরা? এইমাত্র তোমাদের কথাই হচ্ছিল।'

'খারাপ না ভাল?' হেসে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

শেরিফও হাসলেন। 'ভাল ভাল, খুব ভাল তোমাদের সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা মারিসা কুপারের।'

উত্তেজনা দেখা দিল কিশোরের চেহারায়। 'জ্ঞান ফিরেছে নাকি তাঁর? আর কি কি বললেন? কে গুলি করেছে, দেখেছেন? তিনি ভাল আছেন এখন? আমরা গেলে দেখা করতে পারব?'

'আরে, ধীরে, ধীরে,' হাত তুললেন শেরিফ। 'একটা করে প্রশ্ন করো। হ্যাঁ, জ্ঞান ফিরেছিল। ভালমত কথা বলার অবস্থায় ছিল না।'

'কে গুলি করেছে?'

'তা বলেনি।' দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন শেরিফ। ভাবছেন কিছু। 'তোমাদের কাছে হয়তো বলতে পারে। কাল পর্যন্ত যদি থাকো শহরে, দেখা করতে পারবে।'

'অবশ্যই থাকব,' জবাব দিতে একটা মুহূর্ত দেরি করল না কিশোর।

পরদিন সকাল ন'টায় হাসপাতালে ডক্টর কুপারের সঙ্গে দেখা করতে গেল তিন গোয়েন্দা। রবিনের শরীর পুরোপুরি ঠিক হয়নি, তবু আজ আর তাকে শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে হোটেলে ফেলে আসা সম্ভব হয়নি। জোর করেই চলে এসেছে রবিন।

একটা 'নো পার্কিং' লেখা জায়গায় শেরিফের গাড়িটা দেখতে পেল কিশোর শঙ্কিত হলো সে। বোঝা যাচ্ছে, তাড়াহুড়া করে গাড়ি রেখে ভেতরে ঢুকেছেন তিনি। কিছু ঘটল নাকি!

লবিতে পাওয়া গেল তাঁকে। প্রায় ফিসফিস করে কথা বলছেন একজন ডাক্তার আর একজন নার্সের সঙ্গে।

তিন গোয়েন্দাকে দেখে এগিয়ে এলেন ওদের দিকে। 'মারিসার অবস্থা ভাল না।'

দুরুদুরু করে উঠল কিশোরের বুক। তার সন্দেহ ঠিক। 'কি হয়েছে?'

গোঁফ চুলকালেন শেরিফ। 'নিজে নিজে স্বাভাবিক শ্বাস নিতে পারছিল না বলে গুলিটা বের করার পর থেকে রেসপির্যাটর লাগিয়ে রাখা হয়েছিল।'

'এখন কি হয়েছে?' অধৈর্য হয়ে উঠল কিশোর।

'বলছি,' হ্যাটের কানায় ঠেলা দিয়ে খানিকটা পেছনে সরিয়ে দিলেন শেরিফ। গোঁফ চুলকালেন আবার। 'কাল রাতে যন্ত্রটায় কোন একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। নার্স যখন আবিষ্কার করল ব্যাপারটা, ঠিকমত শ্বাস নিতে না পেরে ততক্ষণে আবার "কোমা"র মধ্যে চলে গেছে মারিসা।'

'শেরিফের উচিত ছিল এখানে পাহারা রাখা,' হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বলল রবিন।

'আছেই তো মাত্র তাঁর দুজন ডেপুটি,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'আর যন্ত্রটাও আপনাআপনি নষ্ট হয়েছে কিনা, না কেউ শয়তানি করে রেখেছে ডক্টর কুপারকে খুন করার জন্যে, সেটাও শিওর হয়ে বলা যাচ্ছে না।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল রবিন। 'আপনাআপনি নষ্ট হয়েছে, এটা নিশ্চয় বিশ্বাস করো না তুমি, তাই না?'

দ্বিধা করল কিশোর। 'না, সত্যি করি না।'

'তারমানে কেউ নষ্ট করে দিয়েছে। কি করব তাহলে আমরা এখন?'

'আপাতত কিছুই না।' জ্যাকেটের কলার উঁচু করে দিল কিশোর, ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে বাঁচার জন্যে। গাড়ির দিকে হাঁটছে ওরা। 'শেরিফ যথেষ্ট বুদ্ধিমান লোক। আমাদের সাহায্য ছাড়াই এ পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন।'

'আমাদের তাহলে এখন কি কাজ? হোটেলে গিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারব না,' গাড়ির কাছে পৌঁছে একটানে দরজা খুলে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল মুসা।

'সেটা করতে পারলেই ভাল হত,' তার পাশে বসে বলল কিশোর। রবিন উঠল পেছনে।

জানালা দিয়ে পরিষ্কার আকাশের দিকে তাকাল কিশোর। বলল, 'তবে আবহাওয়াটা চমৎকার। গাড়ি চালানোরই দিন আজ।'

ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে জোরে এক মোচড় মারল মুসা। প্রতিবাদ জানাল ইঞ্জিন। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কিন্তু স্টার্ট নিল অবশেষে। স্টিয়ারিংটা দুই হাতে চেপে ধরে কিশোরকে জিজ্ঞেস করল সে, 'কোথায় যাব?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর, 'এল্‌ক্ স্প্রিঙ শহরটা ঘুরে দেখা যেতে পারে।'

'দেখতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না,' মুসা বলল।

রহস্যময় হাসি ফুটল কিশোরের ঠোঁটে। 'ভালই তো। ঝামেলা কম।'

আড়চোখে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'তোমার মনের ওই কম্পিউটারটার ছবি স্ক্রীনে আনো না দয়া করে।'

পেছনে তাকাল কিশোর। 'রবিন, নজর রাখো, এমন কোন বাড়ি চোখে পড়ে কিনা যেটাকে লাইব্রেরি বলে মনে হয়।'

ছোট পাবলিক লাইব্রেরিটা খুঁজে বের করতে মোটেও সময় লাগল না। ভেতরে হাসিখুশি একজন মোটাসোটা মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন চেক-আউট কাউন্টারের ওপাশে।

'কোন সাহায্য করতে পারি তোমাদের?' আন্তরিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

জায়গাটা নির্জন। আর একজন লোককেও চোখে পড়ল না কিশোরের। খুশিই হলো তাতে। সে যে উদ্দেশ্যে এসেছে সেটা করার সুবিধে হবে ওদের।

'সাহায্য তো অবশ্যই করতে পারেন,' হাসিমুখে জবাব দিল কিশোর। 'একটা জিনিস খুঁজতে এসেছি।'

'কি বই?'

'হিসটরিক্যাল ল্যান্ড-ইউজ প্যাটার্ন নিয়ে গবেষণা করছি আমরা,' কাউন্টারে কনুই রেখে সামনে ঝুঁকে যেন কত না গোপন কথা জানিয়ে দিচ্ছে এ রকম ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'ভাল গ্রেড না পেলে স্কলারশিপ হারাব।'

দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো মহিলাকে। 'কিন্তু কাউন্টির ল্যান্ড ম্যাপ ছাড়া তো আর কিছু নেই আমাদের কাছে।' ঘরের পেছন দিকে একটা টেবিলের কাছে ওদের নিয়ে গেলেন লাইব্রেরিয়ান। 'পঞ্চাশ বছরের পুরানো। ওগুলোতে কেবল তখনকার ভূমি-মালিকদের নাম আছে। কি কাজে ব্যবহৃত হত জায়গাগুলো, সে-সব কিছু লেখা নেই। দেখো, এতে কিছু পাও কিনা।'

হতাশ মনে হলো কিশোরকে। 'দেখি। পেলে তো ভালই।'

মনে মনে এতটা পুলকিত হয়েছে সে, নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ঠিক এ জিনিস খুঁজতেই এসেছিল সে। বিরাট ম্যাপটায় মূল্যবান সব তথ্য রয়েছে: মালিকের নাম, জায়গার সীমানা, বাড়ি-ঘরের অবস্থান, এমনকি গোলাঘর আর গ্যারেজগুলো কোথায় কোথায় ছিল, তা-ও দেখানো রয়েছে।

'কি খুঁজছ?' লাইব্রেরিয়ান তাঁর ডেস্কে ফিরে গেলে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ডক্টর কুপার আর লঙ হার্টের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যাপারে মিল।'

ম্যাপের ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল তিনজনে। মুসার কোন আগ্রহ নেই। সে শুধু তাকিয়ে আছে। যা দেখার দেখছে রবিন আর কিশোর।

'দুজনেই এখানে জমির মালিক ছিলেন,' অবশেষে ঘোষণা করার মত করে বলল কিশোর। 'প্রচুর জমি। যদি ম্যাপে কোন ভুল না থেকে থাকে।'

ভ্রূকুটি করল রবিন। 'সেটা জেনে লাভটা কি আমাদের?'

'ফ্র্যাঙ্ক হ্যান বলেছে,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর, 'নতুন হাইওয়ে হলে শহরের আয় বাড়বে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হবে। কেউ যদি--ধরা যাক তার নাম এক্স--খুব অল্প সময়ে এখানে কোটিপতি হয়ে যেতে চায়, তাহলে মহাসড়কটা হওয়ার আগেই খুব অল্প দামে প্রচুর জমি কিনে অথবা অন্য যে কোন ভাবেই হোক জমিয়ে রাখতে চাইবে। মহাসড়ক হয়ে গেলে লাফ দিয়ে বহুগুণ বেড়ে যাবে জমির দাম।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল রবিন, বুঝে গেছে। 'তাহলে ডক্টর কুপার আর লঙ হার্টই হবেন সেই এক্স লোকটার পথের কাঁটা।'

হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা। রবিন আর কিশোরের কথাবার্তা ঠিক বুঝতে পারছে না।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ঠিক। তাঁরা দুজনে যদি বেচতে রাজি না হন, তাহলে কি করবে এক্স?'
বিষণ্ন হাসি হাসল রবিন। 'পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে চাইবে। এমন করে কেস সাজাবে, যাতে মনে হয় লঙ হার্ট খুন করেছেন ডক্টর কুপারকে। একজন মরে যাবেন, দ্বিতীয়জন খুনের অপরাধে জেলে যাবেন। এক্সের পথ তখন খোলা, আর কোন বাধা রইল না। তখন নামমাত্র মূল্যে তাঁদের জমিগুলো কিনে নিতে পারবে।'
গম্ভীর হয়ে গেল কিশোর। 'তবে সবই আমার অনুমান। ডক্টর কুপার রয়েছেন বেহুঁশ হয়ে, লঙ হার্ট পালিয়ে বেড়াচ্ছেন–তাঁদের সঙ্গে কথা বলার অবস্থা নেই এখন, শিওর হতে পারছি না, সত্যি সত্যি কেউ কিনে নিতে আগ্রহী কিনা। জানি না, কিনতে যদি চায় কেউ, সেই লোকটা কে?' দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল কিশোর। 'কি মনে হয়? কে?'
'আমি কি জানি!' হাত উল্টে জবাব দিল মুসা।
মাথা নাড়ল রবিন, 'জানি না।'
'পরিস্থিতি বিবেচনা করে,' কিশোর বলল, 'যেটুকু অনুমান করতে পারা যায়–তাতে একজন লোকের নামই মনে আসে। পথের কাঁটা দূর হয়ে গেলে কার লাভ? কার জমির সীমানা শেষ হয়েছে ডক্টর কুপার আর লঙ হার্টের সীমানায় গিয়ে?'
রবিন তাকিয়ে আছে ম্যাপের দিকে। মুসা কিশোরের মুখের দিকে। একসঙ্গে জবাব দিল দুজনে, 'জেরাল্ড থার্সটন!'

সতেরো

'শেরিফকে জানালে হত,' গাড়ি চালাতে চালাতে বলল মুসা।
'পুরোটাই আমার অনুমান,' সামনের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল কিশোর। 'কোন প্রমাণ নেই হাতে। কাজেই এখুনি শেরিফকে জানিয়ে লাভ হবে না।'
মুসার পাশে বসেছে সে। রবিনকে রেখে এসেছে লাইব্রেরিতে। থার্সটনের র‍্যাঞ্চে চলেছে ওরা। সেদিনকার মত কোন অঘটন যদি ঘটে যায় আজও, অসুস্থ শরীর নিয়ে সামাল দিতে পারবে না রবিন, সে-জন্যেই রেখে আসা হয়েছে তাকে। একমাত্র লাইব্রেরিতে থাকলেই একা একা বিরক্ত লাগবে না রবিনের। আরামসে বই পড়ে কাটিয়ে দিতে পারবে।
'থার্সটনের মুখ থেকে কথা আদায় করবে কি ভাবে?' র‍্যাঞ্চের মেন গেটের কাছে এসে গাড়ি থামাল মুসা।
কোলের ওপর ফেলে রাখা বড় ম্যানিলা খামটায় চাপড় দিল কিশোর। বড় ম্যাপটার ফটোকপি করে নিয়ে এসেছে। এ জন্যে নগদ দুটো ডলার খরচ করতে হয়েছে তাকে, আর এতবড় জিনিসকে ফটোকপি করার জন্যে প্রচুর কসরত এবং কায়দা-কৌশল। জানালার কাঁচ নামিয়ে কাউবয়-গেটরক্ষককে বিমল হাসি উপহার দিল সে। খামটা দেখিয়ে বলল, 'মিস্টার থার্সটনের জন্যে কিছু অতি জরুরী কাগজপত্র নিয়ে এসেছি।'

হাসিতে গলল না প্রহরী। চোখের পাতা সরু করে ফেলল। খামটার দিকে তাকিয়ে নীরস স্বরে প্রশ্ন করল, 'কি কাগজ?'

'আমি কি করে জানব?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর। 'আমাদের পারিশ্রমিক দেয়া হয়েছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে। খামের গায়ে "জরুরী" লেখা আছে দেখেছি, ব্যস।' লোকটার প্রায় নাকের নিচে খামটা ঠেকিয়ে দিল সে। 'এই যে, দেখুন।'

ঝটকা দিয়ে নাক সরিয়ে নিল প্রহরী। লাল কালিতে হাতে লেখা শব্দটার দিকে তাকিয়ে রইল। 'অফিশিয়াল বলে তো মনে হচ্ছে না,' সন্দেহ যাচ্ছে না তার।

'কেন, জরুরী শব্দটা দেখেও কিছু বুঝতে পারছেন না? এত তাড়াহুড়োর মধ্যে আর কত অফিশিয়াল বানাবে?'

'বেশ,' হাত বাড়াল প্রহরী, 'দাও। আমি পৌঁছে দেব।'

'উঁহু,' খামটা সরিয়ে নিল কিশোর। 'হাতে হাতে দিতে বলে দেয়া হয়েছে আমাকে।'

'কিন্তু নির্দেশ ছাড়া আমি তোমাদের যেতে দিতে পারি না।'

হাসল কিশোর। 'ঠিক আছে, অনুমতি নিয়েই দিন। আমরা অপেক্ষা করছি। দেরি করানোর জন্যে হয়তো পুরস্কারও দিয়ে বসতে পারেন আপনাকে মিস্টার থার্সটন। যান, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

বিপদে পড়ে গেল প্রহরী। ছেড়ে দেবে, না আটকে রাখবে—রাখলে আবার কোন বিপদ হয়, বুঝতে পারছে না সে। বিড়বিড় করতে লাগল, 'আমার কি? গেট পাহারা দিতে বলা হয়েছে আমাকে, অফিশিয়াল কাগজপত্র নয়।' দ্বিধা করতে করতে গিয়ে ঢুকল ছোট গার্ড-হাউসটায়। কয়েক সেকেন্ড পরই বিরাট লোহার গেটটা খুলে গেল। নিশ্চয় সুইচ-টুইচ টিপেছে সে, ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে খোলে গেট।

মূল বাড়িটার সামনে এনে গাড়ি রাখল মুসা। সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠছে দুজনে, হুড়মুড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন থার্সটন। 'কি যে করছে সব...' রাগত স্বরে বিড়বিড় করতে গিয়ে দুই গোয়েন্দাকে দেখে থেমে গেলেন। 'আবার এসেছ? কি চাও?'

'কেবল আপনার কয়েকটা মিনিট সময়,' নিরীহ ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর। 'আর কিছু না।'

সিঁড়ির মাথার কাছে এসে দাঁড়ালেন থার্সটন। কঠোর দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বলো। আমি শুনছি।'

'এখানে দাঁড়িয়ে?' শীতে কেঁপে উঠল কিশোর। কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে রেখেছে।

মাথা ঝাঁকালেন থার্সটন। 'হ্যাঁ।' গায়ে কোট নেই তাঁর। কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডা যেন টেরই পাচ্ছেন না।

'আপনার উত্তেজনার কারণ বোধহয় অনুমান করতে পারছি,' কিশোর বলল। 'এমন জিনিস খুঁজে বের করেছি আমরা, আমার মনে হয়েছিল জানতে আগ্রহী হবেন আপনি।'

মুহূর্তে সজাগ হয়ে গেলেন থার্সটন। কিন্তু কিছু বললেন না।

ভারী দম নিল কিশোর। পা ঠুকে শীত তাড়ানোর চেষ্টা করল। 'আমাদের

বিশ্বাস, ডক্টর কুপারকে গুলি করেননি লণ্ড হার্ট। তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে।'

কিশোরের হাতের খামটার দিকে নজর গেল থার্সটনের। 'কি আছে ওতে? তথ্য-প্রমাণ?'

'তা আছে,' জবাব দিল কিশোর। 'দুজনকেই কিভাবে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া যায়, সে-সব তথ্য।'

'হুঁ।' ভুরু কুঁচকে ফেললেন থার্সটন। 'কে রাস্তা থেকে সরাতে চাচ্ছে?'

'সেটা আপনিই ভাল জানেন, তাই না?' থার্সটনের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল কিশোর। 'ওই দুজনের জায়গা দখল করে নিতে পারলে মহাসড়ক হওয়ার পর নতুন আসা মানুষের কাছে বিক্রি করে বিরাট বড়লোক হয়ে যাবেন। এখনকার চেয়ে বহুগুণ ধনী।'

ভোঁতা হাসি ফুটল থার্সটনের ঠোঁটে। 'ওদের সম্পত্তিতে এক বিন্দু আগ্রহ নেই আমার। নতুনদের প্রতি আগ্রহ আরও কম। বরং আসার ব্যাপারে আপত্তি আছে। রাস্তা যাতে না হয়, সে-জন্যে বহুত দেন-দরবার আর টাকা খরচ করেছি।'

'কেন?' অবাক হলো কিশোর। 'এলাকার উন্নতি আপনি চান না?'

'না, চাই না,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন থার্সটন। 'আমি করি ক্যাটল্ র‍্যাঞ্চের ব্যবসা। খুব ভাল ব্যবসা এটা। জায়গার দাম বেড়ে গেলে, ট্যাক্সও বেড়ে যাবে প্রচুর। ট্যাক্স যা আসতে থাকবে তাতে লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে ফেলবে আমার। র‍্যাঞ্চের ব্যবসায় লাল বাতি জ্বলবে। হয় নতুনদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হোটেলের ব্যবসা শুরু করতে হবে আমাকেও, নয়তো পাততাড়ি গুটাতে হবে। বেঁচে থাকতে আমি সেটা চাইব না। হোটেলের ব্যবসাটাও পচা ব্যবসা মনে হয় আমার কাছে।'

কব্জিতে বাঁধা দামী সোনার ঘড়িটার দিকে তাকালেন তিনি। 'নাও, তোমাদের কয়েক মিনিট শেষ হয়েছে। ভাল চাও তো কেটে পড়ো। নইলে এবার আর ছাড়াছাড়ি নেই। বিনা অনুমতিতে ঢোকার দায়ে অ্যারেস্ট করাবই।'

'ধুর, খামোকাই এলাম!' বড় গেটটা পার হওয়ার সময় বিরক্ত কণ্ঠে বলল মুসা। 'কোন লাভ হলো না।' রাগ দেখানোর জন্যে আচমকা এক মোচড় মারল স্টিয়ারিঙে। লাফ দিয়ে রাস্তায় উঠে এল গাড়ি।

জানালা দিয়ে গরুর পালের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খড়ের গাদাগুলোকে দূর থেকে লাগছে সাদা তুষারের মধ্যে বিন্দুর মত। 'লাভ হয়নি তা নয়,' জবাব দিল সে। 'দেখলাম, মুখ ফসকে কিছু বলে ফেলেন কিনা।'

'গভীর জলের মাছ,' জবাব দিল মুসা। 'অত সহজে কি আর ফসকায়

জানালার পাশ দিয়ে সরে গেল একটা সাইনপোস্ট। গরুগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ঝটকা দিয়ে সোজা হয়ে বসল কিশোর। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'থামাও থামাও, গাড়ি থামাও!'

ফিরে তাকাল মুসা, 'মানে?'

'আহ্, থামাও না! ব্যাক করো

কিছুই না বুঝে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল মুসা। পিছাতে শুরু করল গাড়ি।

সাইনপোস্টটার কাছে এসে আবার থামতে বলল কিশোর। আঙুল তুলে সাইনটা

দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বলো তো, গণ্ডগোলটা কোথায়?'

'ওয়েলকাম টু গ্যানিসন ন্যাশনাল ফরেস্ট,' জোরে জোরে পড়ল মুসা। 'কই, গোলমাল তো দেখছি না। বানান-টানান সব ঠিক আছে।'

কাঁধের ওপর দিয়ে বুড়ো আঙুল তুলে দেখাল, 'থার্সটনের র‍্যাঞ্চ আর ন্যাশনাল ফরেস্টের সীমারেখা এটা।'

শূন্য দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'তাতেই বা গোলমালটা কি হলো?'

সামনের পাহাড়ের ঢালে চরতে থাকা গরুগুলো দেখাল কিশোর। 'ন্যাশনাল ফরেস্টের সীমানার মধ্যে চরছে ওগুলো। সেই ফরেস্ট, যেটাকে বুনো জানোয়ারের অভয়ারণ্য বানানোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছেন ডক্টর কুপার।'

কিশোরের কথার মানে তারপরেও বুঝতে পারল না মুসা। 'তাতেই বা কি? গরুরা তো আর পড়তে জানে না যে সাইনবোর্ড দেখে আপন-পর বিবেচনা করবে।'

গরুগুলোর দিক থেকে চোখ ফেরাচ্ছে না কিশোর।

তাকে কথা বলতে না দেখে আবার বলল মুসা, 'সরকারের গার্ডরা কি করছে? সরাচ্ছে না কেন গরুগুলোকে?'

'সরাবে না, যদি লীজ দেয়ার কথা থাকে,' অবশেষে বলল কিশোর।

দুই হাত উল্টে হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করল মুসা। 'মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে আমার। দোহাই তোমার, খোলসা করবে?'

'ন্যাশনাল ফরেস্টের কিছু অংশ লীজ দেয়া সম্ভব,' বুঝিয়ে বলল কিশোর। 'সরকারের দখলে থাকে না সেটা তখন আর। তেল আর কাঠ কোম্পানিগুলো হরদম এ ভাবে লীজ নেয়।'

'তারমানে ক্যাটল র‍্যাঞ্চাররাও নিতে পারে,' মুসা বলল। 'ঘাসে ভরা জমিগুলো লীজ নিতে পারেন থার্সটন; তারও লাভ—কম দামে গরুর খাবার জোগাড় হয়ে গেল, সরকারেরও লাভ—পতিত জায়গা থেকে নগদ কিছু টাকা এল।'

'কিন্তু সেই লাভটা থেকে থার্সটনকে বঞ্চিত করতে চাইছেন ডক্টর কুপার। অন্য পরিকল্পনা নিয়ে হাজির হয়েছেন তিনি,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'বুঝলাম। গরুকে বন্য প্রাণী ধরা হবে না। ওয়াইল্ড লাইফ রিজর্টে জায়গা হবে না ওদের। সরকার ডক্টর কুপারের প্ল্যানকে প্রাধান্য দিলে থার্সটনের মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে।'

'আর যদি লঙ হার্টের লোকেরা পেয়ে যায়,' কিশোর বলল, 'তাহলেও থার্সটনের ক্ষতি। তবে ডক্টর কুপার আর লঙ হার্টকে সরাতে পারলে আপাতত তাঁর সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে।'

'হুঁ! কিন্তু ডক্টর কুপার যখন গুলি খেয়েছেন, থার্সটন তখন শহরে ছিলেন না,' মনে করিয়ে দিল মুসা।

'টাকা খাইয়ে অন্যকে দিয়ে খুন করানোর চেষ্টা করে থাকতে পারেন। তবে সেটা প্রমাণ করা কঠিন।' ড্যাশবোর্ডে টোকা দিয়ে টাট্টু বাজানো শুরু করল কিশোর। 'খুনীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা জানা গেলে সুবিধে হত,' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল সে।

'থার্সটনের ওপর নজর রাখা দরকার। জানা দরকার কাকে দিয়ে কাজটা করাতে চেয়েছেন তিনি।'

'খাইছে!' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'সেটা কি ভাবে সম্ভব? আবার ঢুকতে চাও থার্সটনের বাড়িতে?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'থার্সটনের র‍্যাঞ্চের মেইন গেট থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে একটা সাইড রোড আছে। ওখানে থাকলে কে আসছে, কে যাচ্ছে, সব দেখতে পাব আমরা।'

'দেখো, না খেয়ে আমি আর কোন কিছু করতে পারব না,' প্রবল আপত্তি জানাল মুসা। 'আগে চলো শহরে গিয়ে কিছু খেয়ে নিই, তারপর এসে নাহয় বসে থাকা যাবে। ততক্ষণে অন্ধকারও হয়ে যাবে। চোখে পড়ার ভয় থাকবে না আমাদের। হেডলাইট নিভিয়ে বসে থাকব।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'উঁহু। যেতে-আসতে অনেক সময়। ততক্ষণে মিস হয়ে যেতে পারে।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'অ! তা কতক্ষণ পাহারা দিতে চাও?'

কাঁধ ঝাঁকাল কিশোর। 'দেখব মাঝরাত পর্যন্ত। তারপরও যদি কিছু না ঘটে, কি আর করা, ফেরতই যাব।'

আঠারো

তবে মাঝরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো না ওদের। দাঁত বের কবা পর্বত-চূড়ার ওপাশে সবে অস্ত যেতে বসেছে সূর্য, এমন সময় খুলে গেল গেট। একটা গাড়ি বেরিয়ে এল। ড্রাইভারের চেহারা দেখার মত তখনও যথেষ্ট আলো আছে আকাশে। থার্সটন যাচ্ছেন।

আস্তে করে মুসার গায়ে কনুই দিয়ে গুঁতো দিল কিশোর। 'স্টার্ট দাও। যদি কোন রেস্টুরেন্টে ঢোকেন, আমরাও ঢুকব। খাবারের অর্ডার দেব।'

'যদি আমাদের খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই বেরিয়ে যান?' মুসার প্রশ্ন।

'তাহলে আর কি?' হাসল কিশোর। 'বাকি খাবার রেখেই উঠে পড়তে হবে তোমাকে।'

'পকেটে নিয়ে নিতে পারি। তাতে নিশ্চয় কোন অসুবিধে নেই?'

'তা নেই, যদি ঝোল না থাকে।'

খানিক দূর যাওয়ার পর বলে উঠল কিশোর, 'কিন্তু এল্‌ক্‌ স্প্রিঙ তো ওদিকে নয়। উল্টো দিকে যাচ্ছেন। পর্বতের দিকের রাস্তা ধরেছেন। খুব ভাল।' খুশি হয়ে উঠল সে।

'কেন, ভালটা কি হলো?' গাড়ি চালাতে চালাতে ভ্রূকুটি করল মুসা।

'ভালটা হলো এই,' কিশোর বলল, 'আমার বিশ্বাস সেই লোকটার সঙ্গেই দেখা করতে চলেছেন থার্সটন—যাকে টাকা দিয়েছেন ডক্টর কুপারকে গুলি, আর লঙ হার্টকে ফাঁসানোর জন্যে। সবার সামনে তার সঙ্গে দেখা করতে চান না তিনি। তাই গোপন

জায়গা বেছে নিয়েছেন।'

হেডলাইট জ্বালতে যাচ্ছিল মুসা, তাড়াতাড়ি বাধা দিল কিশোর। উঁহু, দেখে ফেলবেন তো! আমরা পিছু নিয়েছি বুঝলেই যেখানে যাচ্ছিলেন সেখানে আর যাবেন না।'

শুরুর দিকে রাস্তাটা ভালই। তারপর শুরু হলো মারাত্মক খাড়াই, তীক্ষ্ণ বাঁক, রাস্তার পাশে গভীর খাত–আলোর মধ্যে চালানোও বিপজ্জনক, আর অন্ধকারে তো আত্মহত্যার সামিল। মনে মনে খোদাকে ডাকতে ডাকতে চলল মুসা। কোনভাবে যদি বরফের মধ্যে চাকা পিছলে যায়, সামনের চাকা সরে যায় খাতের পাশে···ভাবতে চাইল না আর। সামনের হেডলাইটের আলো লক্ষ্য করে চালাতে থাকল। মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ বাঁকের ওপাশে যখন পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যায় আলো, গভীর অন্ধকারে ঢেকে যায়, তখন বাধ্য হয়ে হেডলাইট জ্বেলে দেখে নিতে হয় সামনের রাস্তা। আলো জ্বালানোটাও মস্ত ঝুঁকি। দেখে ফেলতে পারেন থার্সটন। এত কষ্ট তাহলে নিরর্থক হবে।

কিশোরের দৃষ্টি সামনের দিকে স্থির। আরও খাড়া হয়ে গেছে রাস্তা। বাঁক নিয়ে অন্যপাশে চলে গেছে থার্সটনের গাড়ি। কিন্তু ত' পরেও আলো দেখা যাচ্ছে। ক্রমশ উঠে যাচ্ছে আরও ওপরের দিকে।

আরেকটা তীক্ষ্ণ মোড়ের কাছে চলে গেছে গাড়িটা। এতক্ষণ পেরিয়ে আসা অন্য মোড়গুলোর সঙ্গে এটার তফাৎ আছে। ঠেলে বেরোনো চওড়া একটা কাঁধ রয়েছে এটার, কাঁধের কিনারে কাঠের রেলিঙ। পাহাড়ের একটা তাকের মত শিরা ওটা; তাতে বেঞ্চও বসানো রয়েছে। নিশ্চয় ওখানে বসে পর্বতের দৃশ্য দেখার জন্যেই বানানো হয়েছে।

'মনে হয় এসে গেছি,' নিচুস্বরে বলল কিশোর।

গাড়ি থামিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল মুসা।

থার্সটনের গাড়ির হেডলাইটের আলোয় বাঁকের কাঁধের ওপরে আরেকটা পুরানো নীল পিকআপ ট্রাক দেখা গেল। ওটার কাছে গিয়ে গাড়ি রাখলেন থার্সটন। মনোকিউলার বের করে চোখে লাগাল কিশোর। ট্রাক থেকে বেরিয়ে এল একজন মোটাসোটা মানুষ। লাল দাড়িওয়ালা টেরি জনসনকে দেখে অবাক হলো না কিশোর। এ রকমই কাউকে আশা করছিল সে।

প্যাসেঞ্জার-সাইডের দরজা খুলে দিলেন থার্সটন। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে উঠে বসল জনসন।

'হচ্ছেটা কি?' মুসার প্রশ্ন। 'কি করছে ওরা?'

'গাড়ির ভেতরটা দেখা যাচ্ছে না,' কিশোর বলল। 'অন্ধকার। কোথাও যাবে না, বোঝা যাচ্ছে। তারমানে জরুরী আলোচনা করছে দুজনে।'

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল মুসা। 'তারমানে আরেকটা শিকারের পরিকল্পনা করছে দুজনে। সেটা মানুষ শিকারও হতে পারে।'

'আমরা ওদের শিকার হতে না চাইলে এখুনি কেটে পড়া উচিত।'

ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল মুসা। গাড়ি ঘোরানোর জায়গা নেই। স্টার্ট দেয়াটাও এখন ঝুঁকির ব্যাপার। থার্সটন আর জনসন যদি শুনে ফেলে, বিপদ হয়ে যাবে।

একটাই উপায়। ভারী দম নিয়ে ইমারজেন্সি ব্রেক ছেড়ে দিল সে। নিঃশব্দে ধীরে ধীরে পেছনে নামতে শুরু করল গাড়ি। চাঁদের মুখ মেঘে ঢাকা ছিল এতক্ষণ, সেটা সরে যাওয়াতে আলো ছাড়াই পেছনের বাঁকটা অস্পষ্ট ভাবে চোখে পড়ছে। বাঁকের কাছে এসে ব্রেক কষল সে। চাবিতে মোচড় দিল। স্তব্ধ নীরবতার মাঝে শব্দটা যেন বোমা ফাটাল কানে। সরু জায়গাতে যত দ্রুত সম্ভব গাড়ি ঘুরিয়ে ফেলল। তিরিশ সেকেন্ড একটানা ছোটার পর নিজের বুকে হৃৎপিণ্ড লাফানোর শব্দ শোনার অবকাশ পেল।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে থেকে কিশোর বলল, 'কোন ধরনের সাইড রোড দেখলেই ঢুকে পড়বে।'

'ওই যে, সামনেই মনে হয় আছে একটা,' কিশোরের মনে কি আছে, বুঝতে পারছে মুসা। সরু, অন্ধকার একটা গলিপথ দেখে গতি কমাল সে। পিছিয়ে এসে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল তার মধ্যে। বিশ ফুট মত এগিয়ে গিয়ে বন্ধ করে দিল ইঞ্জিন। আলো নিভিয়ে লুকিয়ে থেকে অপেক্ষা করতে লাগল।

পনেরো মিনিট পর চলে গেল থার্স্টনের গাড়ি।

স্টার্ট দিতে গেল মুসা। ওর বাহুতে হাত রাখল কিশোর। 'দাঁড়াও। আরও দেখি।'

পাঁচ মিনিট পর তীব্র গতিতে চলে গেল নীল পিকআপটা।

মৃদু শিস দিয়ে উঠল মুসা। 'পঞ্চাশের কম না। এমন রাস্তায় এ গতিতে চালানোর মানে কোথাও যাবার তাড়া আছে তার।'

'চলো, কোথায় যায় দেখি,' কিশোর বলল।

গাড়ি পিছিয়ে এনে পিকআপের পিছু নিল মুসা। ভয়ানক ঝুঁকি নিচ্ছে। সামনের গাড়িটা পঞ্চাশ মাইল গতিতে ছুটছে, ওটাকে ধরার জন্যে তাকে আরও বেশি গতিতে ছোটাতে হচ্ছে। আলগা বরফের সামান্য একটা টুকরোও যদি চাকার নিচে পড়ে, উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলবে হাজার ফুট গভীর অন্ধকার খাদে। এত চিন্তা করলে এ ভাবে চালাতে পারবে না। মগজটাকে শূন্য করে দিয়ে পিছু লেগে রইল ওটার। স্টিয়ারিঙ হুইলে যেন আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে তার হাত দুটো। পা দুটো যন্ত্রের মত ওঠা-নামা করছে ব্রেক পেডাল আর গ্যাস পেডালের ওপর। বাঁক এলে ব্রেক কষতে হচ্ছে, পেরিয়ে এলেই আবার গতি বাড়ানো।

কিশোরের চোখ পিকআপটার ওপর। বাঁক পেরোনোর সময় তুষার আর খোয়া ছিটাল ওটার পেছনের চাকা। ওদের খসানোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে মনে হচ্ছে।

স্পীডোমিটারের দিকে তাকাল সে। ষাটের ঘর ছুঁই ছুঁই করছে। সন্দেহ হলো তার। 'উঁহু, আমাদের খসানোর জন্যেও এত গতিবেগে চালানোর রিস্ক নেবে না। তারমানে বিপদে পড়েছে। গাড়িটাকে কন্ট্রোল করতে পারছে না সে।'

'তারমানে আমাদের সাহায্য লাগবে ওর,' দাঁতে দাঁত চেপে গ্যাস পেডালে চাপ আরও বাড়ানো শুরু করল মুসা। 'সামনে চলে যেতে হবে, যাতে ওর সামনের বাম্পার আমাদেরটার পেছনে ঠেকে যায়। আমি ব্রেক কষলে তখন ওর গাড়িটাও দাঁড়িয়ে যাবে।'

পরের মোড়টায় এসে ব্রেক পেডালে পা স্পর্শ করল না মুসার। ভয়ঙ্কর গতিতে

মোড় ঘোরানো শুরু করল। আর্তনাদ করে উঠল চাকা। মাছের লেজের মত এপাশ ওপাশ দোল খেতে শুরু করল পেছনের চাকা। কোনমতে রাস্তার ওপর গাড়িটাকে টিকিয়ে রাখতে পারল সে। গতিও বাড়ছে ক্রমশ, পিকআপের চেয়ে বেশি। তবে অগ্রগতি খুব সামান্য। গ্যাস পেডালে পায়ের চাপ আরও বাড়িয়ে দিল।

সামনে কিছুদূর একেবারে সোজা এগিয়েছে রাস্তা। সুযোগটার সদ্ব্যবহার করল মুসা। চলে এল পিকআপের পেছনে। লাইসেন্স প্লেটের নম্বর পড়তে পারছে। আচমকা পাশে কেটে পুরো চেপে ধরল গ্যাস পেডাল, এরচেয়ে আর বাড়ানোর উপায় নেই।

গতি উঠে গেল সত্তরে। তারপরেও দেখা গেল, পিকআপ আর ওদের মাঝের অগ্রগতি বড় ধীর। বাঁকা কালো তীর আঁকা একটা হলুদ সাইনবোর্ড বিদ্যুৎ ঝলকের মত চলে গেল পাশ দিয়ে। সামনে তীক্ষ্ণ বাঁক। পিকআপের পাশ কাটানোর সময় জনসনের আতঙ্কিত চেহারা দেখতে পেল কিশোর।

পিকআপের সামনে এসেই ব্রেক কষল মুসা। বাঁকের কাছে পৌঁছানোর আগেই ঠেকাতে হবে। এই গতিতে বিপদ এড়িয়ে ওই বাঁক পেরোতে পারবে না কোন গাড়ি।

এক ব্রেক দিয়ে দুটো গাড়িকে ঠেকাতে গিয়ে মরিয়া হয়ে যেন আর্তনাদ করে উঠল চাকা। পিকআপের সামনের বাম্পার এসে আঘাত হানল সিডানের পেছনের বাম্পারে। এত জোরে পেছনে ঝটকা খেল কিশোরের মাথা, মনে হলো ঘাড় ভেঙে যাবে। দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে হেডলাইটের আলোয় আলোকিত সামনের রাস্তায়।

একপাশে পাহাড়ের দেয়াল। রাস্তায় বরফের পাতলা আস্তর কুৎসিত ভাবে চকচক করছে হেডলাইটের হলুদ আলোয়। তার ওপাশে কিছুই নেই। শুধুই শূন্যতা। খাদের কালো অন্ধকার যেন হাঁ করে রয়েছে গিলে খাবার জন্যে।

আর্মরেস্টে চেপে বসেছে কিশোরের আঙুল। পেছন থেকে ঠেলছে ভারী ট্রাকটা। নিয়ে যাচ্ছে খাদের কিনারে।

'পারবে না!' চিৎকার করে মুসাকে বলল সে। 'খাদে পড়ে যাচ্ছি আমরা!'

উনিশ

ধাতব গোঙানি। ধোঁয়া উঠছে রবারের। ক্রমেই গাড়িটাকে খাদের আরও কিনারে নিয়ে যাচ্ছে ট্রাক। গায়ের শক্তি দিয়ে ব্রেক পেডাল চেপে ধরেছে মুসা। কিন্তু কোন ভাবেই পদার্থবিদ্যার সূত্রকে ফাঁকি দিতে পারছে না। ট্রাকটার ওজন অনেক বেশি। অতিরিক্ত ভরবেগ। সামনের অপেক্ষাকৃত কম ওজনের গাড়িটাকে ঠেলে ফেলে দেবে। ঠেকাতে হলে জলদি কোন উপায় বের করতে হবে।

হ্যাঁচকা টানে যতটা পারল স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিল রাস্তার দিকে। বড় করে ঢোক গিলল ব্রেক থেকে পা তুলে এনে ঠেসে ধরল গ্যাস পেডাল। লাফ দিয়ে আগে বাড়ল গাড়িটা। ট্রাকের ঠেলা থেকে মুক্ত করে নিল নিজেকে। ঘুরে গেল বডির পেছনের অংশ। বরফে পিছলে যাচ্ছে পেছনের চাকা। সামনের চাকা কামড় বসাল

বরফের মধ্যে। ঘুরতে শুরু করেছে গাড়ি। গাড়ির নাক সরে যাচ্ছে খাদের অন্ধকার থেকে।

ফিরে তাকাল কিশোর। মরিয়া হয়ে ওদের অনুসরণের চেষ্টা করছে পিকআপটা। নাক ঘুরে গেল অর্ধেকটা। সোজা না এগিয়ে পাশ থেকে পিছলে সরে যাচ্ছে খাদের দিকে। চলে গেল একেবারে কিনারে। একটা সেকেন্ড ঝুলে রইল। তারপর হারিয়ে গেল কালো অন্ধকারের মধ্যে।

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল মুসা। প্রায় একসঙ্গে লাফিয়ে নেমে পড়ল দুজনে। দৌড়ে এল ট্রাকটা যেখান থেকে পড়ে গেছে সেখানে। গভীর অন্ধকারে খুব বেশি কিছু দেখার আশা করল না কিশোর। তবু ষাট ফুট নিচে হেডলাইটের আলো চমকে দিল ওকে। তাকের মত বেরিয়ে থাকা একটা শৈলশিরা থেকে দুটো পাইন গাছ বেরিয়ে আছে। একপাশে পাথরের দেয়াল আর অন্য পাশে দুটো গাছের মাঝখানে আটকে রয়েছে ট্রাকটা।

'শুনছেন?' চিৎকার করে ডাকল কিশোর। 'শুনতে পাচ্ছেন?'

সাড়া এল না। কোন রকম নড়াচড়াও নেই।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'গাড়িতে দড়ি আছে না?'

'আছে। তবে ওখান পর্যন্ত পৌঁছবে কিনা জানি না,' জবাব দিল মুসা। দাঁড়াল না আর। দড়ি নিয়ে এল। সেই সঙ্গে গাড়িটাও।

দড়ির এক প্রান্ত গাড়ির সামনের বাম্পারে বেঁধে ফেলল সে। ততক্ষণে আরেক প্রান্ত নিজের বুকে পেঁচিয়ে ফেলেছে কিশোর।

দুজনেই তৈরি হলো। খাদের কিনার বেয়ে নামতে শুরু করল কিশোর। দড়ি ধরে একটু একটু করে ছাড়তে লাগল মুসা।

বড় বড় পাথর বেরিয়ে আছে পাহাড়ের গা থেকে। ছোট ছোট আলগা নুড়ি চাপ লেগে খসে পড়ছে নিচে। কোন কোনটা ট্রাকের ছাতে পড়ে ঠং-ঠং শব্দ তুলছে। ট্রাকের পেছনে মাল রাখার খোলা জায়গাটা কিশোরের লক্ষ্য। গাছ দুটো মড়মড় শব্দ তুলছে। নড়ে উঠছে খানিক পর পরই। সেই সঙ্গে দুলে উঠছে ট্রাকটাও।

ট্রাকের ওপর নামল কিশোর। গাড়ির ভেতর জনসনকে দেখতে পাচ্ছে। স্টিয়ারিং হুইলে কপাল ঠেকানো। মারা গেল নাকি? না বেহুঁশ? ক্রিকেট বলের সমান একটা পাথর খসিয়ে নিয়ে ঠুকতে শুরু করল পেছনের জানালার কাঁচে। হাতে দস্তানা পরা আছে। ফ্রেমে আটকে থাকা ভাঙা কাঁচগুলো সরাতে গিয়ে তাই আঙুল কাটা গেল না।

কাত হয়ে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে জনসনের কোটের কাঁধ চেপে ধরল। নড়াচড়ায় অদ্ভুত শব্দ করে প্রায় জীবন্ত প্রাণীর মত গুঙিয়ে উঠল ট্রাকটা। নাক নিচু করে নেমে গেল বেশ অনেকখানি। টেনেটুনে অনেক কষ্টে অজ্ঞান দেহটাকে বের করে আনল সে। আরও খানিকটা নেমে গেল ট্রাক।

'কিশোর, কোন সমস্যা হচ্ছে?' ওপর থেকে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'না, এখনও হচ্ছে না!' জবাব দিল কিশোর। 'তবে যে কোন মুহূর্তে উল্টে পড়ে যাবে ট্রাকটা। দুজনকে টেনে তুলতে হবে তোমাকে। বাপরে বাপ, কি ভারী

লোকটা! দুশো পঞ্চাশের কম হবে না।'

'দাও, বেঁধে দাও। কোন সমস্যা নেই,' হাসি হাসি গলায় জবাব দিল মুসা। 'দু'হাজার পাউন্ড ওজনের একজন বন্ধু আছে আমার এখানে।'

গাড়ির কাছে দৌড়ে গেল মুসা। দরজা খুলে মেঝেতে বিছানো একটা ম্যাট তুলে নিল। দেয়ালের ধারাল কিনারে ঘষা লেগে লেগে দড়িটা কেটে যাবে। নিচে ম্যাট দিয়ে দিলে ঘষাটা যাবে তার ওপর দিয়ে, সহজে ছিঁড়বে না।

ম্যাটটা দড়ির নিচে রেখে গাড়িতে এসে উঠল সে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ধীরে ধীরে পিছাতে শুরু করল। দ্রুত সামনে-পেছনে করছে নিজের মুখ, মাথাটা ঘুরছে যেন যন্ত্রের মত—একবার সামনে তাকাচ্ছে দড়ির দিকে, আবার পেছনে; এক সঙ্গে দু'দিকে লক্ষ রাখতে হচ্ছে তাকে।

কিশোরের মাথটা দেয়ালের কিনারে দেখা যেতেই ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে দৌড়ে গেল সে, ওপরে উঠতে সাহায্য করার জন্যে।

তুলে আনল দুজনকেই। এখনও বেঁচে রয়েছে জনসন। কপালের একটা পাশ ফুলে রয়েছে গোল আলুর মত। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে শরীর। তবে শ্বাস-প্রশ্বাসে কোন ব্যাঘাত নেই।

পেছনের সীটে তাকে তুলে নিয়ে শহরে রওনা হলো ওরা।

এলক্ স্প্রিঙ হাসপাতালে যখন স্ট্রেচারে করে ইমার্জেন্সির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জনসনকে, তখনও তার জ্ঞান ফেরেনি। তাকে ডাক্তার আর নার্সের হাতে সমর্পণ করে বেরিয়ে আসতে যাবে দুই গোয়েন্দা, এই সময় হুড়মুড় করে এসে ঢুকলেন শেরিফ।

'খবর সাংঘাতিক দ্রুত ছড়ায় এ শহরে,' কিশোর বলল। 'আপনাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম আমরা।'

'গেটে শুনলাম, আরেকটা অজ্ঞান দেহ তুলে নিয়ে এসেছ তোমরা,' জবাব দিলেন শেরিফ। 'ভাবছি, তোমরা যতক্ষণ আছ, হাসপাতালের মধ্যেই অফিসটা সরিয়ে নিয়ে আসব কিনা। তাতে সময় আর ঝামেলা দুটোই বাঁচবে আমার।'

'অফিসের কাজে এসেছেন?' জানতে চাইল কিশোর। 'নাকি কাউকে দেখতে?'

হাসলেন শেরিফ। 'দুটোই। মারিসা কুপারের সঙ্গে কথা বলতে।'

'হুঁশ ফিরেছে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'দেখা করা যাবে?'

'যাবে। ভিজিটিং আওয়ার নয় এখন, তবু ব্যবস্থা করতে পারব। টেরি জনসনকে এর মধ্যে ঢোকালে কি ভাবে, খুলে বলবে?'

কি ঘটেছে, সব জানাল তাঁকে কিশোর আর মুসা। শান্ত ভঙ্গিতে চুপ করে শুনলেন শেরিফ। দু'একবার মাথা ঝাঁকালেন। ওদের কথা শেষ হলে বললেন, 'ঘটনাগুলোর কোন ব্যাখ্যা আছে তোমাদের কাছে?'

'অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ডক্টর কুপারকে খুন করার জন্যে জনসনকে ভাড়া করেছিলেন থার্সটন,' কিশোর বলল। 'ডক্টর কুপার ওয়াইল্ডলাইফ রিজর্ট প্রতিষ্ঠা করে ফেললে শিকারী পেশার ইতি ঘটবে ভেবে এ কাজ করতে রাজি হবে জনসন, ধরেই নিয়েছিলেন থার্সটন। তারপর নিশ্চয় জনসনকেও সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি।'

'এ কাজ কেন করতে যাবে?' মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞেস করলেন শেরিফ।

'হয়তো ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। সাক্ষী রাখতে চাননি। কিংবা আরও বেশি টাকা চাইতে গিয়েছিল জনসন, ব্ল্যাকমেল। সুতরাং ওকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিলেন থার্সটন। নিয়ে গিয়েছিলেন ওই নির্জন পার্বত্য এলাকায়। গাড়ির ব্রেক লাইন কেটে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।'

'থার্সটন আর জনসনের কথাবার্তা শুনেছ?'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'না।'

'তোমার ধারণা থার্সটনের লোক ব্রেক নষ্ট করেছে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'কাউকে জনসনের গাড়ির নিচে ঢুকতে দেখেছ?'

'আকাশে মেঘ ছিল,' কিশোর জানাল। 'চাঁদ ঢাকা পড়েছিল। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না তেমন। তা ছাড়া দূর থেকে ছোট টেলিস্কোপ দিয়ে দেখেছি আমরা।'

'কিন্তু জনসনের লোকটাকে চোখে পড়ার কথা,' কিশোরের যুক্তি মেনে নিতে পারছেন না। 'তা ছাড়া ওই তৃতীয় লোকটা এল কোনখান থেকে?'

'থার্সটন যদি জনসনকে ওখানে দেখা করতে বলে থাকেন, তাহলে জনসন আসার আগেই লোকটাকে ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। গাড়ি লুকানোর জায়গার অভাব নেই ওখানে। কোথাও সেটা রেখে পায়ে হেঁটে এসে লুকিয়ে ছিল যেখানে দেখা করার কথা সেখানে।'

এক মুহূর্ত থামল কিশোর। নিচের ঠোঁট টেনে ধরে ছেড়ে দিল স্প্রিঙের মত। 'ব্রেক কেটে দিয়ে অ্যাক্সিডেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিনা, সেটা সহজেই প্রমাণ করা যাবে। গাড়ির ব্রেক লাইন চেক করলেই বুঝতে পারবেন।'

'হুঁ!' ঘড়ি দেখলেন শেরিফ। 'দেখব চেষ্টা করে।'

বিশ

ডক্টর কুপারের ঘরটা দুই গোয়েন্দাকে দেখিয়ে দিল হাসপাতালের একজন কর্মচারী। বালিশে পিঠ দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছেন তিনি। পরীক্ষার জন্যে তাঁর বাহু থেকে রক্ত নিচ্ছে একজন নার্স। মুখটা রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে। গোয়েন্দাদের দেখে দুর্বল হাসি ফুটল মুখে।

'এই না হলে হাসপাতাল,' নার্স চলে গেলে হেসে বলল মুসা। 'রক্ত নিতে নিতেই মেরে ফেলে মানুষকে।'

মৃদু শব্দ করে হাসলেন ডক্টর কুপার। 'তুমি বলতে চাইছ এ ভাবে রক্ত না নিলে আরও আগেই এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারতাম আমি? একটা কথা ঠিক, সেদিন সময়মত তোমরা গিয়ে না পৌঁছলে আমার কাছ থেকে এখন আর কিছুই নেয়ার থাকত না ওদের। অন্তত ওরা আমাকে সে-রকমই জানিয়েছে।'

'সেদিন সকাল বেলা ঘুম ভাঙার কথা মনে আছে আপনার?' কিশোর জিজ্ঞেস করল। 'নাস্তা করেছিলেন?'

'করেছিলাম,' জবাব দিলেন ডক্টর কুপার। 'তাঁবু তুলে নিয়ে গিরিখাতে ফিরে এসেছিলাম। তারপর সব অন্ধকার। আর কিছু মনে নেই।'

'গিরিখাতে ফিরেছিলেন মানে? ওখানে ক্যাম্প করেননি আপনি?'

মাথা নাড়লেন ডক্টর কুপার। 'না। ক্যাম্প করেছিলাম ওখান থেকে কয়েক মাইল দূরে, পাহাড়ের ওপরে। সকাল বেলা রেডিওতে একটা নতুন সিগন্যাল পেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম গিরিখাতে।' থামলেন তিনি। ভ্রূকুটি করলেন। 'মিটার বলছিল সিগন্যালটা আসছে দশ ফুট দূর থেকে। কিন্তু গিরিখাতের কোথাও নতুন কুগারটাকে দেখলাম না। তখন তুষারপাত বন্ধ ছিল। না দেখার কথা নয়।'

'ক'টা বেজেছে তখন?'

'এই সোয়া ন'টা মতন। মনে আছে, তার কারণ, সময়টা লগ বুকে লিখে রেখেছিলাম।'

'কিন্তু আপনার ভাঙা ঘড়িতে তো সময় আটকে ছিল দশটা ছেচল্লিশে,' মুসা বলল। 'প্রায় দেড় ঘন্টার ফারাক।'

আবার ভ্রূকুটি করলেন ডক্টর কুপার। 'জা[illegible]। জানানো হয়েছে আমাকে। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছি না ওই সময়টা কি করেছি আমি।'

সামান্য উত্তেজনাতেই হাঁপাতে শুরু করলেন তিনি। এখন আর কিছু জিজ্ঞেস করা নিরাপদ নয় ভেবে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'ঠিক আছে, আপনি বিশ্রাম নিন। আমরা কাল আসব।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন ডক্টর কুপার। 'হ্যাঁ, বিশ্রাম নেয়াই উচিত। ডাক্তার উত্তেজিত হতে মানা করে দিয়েছেন।' চোখ বুজলেন তিনি। 'কাল এসো কিন্তু!'

'আসব।'

দরজার দিকে এগোল কিশোর। অন্যপাশে এসে অবাক হয়ে দেখল, দরজার বাইরে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন শেরিফ। কোন সন্দেহ নেই, ভেতরের কথাবার্তা শুনছিলেন।

'এ ভাবে আড়ি পেতেই কেসের সমাধান করেন নাকি আপনি?' শীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'অনেক কেসের করেছি,' অস্বীকার করলেন না শেরিফ। 'তোমাদের [illegible]বগতির জন্যে জানাচ্ছি, আমার একজন লোককে পাঠিয়েছিলাম জনসনের গাড়ি[illegible] যেখানে পড়ে গেছে সেখানে। রেডিওতে আমাকে জানিয়েছে, জায়গাটা ভাল না, যখন তখন পাথরের ধস নামে। দড়িতে ঝুলে একা একা ওখানে নামার চেষ্টা করলে প্রাণ হারানোর ভয় আছে। কাউকে আত্মহত্যার আদেশ দিতে পারি না আমি। স্বেচ্ছায় নামতে চাওয়ার মত কাউকে পেলাম না। সুতরাং ট্রাকের ব্রেক সিসটেম কাটা হয়েছে কিনা পরীক্ষাটাও সম্ভব না।'

পরদিন সকালে ডক্টর কুপারের বন্ধ দরজায় টোকা দিল কিশোর। পেছনে দাঁড়ানো মুসা আর রবিন। বিশ্রাম নিয়ে-টিয়ে অনেকটা সুস্থ বোধ করছে আজ রবিন, যদিও মগজের মধ্যে থেকে থেকেই কেমন করে উঠছে। দৈব-দর্শনের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তথ্য জোগাড়ের বহু চেষ্টা করেছে সে। ডক্টর কুপারকে কে গুলি করেছে

জানতে চেয়েছে। পারেনি। হয়তো তেমন কোন সূত্র হাতে পায়নি বলে, যেটার সাহায্যে উস্কে দেয়া যায় ক্ষমতাটাকে।

খুলে গেল দরজা। ফ্র্যাঙ্ক হ্যানকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল কিশোর।

'ও, হাই,' বিব্রত বোধ করল কিশোর। 'সরি। জানতাম না আপনি এখানে আছেন।'

তিন গোয়েন্দাকে ভেতরে ঢুকতে ইশারা করল হ্যান। 'এসো। আমি বেরোচ্ছিলাম। তোমাদের সঙ্গ ভালই লাগবে মারিসার।'

'তা লাগবে,' বিছানা থেকে জবাব দিলেন ডক্টর কুপার। 'বিরক্তিকর জায়গা এটা।'

ঘড়ি দেখল হ্যান। 'বাপরে! ক্লার্ককে বলে এসেছি দশটার মধ্যে ফিরব, কিন্তু দুপুর যে হয়ে গেল। আমি আর একটা সেকেন্ডও থাকতে পারছি না।'

'আগে বললেই হত,' ডক্টর কুপার বললেন। 'শুধু শুধু আমার কাছে বসে থেকে দেরিটা করলে।'

তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসল হ্যান। 'এ জায়গা যদি তোমার বিরক্তিকর মনে হয়, তাহলে আমার দোকানটাকে কি বলবে? সব সময় খালি তালে থাকি কখন ফাঁকি দেব। আজ সকালে তোমার কাছে না এলে কি করতাম জানো? ক্লার্কের ওপর দোকানের ভার দিয়ে সোজা বেরিয়ে পড়তাম। স্কি করতে চলে যেতাম। সারাটা দিনেও আর ফিরতাম না। বেচাকেনা না থাকলে ঝড়-তুফানেও আটকাতে পারে না আমাকে। স্কি করতে বেরিয়ে পড়ি। ঝড়ের মধ্যে স্কি করার মজাই আলাদা।'

ঝড়-তুফান! ঝট করে হ্যানের দিকে ঘুরে গেল কিশোরের দৃষ্টি। মগজে যেন ঝিলিক হেনে গেল বিদ্যুৎ শিখা। জিজ্ঞেস করল, 'সেদিন সকালেও কি স্কি করতে বেরিয়েছিলেন? ডক্টর কুপার যেদিন গুলি খেয়েছেন?'

ঠাণ্ডা নীল চোখের পাতা সরু হয়ে গেল হ্যানের। মুহূর্তে উধাও হয়ে গেছে হাসি হাসি ভঙ্গিটা। সতর্ক হয়ে গেছে। 'জানার কোন দরকার আছে তোমার?'

কি প্রশ্নের কি জবাব! তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। হ্যানের এই প্রতিক্রিয়া সন্দেহ বাড়িয়ে দিল তার। 'না, তেমন কোন দরকার নেই। ভাবলাম, গিয়ে থাকলে এমন কিছু হয়তো চোখে পড়ে থাকতে পারে আপনার, যেটা এ কেসের সমাধানে সাহায্য করবে।'

ঢিল হয়ে এল হ্যানের পেশি। আবার হাসি ফুটল মুখে। 'ও, তাই বলো। দুঃখিত, আমি কোন সাহায্য করতে পারছি না। সেদিন সকালে ঠিক এগারোটায় দোকানে ঢুকেছি আমি। মালের একটা বড় চালান এসেছিল দেখেশুনে সেগুলো তুলে রাখার ব্যাপার ছিল। একা পারত না ক্লার্ক।'

দরজার দিকে এগিয়ে গেল হ্যান। ফিরে তাকিয়ে বলল, 'মারিসা, রাতে পারলে আবার দেখে যাব তোমাকে।' বেরিয়ে গেল সে।

ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কয়েকবার কিশোর 'এ রকম বন্ধু খুব কমই থাকে মানুষের!'

অবাক হলেন ডক্টর কুপার। 'তার মানে?'

'উঁ!' বাস্তবে ফিরে এল যেন কিশোর। ডক্টর কুপারের দিকে তাকাল। 'না, কিছু

না। সময় পেলেই আপনার কাছে এসে বসে থাকেন মিস্টার হ্যান। আপনি যখন বেহুঁশ ছিলেন, তখনও এসেছেন। ঘনিষ্ঠতা খুব বেশি আপনাদের মধ্যে, তাই না?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন ডক্টর কুপার 'ঘনিষ্ঠতার চেয়েও জানাশোনা বেশি। বহুদিন ধরে চিনি ওকে। মজার ব্যাপার হলো, গত দু'বছর তার সঙ্গে দেখা বলতে গেলে প্রায় হয়ইনি। বন্ধুত্বটা টিকে আছে এখনও। তবে ঘনিষ্ঠতা বলতে যা বোঝাতে চাইছ তুমি, তা কখনোই ছিল না।'

সারা ঘরে দ্রুত খেলে গেল কিশোরের চঞ্চল দৃষ্টি। উত্তেজিত হয়ে পড়েছে সে, বোঝা যায়। রবিন আর মুসাও সেটা লক্ষ করল।

'আপনার জিনিসপত্র সব সেদিনই নিয়ে এসেছি আমরা,' কিশোর জানাল। 'ব্যাকপ্যাকটা এখন কোথায় আছে, জানেন?'

'জানি,' ঘরের কোণের একটা আলমারি দেখালেন ডক্টর কুপার। 'ওটার মধ্যে। সব ঠিকঠাক আছে কিনা কে জানে। দেখার সুযোগ পাইনি।' হাতে লাগানো আই-ভি টিউবটা দেখালেন তিনি। হেসে বললেন, 'দেখো না, কেমন বেঁধে রেখেছে।'

'আমি দেখব?'

'দেখো।'

আলমারি থেকে ব্যাকপ্যাকটা বের করে আনল কিশোর। খাটো অ্যান্টেনা লাগানো ধাতব সিলিন্ডারের মত জিনিসটা বের করল। 'আপনি যে জায়গাটাতে গুলি খেয়ে পড়ে ছিলেন, তার কাছেই পেয়েছি এটা। আপনার ব্যাগে রেখে দিয়েছিলাম। এটা আপনার রেডিও ট্র্যান্সমিটার?'

জিনিসটার দিকে তাকিয়ে আছেন ডক্টর কুপার। চোখ বড় হয়ে যাচ্ছে। 'ছ'-সাত বছর আগে এ ধরনের জিনিসই ব্যবহার করতাম আমি। কিন্তু এটা আমার নয়।'

ভুরু নাচাল কিশোর। 'তাহলে কার? দেখে তো হাতে বানানো জিনিস মনে হচ্ছে।'

একটা চেয়ার টেনে ডক্টর কুপারের একেবারে কাছে নিয়ে এল কিশোর। 'ভাল করে দেখুন, কিছু মনে করতে পারেন কিনা। মিস্টার হ্যানের দোকানে এ জিনিস বিক্রি করতে দেখেছেন কখনও?'

'দেখেছি মানে? ও-ই তো বিক্রি করে এ জিনিস, ওর নিজের বানানো,' ডক্টর কুপার বললেন। 'ও যে কত কাজ জানে, তুমি কল্পনা করতে পারবে না। স্কি-এর ওস্তাদ, রাইফেল-বন্দুকে দুর্দান্ত নিশানা, ইলেকট্রনিকের জাদুকর...'

'ব্যস ব্যস, আর বলতে হবে না!' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। রবিনকে বলল, 'তুমি এখানে বসে থাকো, যতক্ষণ না আমরা ফিরে আসছি। মুসা, এসো আমার সঙ্গে।'

'কোথায় যাচ্ছ তোমরা?' জানতে চাইল রবিন।

'শেরিফের অফিসে,' কোন দিকে আর না তাকিয়ে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল কিশোর।

একুশ

'তাহলে তুমি বলতে চাইছ ফ্র্যাঙ্ক হ্যানই এ কাজ করেছে?' চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছেন শেরিফ।

'কোন সন্দেহ নেই আর আমার তাতে,' দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছি আমি। একটা বাদে।'

'কি?'

'কেন এ কাজ করল হ্যান?'

'তোমার কি মনে হয়?'

'এ সব ক্ষেত্রে একটা কারণই মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, টাকা।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালেন শেরিফ। 'মনে হচ্ছে তোমার এই অনুমানটাও ঠিক প্রচুর ধারদেনা ছিল হ্যানের, কিছুদিন আগেও। হঠাৎ করেই একদিন সব শোধ করে দিল সে। অবাক হয়েছিলাম। রাতারাতি এত টাকা কোথায় পেল সে? কথায় কথায় জিজ্ঞেসও করেছিলাম। হেসে জানিয়েছে, তার এক বুড়ো ধনী চাচা নাকি মারা গেছে। মরার সময় টাকা-পয়সা সব হ্যানের নামে উইল করে দিয়ে গেছে। এখন বুঝতে পারছি, সব বানোয়াট। কারও কাছ থেকে টাকাটা নিয়েছে সে। কিংবা বলা যায়, কোন কাজের জন্যে টাকাটা দিয়েছে তাকে কেউ।'

'ঠিক ধরেছেন,' তুড়ি বাজাল কিশোর। 'শেষ প্রশ্নটার জবাবও পেয়ে গেলাম...'

'তোমার ধারণা,' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা, 'টাকার জন্যে বন্ধুর বুকে গুলি চালিয়েছে সে? খুন করতে চেয়েছে?'

'তা ছাড়া আর কি?'

'কে তাকে টাকা দিল?'

'কার অত টাকা আছে এখানে?' ভুরু নাচিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর। 'মানুষ খুন করানোর জন্যে রাতারাতি এত খরচ করে ফেলতে পারে?'

'জেরাল্ড থার্সটন!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'জেরাল্ড থার্সটন। সব কিছুর পেছনে ওই র‍্যাঞ্চার। তার অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতেই সব কিছু ঘটেছে।' শেরিফের দিকে তাকাল সে। 'ডক্টর কুপারকে জনসন গুলি করেনি, শেরিফ, হ্যান করেছে। কিন্তু যোগাযোগটা হলো কি করে দুজনের? গোপনে এ ধরনের কোন কাজ করানোর জন্যে যথেষ্ট চেনাজানা আর আন্তরিকতা থাকা দরকার।'

'আন্তরিকতা আছে কিনা জানি না,' জবাব দিলেন শেরিফ, 'তবে চেনাজানা হতে কোন অসুবিধে নেই। এলক্ স্প্রিঙের বেশির ভাগ বাড়ির মালিক থার্সটন। যে বাড়িতে দোকান দিয়েছে হ্যান, সেটারও।' গোঁফে টোকা দিলেন তিনি। 'কিছুদিন আগেও ভাড়া নিয়ে গোলমাল ছিল হ্যানের সঙ্গে থার্সটনের। আমার কাছে নালিশ করে গেছে থার্সটন। হ্যানের চাচার মৃত্যুর পর সেটা মিটে গেছে, কারণ টাকা দিয়ে দিয়েছে হ্যান...'

'চাচাফাচা সব ভুয়া কথা,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'থার্সটনের কথামত কাজ করতে রাজি হয়ে যাওয়ায় বকেয়া টাকা সব মাপ করে দিয়েছে থার্সটন। এর আর অন্য কোন ব্যাখ্যা নেই। ডক্টর কুপারকে সরিয়ে দিতে পারলে তার বিরাট লাভ, সে-জন্যে হ্যানকে টাকা খাইয়ে খুন করাতে চেয়েছে তাঁকে।'

নীরবে মাথা ঝাঁকালেন শেরিফ।

'বাজি রেখে বলতে পারি,' কথার নেশায় পেয়েছে যেন কিশোরকে, বলেই যাচ্ছে, 'লঙ হার্ট যে গ্যারেজে ট্রাক রাখেন, সেটার মালিকও থার্সটন। তাই না?'

'বাজিটা জিতে গেলে তুমি,' গম্ভীর ভঙ্গিতে জবাব দিলেন শেরিফ।

'তাহলে আর বসে আছেন কেন? ধরুন না গিয়ে ওকে।'

'পারলে কি আর বসে থাকতাম,' আবার গোঁফে টোকা দিলেন শেরিফ। 'ভাল করেই জানো, ও বড় শক্ত ঠাঁই। কিছু করার আগে প্রমাণ দরকার। হ্যানই যে গুলি করেছে, সেটাও প্রমাণ করা যাচ্ছে না। ভেবো না, হ্যানকে আমি সন্দেহ করিনি। সকাল বেলা হাসপাতালে গিয়েছিলাম জনসনের সঙ্গে কথা বলার জন্যে। একটা ঘণ্টা নষ্ট করে এসেছি। কোন কথারই জবাব দেয়নি সে। সাফ বলে দিয়েছে, উকিলকে সামনে না রেখে কোন কথা বলবে না।'

'তা তো বলবেই না,' মাথা দোলাল কিশোর। 'হয় বলতে ভয় পাচ্ছে, নয়তো তথ্য গোপন করে রেখে ভবিষ্যতে থার্সটনকে ব্ল্যাকমেল করার ফন্দি এঁটেছে।' নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে ছেড়ে দিল সে। 'তবে মুখ খোলানোর বুদ্ধি একটা আছে। ফ্র্যাঙ্ক হ্যানকে হাতেনাতে ধরে ফেলা।'

ভুরু কুঁচকে কিশোরের দিকে তাকালেন শেরিফ।

মুচকি হাসল মুসা। 'গ্রীক ভাষা' বলা শুরু হয়ে গেছে কিশোরের।

কিন্তু বেশিক্ষণ শেরিফকে ভোগাল না কিশোর। খুলে বলল তার পরিকল্পনার কথা

মুসা আর কিশোর যখন ঢুকল, হ্যান তখন দোকানে একা। হাসিমুখে ওদের স্বাগত জানাল সে। 'বন্ধ করতে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, ডিনারের আগে মারিসার সঙ্গে দেখা করে যাই। তা তোমরা কি মনে করে?'

'ও, আপনি তাহলে খবরটা শোনেননি,' কিশোর বলল।

হাসি মিলিয়ে গেল হ্যানের। 'কিসের খবর?'

'আমরা বসে থাকতে থাকতেই একজন নার্স ঢুকল। রক্ত পরীক্ষা করে কি জানি পেয়েছে, একটা ইঞ্জেকশন দিল সে, সম্ভবত অ্যালার্জির ইঞ্জেকশন। মুহূর্তে খারাপ হয়ে গেল ডক্টরের অবস্থা। বেহুঁশ হয়ে গেলেন তিনি। ছোটাছুটি করে এলেন ডাক্তার আর নার্সরা। আমাদের বের করে দিলেন ঘর থেকে।' বিরক্তির ভঙ্গি করল কিশোর। 'ইস্, ইঞ্জেকশন দিতে আসার আর সময় পেল না! আরেকটু থাকলেই সেদিন সকালে কি ঘটেছিল, সব আমাদের বলতে পারতেন ডক্টর কুপার।'

কিশোরের চোখে দৃষ্টি যেন আটকে গেল হ্যানের। 'কি বলেছে সে?' আচমকা কর্কশ হয়ে উঠল তার কণ্ঠ। 'কাউকে দেখেছে?'

'না, অতখানি এগোতে পারেনি আলোচনা।' ঘড়ি দেখল কিশোর। 'অনেক

দেরি করিয়ে দিলেন শেরিফ। তাঁর অফিস থেকেই এলাম। মুসা, তোমার খিদে পায়নি?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'পেয়েছে।'

'চলো।'

ঝটকা দিয়ে দিয়ে একবার মুসা, আবার কিশোরের ওপর সরে যাচ্ছে হ্যানের দৃষ্টি। 'শেরিফের ওখানে গিয়েছিলে কেন?'

'তিনি আমাদের যেতে বলেছিলেন,' জবাব দিল কিশোর। 'ঠিক কোন সময়ে গুলিটা খেয়েছেন ডক্টর কুপার, সেটা নিয়ে আলোচনার জন্যে।' মুসার হাত ধরে টান দিল সে। 'চলো চলো, আমার আর সহ্য হচ্ছে না।' হ্যানের দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। 'এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। দোকানের দরজা খোলা দেখে মনে হলো, ডক্টর কুপারের খবরটা আপনি জেনে না থাকলে আপনাকে জানিয়েই যাই।'

'ভাল করেছ!'

হাসল কিশোর। 'আবার দেখা হবে, মিস্টার হ্যান। চলি। গুড-বাই।'

গাড়িতে উঠে হাসল কিশোর।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে দিতে মুসা বলল, 'ফাঁদ তো পাতা হলো। এখন ধরা দিলেই হয়।'

'দেবে। আমি শিওর।'

বাইশ

লুমিনাস ডায়াল লাগানো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল কিশোর, ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। এর আগের বার যখন ঘড়ি দেখেছিল, তখন বারোটার কিছু বেশি। এখন একটা পনেরো। আলমারির ভেতরের বদ্ধ, বেকায়দা পরিবেশে বসে ঘুমাতে পারল কি করে! সতর্ক থাকতে হবে, দ্বিতীয়বার যাতে আর এ ঘটনা না ঘটে বলা যায় না, সারা রাতই জেগে থাকতে হতে পারে ওকে।

সামান্য ফাঁক করে রেখেছে আলমারির দরজা। যাতে ঘরের দরজা আর ডক্টর কুপারের বিছানার দিকে নজর রাখতে পারে। কয়েক মিনিট অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার বুজে আসতে লাগল তার চোখ।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল হঠাৎ। হলওয়ে থেকে পাতলা এক ফালি আলো এসে পড়েছে ঘরে। নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করল একটা ছায়া মূর্তি। বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। একটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। তারপর একটা বালিশ তুলে নিয়ে চেপে ধরল বিছানায় শোয়া রোগীর নাকে-মুখে।

ছটফট শুরু করল বিছানায় শোয়া মানুষটা। আরও জোরে বালিশ চেপে ধরল ছায়ামূর্তি। ধীরে ধীরে কমে এল রোগীর ছটফটানি, থেমে গেল একেবারে।

বিছানা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিথর হয়ে যাওয়া মানুষটার ওপর ঝুঁকে রইল ছায়ামূর্তি। লাফ দিয়ে আলমারি থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। সুইচ টিপে দিল কেউ। উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল ঘর।

পাক খেয়ে ঘুরে গেল ছায়ামূর্তি—ফ্র্যাঙ্ক হ্যান। হাতে বালিশটা ধরা রয়েছে এখনও। কিশোরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে একটানে ছুরি বের করল পকেট থেকে। পাগলের মত খোঁচা মারতে এল। তীব্র আলোর ঝলকানিতে দেখতে পাচ্ছে না ঠিকমত। লাফ দিয়ে সরে গেল কিশোর। তার বুকের কয়েক ইঞ্চি দূর দিয়ে চলে গেল ফলাটা। আবার মারার জন্যে মাথার ওপর তুলে ধরল হ্যান।

লাফ দিয়ে উঠে বসল বিছানায় শোয়া মানুষটা। রবিন। দুই হাতে চেপে ধরল হ্যানের ছুরি ধরা হাত। রাগে বিকৃত হয়ে গেল হ্যানের মুখ। ঝাড়া দিয়ে হাত দুটো ছাড়ানোর চেষ্টা করল সে। পারল না।

আচমকা তার কব্জিতে এক মোচড় মারল রবিন। ছুরিটা হ্যানের হাত থেকে পড়ে গেল। হাত ছাড়ল না রবিন। ঘুরে দাঁড়াচ্ছে হ্যান। বেশিক্ষণ তাকে ধরে রাখতে পারবে না রবিন।

পেছন থেকে গায়ের ওপর এসে পড়ল কিশোর। বিছানার নিচ থেকে বেরিয়ে এল দুটো কালো রঙের হাত। হ্যানের পা খামচে ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। তিনদিকের মিলিত আক্রমণ হ্যানের পক্ষে এক সামলানো কঠিন হয়ে পড়ল। পা নাড়াতে পারছে না। তার দুই হাত মুচড়ে পিঠের ওপর নিয়ে এল কিশোর আর রবিন মিলে। কাবু হয়ে গেল হ্যান।

রবিনের দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। 'দম আটকে মরে যাওয়ার অভিনয়টা চমৎকার হয়েছে।'

হাসিটা ফিরিয়ে দিল রবিন। 'আর কয়েক সেকেন্ড বালিশ চেপে ধরে রাখলে সত্যি সত্যি মরে যেতাম।'

বিছানার নিচ থেকে বেরিয়ে এসেছে মুসা।

ফিরে তাকাল কিশোর। সুইচ বোর্ডের কাছে কাত হয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন শেরিফ। ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'শেরিফ, আর কোন প্রমাণের দরকার হবে?'

সোজা হলেন শেরিফ। কাউবয় হ্যাটের কানায় আঙুল ঠেকিয়ে ঠেলে সামান্য সরিয়ে দিলেন পেছন দিকে। মাথা নাড়লেন, 'না। হাতেনাতে ধরা গেছে।'

খসখসে কণ্ঠে বলে উঠল হ্যান, 'ভুল করছেন আপনারা!'

'তা তো বটেই,' কঠিন স্বরে জবাব দিলেন শেরিফ, 'তবে ভুলটা আমরা নই, তুমি করেছ। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না, হ্যান। তোমার দোকানের উল্টো দিকের রেস্তোরাঁটার ওয়েইট্রেসের সঙ্গে কথা বলেছি। মারিসা কুপার যে সকালে গুলি খেয়েছে, সেদিন সকাল এগারোটায় তোমাকে দোকানের ডিসপ্লে বদল করতে দেখেছে সে। কি করে সেটা সম্ভব?'

'তার কারণ আপনি ঘড়ির ব্যাপারটা বিশ্বাস করেছেন,' হ্যানকে চুপ করে থাকতে দেখে জবাব দিল কিশোর। 'ডক্টর কুপারের ঘড়ির কাঁটা দশটা ছেচল্লিশ মিনিট দেখাচ্ছিল, যাতে সবাই মনে করে ওই সময় গুলি খেয়েছেন তিনি। কিন্তু এর আগের আধঘণ্টা কি করেছিলেন কিছু মনে করতে পারেন না ডক্টর কুপার।'

'তাতে কিছু প্রমাণ হয় না,' হ্যান বলে উঠল। 'ডাক্তার বলেছেন...'

'তুমি চুপ থাকো,' ধমক দিলেন শেরিফ। 'প্রথমবার খুনের চেষ্টা যদি প্রমাণ

করতে না-ও পারি, দ্বিতীয়বারেরটাও না পারি–মেশিন নষ্ট করে দিয়ে যেটা করতে চেয়েছিলে তুমি, তৃতীয়বারেরটা তো পারব। স্বচক্ষে দেখেছি। শুধু আমি একা নই, আরও তিনজন। এতজনের সাক্ষী না মেনে পারবেন না বিচারক।' কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি। 'আমার কৌতূহল এখনও মেটেনি।'

'খুব সহজ,' কিশোর বলল। 'ন'টা থেকে ন'টা পনেরোর মধ্যে ডক্টর কুপারকে গুলি করেছে হ্যান। ওই সময়টায় ঝড় থেমেছিল। তাতে নিশানা করতে অসুবিধে হয়নি ওর। ডক্টর কুপার পড়ে যাওয়ার পর কাছে গিয়ে ঘড়িটা ভেঙে কাঁটা ঘুরিয়ে রেখেছিল দশটা ছেচল্লিশে। ন'টা পনেরো থেকে এগারোটা। প্রচুর সময়, ফ্র্যাঙ্ক হ্যানের মত ওস্তাদ স্কিয়ারের জন্যে। আর কেউ–আমরা হলে এত তাড়াতাড়ি স্কি করে শহরে ফিরে আসতে পারতাম না। তা ছাড়া পাহাড়ী পথে কোন শর্টকাটও নিশ্চয় চেনা আছে তার, যেদিক দিয়ে এলে সময়ও কম লাগে। ন'টা পনেরো থেকে দশটা পর্যন্ত তুষারপাত চলছিল। তাতে ঢেকে যায় তার স্কি-এর দাগ। এ কারণেই ফাঁকিতে পড়ে গিয়েছিলাম প্রথমে। আরও একটা ব্যাপারে খটকা লেগেছে, ডক্টর কুপারের দেহ তুষারে ঢেকে গিয়েছিল। দশটা ছেচল্লিশে গুলি খেলে গায়ে তুষার জমার কথা নয়। তুষারপাত বন্ধ হয়ে গেছে এর অনেক আগেই।'

'এক মিনিট, এক মিনিট,' হাত তুললেন শেরিফ। 'ঘড়ির ব্যাপারটা বুঝলাম। কিন্তু হ্যান কি বোঝেনি মারিসা কুপার বেঁচে আছে? ওকে একেবারে শেষ না করে দিয়ে গিরিখাত থেকে চলে এল কেন সে?'

'এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না তার,' জবাব দিল কিশোর। 'ঘটনাটাকে দুর্ঘটনা হিসেবে দেখাতে চেয়েছিল সে। শিকারের সময় ভুলে যদি গুলি লাগে, একটা গুলি লাগতে পারে বড়জোর–দুটো গুলি বিঁধে আছে দেখলে কেউ আর অ্যাক্সিডেন্টের কথা বিশ্বাস করবে না। ও ভেবেছিল, মরে যাবেন ডক্টর কুপার। যেতেনও, আমরা গিয়ে না পৌঁছলে। হ্যান কল্পনাই করেনি, ওই তুষারঝড়ের মধ্যে কেউ তাঁকে উদ্ধার করতে যাবে। যাই হোক, আপনাকে উড়ো টেলিফোন করা আর লঙ হার্টের রাইফেল রেখে দিয়ে ফাঁসানোর অপচেষ্টাটাও অবশ্যই হ্যানের।'

'ঘড়িটা যে ইচ্ছে করে বাড়ি মেরে ভাঙা হয়েছে, বুঝলে কি করে?' জিজ্ঞেস করলেন শেরিফ।

'শুরুতেই যে কেন বুঝলাম না, সেটাই অবাক লাগছে আমার,' কিশোর বলল। 'ঘড়িটা ছিল মোটা দস্তানার নিচে আড়াল করা৷ ডক্টর কুপার পড়েছেন নতুন জমা নরম তুষারের স্তূপের ওপর। তাতে হাজার বাড়ি লাগলেও ঘড়ি ভাঙার কথা নয়। ভালমত ভাবার পর বুঝলাম ঘড়িটা হাত থেকে খুলে নিয়ে গিয়ে পাথরে বাড়ি মেরে ভেঙে এনে আবার পরিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'খাইছে!' ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'জীবনে যদি আর কোনদিন কাঁটা লাগানো ঘড়ি পরি আমি! ডিজিটাল অনেক ভাল। এ সব শয়তানি করে রাখা সম্ভব না।'

তেইশ

পরদিন সকালে বাড়ি ফেরার আগে হাসপাতালে ডক্টর কুপারের সঙ্গে দেখা করল তিন গোয়েন্দা।

'তারমানে আবার আমার প্রাণ বাঁচালে তোমরা,' ডক্টর কুপার বললেন। 'ফ্র্যাঙ্ক আমাকে খুন করতে চেয়েছে, এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। এই হলো মানব-চরিত্র! সে-জন্যেই মানুষের চেয়ে জন্তু-জানোয়ারের প্রতি আমার বেশি আগ্রহ।...যাকগে, একটা কথা বলবে, এর মধ্যে টেরি জনসন ঢুকল কিভাবে?'

'কাকতালীয় ভাবে,' জানাল কিশোর। 'সেদিন সকালে কুগারের চিহ্ন অনুসরণ করতে করতে গিরিখাতের কাছে দু'জন মানুষকে দেখেছিল জনসন। লর্ড হার্ট আর ফ্র্যাঙ্ক হ্যান। হ্যানকে সন্দেহ করেছিল সে। ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল। হ্যান বলে দিয়েছিল থার্স্টনকে। থার্স্টন তখন জনসনকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন।

'পর্বতে ডেকে নিয়ে যান ওকে থার্স্টন। নিশ্চয় টাকাটুকি দেয়ার কথা বলেই। পিকআপের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যান ওকে। আগে থেকেই লুকিয়ে ছিল ওখানে হ্যান। সুযোগ বুঝে বেরিয়ে এসে চুপি চুপি কেটে রেখে যায় জনসনের ব্রেক সিসটেম।'

দ্বিধা যাচ্ছে না ডক্টর কুপারের। 'এখনও বুঝতে পারছি না, রেডিও সিগন্যালের ব্যাপারটা!'

হাসল কিশোর। 'এটা হলো হ্যানের চালাকির সবচেয়ে ইনটারেস্টিং অংশ। আপনি ঠিক কোনখানে রয়েছেন জানা ছিল না হ্যানের। মোটামুটি একটা ধারণা ছিল কেবল। রেডিও সিগন্যাল পাঠিয়ে তখন আপনাকে তার কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সে। ও জানত, সিগন্যাল পেলে আপনি ভাববেন আপনার কলার পরানো কোন কুগার। আপনাকে গুলি করার পর ট্র্যান্সমিটারটা নষ্ট করে দেয়ার ইচ্ছে হ্যানের ছিল নিশ্চয়। কিন্তু পরে হয় সেটা তুষারের মধ্যে আর খুঁজে পায়নি, কিংবা ওটার কথা ভুলে গিয়েছিল। আপনাকে বেঁচে থাকতে দেখে প্রচণ্ড নাড়া খেয়েছিল সে, যার ফলে ছোটখাট দু'একটা ভুল করে ফেলা সম্ভব। স্মল-ক্যালিবারের রাইফেল দিয়ে স্থির টার্গেট প্র্যাকটিস করতে অভ্যস্ত সে। ভারী রাইফেল দিয়ে সচল জানোয়ার শিকারের অভিজ্ঞতা তার নেই বলেই বেঁচে গেছেন আপনি।'

'পুরো ব্যাপারটাই বড় জটিল,' ডক্টর কুপার বললেন। 'সব কিছুর পেছনে জেরাল্ড থার্স্টন রয়েছে, কি করে প্রমাণ করবে?'

'মোটেও কঠিন হবে না সেটা,' মুখ না খুলে আর পারল না মুসা। 'হাজতে ভরার পর থেকে মুখে খই ফোটা শুরু হয়ে গেছে ফ্র্যাঙ্ক হ্যানের। চড়ুই পাখির মত একনাগাড়ে কিচির-মিচির করে চলেছে সে...'

'মনে হয় এ যাত্রা তোমার বন-বিড়ালগুলো বেঁচে গেল, মারিসা।'

নতুন একটা কণ্ঠ শুনে দরজার দিকে ঘুরে গেল চার জোড়া চোখ। হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন লর্ড হার্ট।

ঘরে ঢুকলেন তিনি।

হেসে জবাব দিলেন ডক্টর কুপার, 'ওগুলো শুধু আমার বিড়াল নয়, লর্ড। ওরা সবার। ওরা মুক্ত, ওরা স্বাধীন, ওরা বন্য। এ ভাবেই দেখা উচিত ওদের।'

'আমারও কুগারের জীবনই পছন্দ,' ঘোষণা করলেন লর্ড হার্ট।

গলায় ঝোলানো ক্যামেরাটা খুলে নিল রবিন। 'দয়া করে একটু পোজ দিয়ে দাঁড়াবেন?'

'কেন?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন লর্ড হার্ট।

'একটা ছবি তুলব,' রবিন বলল। 'আমার সংগ্রহে রাখার জন্যে।'

'তারচেয়ে বরং বুনো কোন কুগারের ছবি তুলে নাওগে,' হেসে বললেন ডক্টর কুপার। 'পার্বত্য সিংহের মুখে ইনডিয়ান নেতার চেহারা দেখতে পাবে পরিষ্কার।'

'শুধু শুধু ওই প্রাণীগুলোকে ছোট করছ, মারিসা,' অস্বস্তি ভরা কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন লর্ড হার্ট। রবিনের দিকে ফিরলেন, 'রবিন, আমি রেডি।'

তীব্র আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল ক্যামেরার ফ্ল্যাশ লাইট থেকে।

***

ভলিউম ৪৪

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হ্যালো, কিশোর বন্ধুরা-
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বিচ থেকে।
জায়গাটা লস আঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে।
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি,
নাম তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙ্গালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নীচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।
তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি-
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০